তর্কভাষাপ্রকাশ, তর্কভাষাপ্রকাশিকা ও *সারমঞ্জরীর* আলোকে কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থ সমীক্ষা

পিএইচ্. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণানিবন্ধ

গবেষক :

বিষ্ণু চন্দ্র বর্মন

নিবন্ধনসংখ্যা : **A00SA1201518**

তত্ত্বাবধায়ক :

অধ্যাপক ড. চিন্ময় মণ্ডল

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

"*তর্কভাষাপ্রকাশ, তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরীর* আলোকে কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থ সমীক্ষা" submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Chinmay Mandal and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor:

Dated:

Candidate:

Dated:

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

গবেষণাকর্মের এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যাঁর সহযোগিতায় আমি গবেষণানিবন্ধটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. চিন্ময় মণ্ডল মহাশয়। সর্বপ্রথম আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি তাঁর বহু-কর্মব্যস্ততার মধ্যদিয়েও আমাকে গবেষণাকার্যের বিষয়-নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও সক্রিয় দিগ্-নিদর্শন করে গেছেন সর্বদা। অধ্যাপক মহাশয়ের উপদেশ এবং তাঁর শুভাশীর্বাদ শীরোধার্য করেই দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে আজ আমি গবেষণানিবন্ধটি উপস্থাপন করার অভিলাষ করছি। তাঁর পূর্ণসাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে গবেষণানিবন্ধটির বাস্তবরূপ দেওয়া অসম্ভব ছিল। এছাড়াও ব্যক্তিজীবনে অধ্যাপক মহাশয়ের নানান উপদেশ ও সাহায্য আমাকে পথ চলতে সক্ষম করেছে। তাই অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। অধ্যাপক মহাশয়ের শ্রীচরণযুগলে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই এই গবেষণাকর্মের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য দুই জন প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও ড. দীপায়ন পট্টনায়ক মহাশয়কে। ষাণ্মাসিক প্রতিবেদনে আমার অগ্রগতি তাঁদের মূল্যবান উপদেশের দ্বারা সাধিত হয়েছে।

এছাড়াও আমাদের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য অধ্যাপক বৃন্দের প্রতিও রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁরা আমাকে এই কাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন। এরূপ আমাদের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, দর্শন বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের কর্মীদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এঁরা সকলেই আমাকে গবেষণোপযোগী বিবিধ পুস্তকরাজি পড়তে দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও যাঁরা আমার এই গবেষণানিবন্ধটি গ্রন্থরূপদানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সবশেষে আমি আমার পিতা - শ্রী কমল চন্দ্র বর্মন ও মাতা - শ্রীমতি সন্ধ্যা বর্মন-কে শতকোটি প্রণাম জানাই। যাঁদের অনুপ্রেরণা ছাড়া আমার এই মহানগরীতে পড়াশুনা ও গবেষণাকার্যে মনোনিবেশ করা অসম্ভব ছিল। পরিশেষে আমি করুণাময় ঈশ্বরকে প্রণাম করছি। তাঁর অসীম কৃপায় আজ আমি উচ্চশিক্ষা স্তরে উপনীত হয়ে গবেষণানিবন্ধটি সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি।

বিষ্ণু চন্দ্র বর্মন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা : ৭০০ ০৩২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা সংখ্যা
• **প্রথম অধ্যায় :** ভূমিকা	**১-১০**
১.০. উদ্দেশ্য	১
১.১. বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য	১-২
১.২. *তর্কভাষা* এবং *তর্কভাষা*কারের সময়কাল ও ব্যক্তিপরিচয়	২-৫
১.৩. প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫-৯
১.৪. গবেষণা কর্মের পদ্ধতি	১০
• **দ্বিতীয় অধ্যায় :**	**১১-৩৮**
২.০. ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থের সামান্য পরিচয়	১১
২.১. ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত পদার্থতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১১-১৯
২.২. আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের সামান্য পরিচয়	১৯-৩৮
• **তৃতীয় অধ্যায় :**	**৩৯-৮০**
৩.০. প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে কেশবমিশ্রের অভিমত	৩৯
৩.১. জাতিঘটিত লক্ষণের দ্বারা প্রমেয় পদার্থের স্বরূপ কথন	৪০-৪২
৩.২. ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সমানতন্ত্রীয়তা প্রদর্শন	৪২-৭২
৩.৩. প্রমেয়পদার্থ বিষয়ে কেশবমিশ্রের স্বাভিমতের সামান্য পর্যালোচনা	৭২-৮০
• **চতুর্থ অধ্যায় :**	**৮১-৯৪**
৪.০. *তর্কভাষা*র টীকাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবিরণ	৮১
৪.১. *তর্কভাষা*র টীকাকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৮১-৮৮
৪.২. ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনসম্মত প্রকরণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৮৮-৯৪
• **পঞ্চম অধ্যায় :**	**৯৫-১০৬**
৫.০. তর্কভাষা গ্রন্থের মর্মার্থজ্ঞাপনে *তর্কভাষাপ্রকাশ*, *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের অবদান	৯৫-১০৬

● **ষষ্ঠ অধ্যায় :** **১০৭-১৬৮**

৬.০. *তর্কভাষা*সম্মত প্রমেয় পদার্থ নিরূপণে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনা ১০৭

৬.১. আত্মা ১০৭-১১০

৬.২. শরীর ১১০-১১৩

৬.৩. ইন্দ্রিয় ১১৩-১১৬

৬.৪. **অর্থ** **১১৬-১৫৬**

৬.৪.১. দ্রব্য ১১৮-১৩৭

৬.৪.২. গুণ ১৩৮-১৪৮

৬.৪.৩. কর্ম ১৪৮-১৫০

৬.৪.৪. সামান্য ১৫০-১৫২

৬.৪.৫. বিশেষ ১৫২-১৫৪

৬.৪.৬. সমবায় ১৫৪-১৫৫

৬.৪.৭. অভাব ১৫৫-১৫৬

৬.৫. বুদ্ধি ১৫৭-১৫৮

৬.৬. মন ১৫৮-১৫৯

৬.৭. প্রবৃত্তি ১৫৯-১৬১

৬.৮. দোষ ১৬১-১৬২

৬.৯. প্রেত্যভাব ১৬২-১৬৩

৬.১০. ফল ১৬৩-১৬৪

৬.১১. দুঃখ ১৬৪-১৬৫

৬.১২. অপবর্গ ১৬৬-১৬৮

● **উপসংহার :** ১৬৯-১৭৪

● উল্লেখপঞ্জি : ১৭৫-১৯৪

● গ্রন্থপঞ্জি : ১৯৫-২০০

সংকেতসূচী :

উপস্কার. = বৈশেষিকসূত্রোপস্কার

কা. ব. = কারিকাবলী

কি. ভা. = কিরণাবলিভাস্কর

গীতা. = শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

জী. কো. = জীবনীকোষ

ত. ভা. = তর্কভাষা

ত. সং. দী. = তর্কসংগ্রহদীপিকা

তর্কা. = তর্কামৃত

তা. র. = তার্কিকরক্ষা

তৈ. উপ. = তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

ন্যা. কু. = ন্যায়কুসুমাঞ্জলী

ন্যা. দ. = ন্যায়দর্শন

ন্যা. প. = ন্যায়পরিচয়

ন্যা. ম. = ন্যায়মঞ্জরী

ন্যা. সা. = ন্যায়সার

ন্যা. সূ. = ন্যায়সূত্র

ন্যা. সূ. বৃ. = ন্যায়সূত্রবৃত্তি

ন্যা. সূ. ভা. = ন্যায়সূত্রভাষ্য

পরা. উপ. = পরাশর উপপুরাণ

প্র. পা. ভা. = প্রশস্তপাদভাষ্য

বৃহদ্ উপ. = বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

বৈ. সূ. = বৈশেষিকসূত্র

ভা. পরি. = ভাষাপরিচ্ছেদ

মা. মে. উ. = মানমেয়োদয়

স. প. = সপ্তপদার্থী

স. দ. সং. = সর্বদর্শনসংগ্রহ

স. বে. সং. = সর্ববেদান্তসারসংগ্রহ

সাং. কা. = সাংখ্যাকারিকা

সাং. সূ. = সাংখ্যসূত্র

ষ. সমু. = ষড়্-দর্শনসমুচ্চয়

C. S. P. M. = *Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts*

D. C. S. M. = descriptive catalogue of Sanskrit Manuscript

H. I. S. = History of Indian logic

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা :

১.০. উদ্দেশ্য : জীবের দুঃখনিবৃত্তির জন্য এই ভূখণ্ডে যে সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে, তাদের মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায় অন্যতম। আর এই উভয় সম্প্রদায়কে অবলম্বন করে যে সকল প্রকরণগ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থটি ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রবেশদ্বার স্বরূপ একটি অনন্যকীর্তি। কেশবমিশ্র এই গ্রন্থে ন্যায়সম্মত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ এবং বৈশেষিকসম্মত সপ্ত পদার্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকার উভয় দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থগুলি কীভাবে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর সেই ব্যাখ্যান-শৈলী, *তর্কভাষা* গ্রন্থাবলম্বনে রচিত বিংশত্যধিক টীকার মধ্যে গোবর্ধনমিশ্র কৃত *তর্কভাষাপ্রকাশ,* চিন্নংভট্ট কৃত *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও মাধবদেব কৃত *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের আলোকে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করাই আলোচ্য গবেষণানিবন্ধের উদ্দেশ্য।

১.১. বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য :

ন্যায়সম্মত প্রমেয় পদার্থ সম্পর্কিত বিবিধ প্রকার গবেষণানিবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলিতে কেবলমাত্র মহর্ষি গৌতমোক্ত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থই পর্যালোচিত হয়েছে। আবার একই ভাবে বৈশেষিকসম্মত দ্রব্যাদি পদার্থ বিষয়ক বিবিধ গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাওয়া যায়, যেগুলিতে কেবল বৈশেষিকসম্মত পদার্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমানতন্ত্রীয় দর্শন সম্প্রদায়ের প্রমেয় পদার্থগুলির একত্র অণ্বেষণ, কোন প্রকরণ গ্রন্থের টীকার আলোকে দৃষ্ট হয় না।

তর্কভাষা গ্রন্থটি ন্যায়দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকরণগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত হলেও গ্রন্থকার এখানে ন্যায়সম্মত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের আলোচনায় অভিনব কৌশলে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থেরও সন্নিবেশ করেছেন। সুতরাং কেশবমিশ্রসম্মত ‘প্রমেয়পদার্থ’ বলতে, উভয় সম্প্রদায় কথিত প্রমেয় পদার্থগুলিকে বোঝায়।

‘যথোত্তরং হি মুনীনাং প্রামাণ্যম্’ - এই ন্যায় অনুসারে উত্তরোত্তর মুনিদের প্রামাণ্য অধিক হওয়ায়, গ্রন্থকার অপেক্ষা টীকাকারের প্রামাণ্য অধিক। কেননা, টীকা ও টিপ্পনী অথবা ঐজাতীয় কোন ব্যাখামূলক গ্রন্থে মূলশাস্ত্রের গূঢ়-বিষয় প্রকাশিত হয়। সেজন্য

কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থের পর্যালোচনায় তৎপ্রণীত *তর্কভাষা* গ্রন্থের পূর্বোক্ত তিনটি টীকা বেছে নেওয়া হয়েছে। কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* ও তার টীকাগুলির ওপর এরূপ গবেষণামূলক কার্য পূর্বে সম্পন্ন না হওয়ায়, সেই বিষয়টি গবেষণানিবন্ধের বিষয়রূপে নির্বাচিত করেছি।

এই গবেষণানিবন্ধের শিরোনামটি হল - ***তর্কভাষাপ্রকাশ, তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরীর* আলোকে কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থ সমীক্ষা**।

গবেষণানিবন্ধটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজিত হয়েছে। সেগুলি হল -

প্রথম অধ্যায় : **ভূমিকা**।

দ্বিতীয় অধ্যায় : **ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থের সামান্য পরিচয়**।

তৃতীয় অধ্যায় : **প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে কেশবমিশ্রের অভিমত**।

চতুর্থ অধ্যায় : ***তর্কভাষা*র টীকাকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়**।

পঞ্চম অধ্যায় : ***তর্কভাষা* গ্রন্থের মর্মার্থজ্ঞাপনে *তর্কভাষাপ্রকাশ*, *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের অবদান**।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ***তর্কভাষা*-সম্মত প্রমেয় পদার্থ নিরূপণে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনা**।

১.২. *তর্কভাষা* এবং *তর্কভাষা*কারের সময়কাল ও ব্যক্তিপরিচয় :

কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থটি ন্যায়দর্শনের প্রবেশদ্বার স্বরূপ একটি অনন্যকীর্তি। গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বলেছেন - "বালোঽপি যো ন্যায়নয়ে প্রবেশমল্পেন বাঞ্ছত্যলসঃ শ্রুতেন। সংক্ষিপ্তযুক্ত্যন্বিততর্কভাষা প্রকাশ্যতে তস্য কৃতে ময়ৈষা॥" গ্রন্থটি প্রমাণ এবং প্রমেয় ভেদে দুটি অংশে বিভক্ত। ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রে উদ্ধৃত ষোড়শ পদার্থের উল্লেখপূর্বক গ্রন্থটির প্রারম্ভ হয়েছে। এরূপ গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশটি শুরু হয়েছে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের উদ্দেশ কথনের দ্বারা। কেশবমিশ্র প্রমাণ অংশে ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষাদি চার প্রকার প্রমাণের আলোচনা করেছেন। পরবর্তী অংশে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় ও সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটির এই অংশে বৈশেষিক স্বীকৃত দ্রব্যাদি পদার্থ ব্যাখ্যাত

হয়েছে। আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যায় বৈশেষিকোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থের সন্নিবেশ হওয়ায়, এটিকে উভয় দর্শনের প্রকরণগ্রন্থ বলা যায়।

কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থটির উপর বিংশত্যধিক টীকা রচিত হয়েছে, যা গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধতার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* ছাড়াও দর্শন শাস্ত্রগুলির মধ্যে আরও দুটি *তর্কভাষা* গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি হল বৌদ্ধ দার্শনিক শ্রীমোক্ষকরগুপ্তের এবং অন্যটি জৈন দার্শনিক শ্রীযশোবিজয়গণির। এই দুটি গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায় সিদ্ধান্তগুলি আলোচিত হয়েছে।

শ্রীমদ্ কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থটি 'ইতি কেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা সমাপ্তা'[১] - এই বাক্যটি দিয়ে সমাপ্ত হতে দেখা যায়। এখানে 'মিশ্র' পদবী দেখে অনেকেই গ্রন্থকর্তাকে মিথিলার অধিবাসিরূপে নির্দেশ করেন। কেননা, মিথিলা অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের নাম 'মিশ্র' পদবী যুক্ত। আর সেজন্যই *তর্কভাষা*কার কেশবমিশ্র মিথিলার অধিবাসী ছিলেন বলে, অনুমান করা হয়। এতদ্ অতিরিক্ত তিনি নিজ পরিচয় বিষয়ে আর কিছু বলেননি। এছাড়া তাঁর অন্য কোন গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। *তর্কভাষা*র অন্যতম টীকাকার গোবর্ধনমিশ্র *তর্কভাষাপ্রকাশ*-এর মঙ্গলাচরণ অংশে নিজ পরিচয়ে বলেছেন -

"বিজযশ্রীতনূজন্মা গোবর্ধন ইতি শ্রুতঃ।
তর্কানুভাষাযাং তনুতে বিবিচ্য গুরুনির্মিতিম্॥
বিশ্বনাথানুজপদ্মনাভানুজো গরীযান্বলভদ্রজন্মা।
তনোতি তর্কানধিগত্য সর্বান্ শ্রীপদ্মনাভাদ্বিদুষো বিনোদম্॥"

*তর্কভাষা*র বিভিন্ন সংস্করণে এই কারিকা দুটির দুই প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কোথাও বলা হয়েছে যে, গোবর্ধনমিশ্র হলেন বলভদ্র ও বিজয়শ্রীর পুত্র এবং পদ্মনাভ ও বিশ্বনাথের কণিষ্ঠভ্রাতা। তিনি নিজ অগ্রজ পদ্মনাভের কাছে তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সুধীগণের বিনোদনের জন্য *তর্কভাষা* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। আবার কোথাও বলা হয়েছে, গোবর্ধনমিশ্র হলেন কেশবমিশ্রের শিষ্য। আর কেশবমিশ্র বলভদ্র ও বিজয়শ্রীর পুত্র এবং পদ্মনাভ ও বিশ্বনাথের অনুজ। কেশবমিশ্র জ্যেষ্ঠভ্রাতা পদ্মনাভের কাছে তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সুধীগণের বিনোদনের জন্য *তর্কভাষা* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।

কিন্তু দেবদত্তরামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও কেদারনাথ সাহিত্যভূষণ সম্পাদিত *তর্কভাষা* গ্রন্থের ভূমিকা অংশে একটি বিতর্কমূলক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, কেশবমিশ্র কোন মতেই গোবর্ধনমিশ্রের গুরু হতে পারেন না। কেননা, গোবর্ধনমিশ্রের সময়কাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। কিন্তু কেশবমিশ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন চতুর্দশ শতকের পূর্বে। অত এব উভয়ের মধ্যে প্রায় দুইশত বছরের ব্যবধান। কিন্তু বাস্তবে গুরু-শিষ্যের মধ্যে সময়কালের এত ব্যবধান থাকতে পারে না। তবে *তর্কভাষার* টীকাকারদের মধ্যে 'বলভদ্র' নামে একজনের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* নামক একটি টীকা প্রণয়ন করেছেন। সম্ভবত এই বলভদ্র হলেন গোবর্ধনমিশ্রের পিতা। আর 'গুরুনির্মিতি' বলতে, তিনি ঐ বলভদ্র প্রণীত টীকাটিকে স্মরণ করেছেন।

এই বিতর্কমূলক ব্যাখ্যা যুক্তিসংগত বলে মনে হলেও অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু তাঁদের সম্পাদনায় কেশমবিশ্রকে গোবর্ধনের গুরুরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। গোবর্ধনের টীকাটির মঙ্গলাচরণ অংশের আক্ষরিক অর্থ অন্বেষণ করলেও সেটাই নিশ্চয় হয়।

তবে কেশবমিশ্র, গোবর্ধনের গুরু হলেও পদ্মনাভ ও বিশ্বনাথকে কোনভাবেই কেশবমিশ্রের পূর্বজরূপে স্বীকার করা যায় না। কেননা, পদ্মনাভ তাঁর *কিরণাবলীভাস্কর* নামক গ্রন্থে স্পষ্টত বিজয়শ্রী ও বলভদ্রকে নিজ মাতা ও পিতারূপে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক সুরেন্দ্র লাল গোস্বামী, নিজ সম্পাদিত *তর্কভাষা* গ্রন্থে একটি পরম্পরার উল্লেখ করেছেন। কোন কোন মৈথিলীদের মতে, কেশবমিশ্র ছিলেন মিথিলার সরিসাব গ্রামের অধিবাসী অভিনব বাচস্পতির পৌত্র এবং *তর্কভাষা* ছাড়াও তিনি *অদ্বৈতপরিশিষ্ট*, *অলঙ্কারশেখর*, *অলঙ্কারসর্বস্ব* প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। অর্থাৎ এই পরম্পরা অনুসারে উক্ত গ্রন্থগুলির প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এই পরম্পরাটি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। কেননা, ঐতিহাসিকেদর মতে, অভিনব বাচস্পতি পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে মিথিলার রাজা হরিনারায়ণের আশ্রমে প্রতিপালিত হন।[২] অত এব তাঁর পৌত্রের তথা কেশবমিশ্রের সময় অবশ্যই সেই সময়ের পরবর্তী। অর্থাৎ ষোড়শ শতক। কিন্তু *তর্কভাষার* অন্যতম টীকাকার চিন্নংভট্টের সময়কাল চতুর্দশ শতক। সুতরাং কেশবমিশ্র অবশ্যই তাঁর পূর্ববর্তী কোন সময়ে আবির্ভূত হন। আর *অলঙ্কারশেখরের* রচয়িতা কেশবমিশ্র এবং *তর্কভাষার* রচয়িতা কেশবমিশ্র দুই জন পৃথক্ ব্যক্তি। অত এব অভিনব বাচস্পতি *অলঙ্কারশেখরের*

প্রণেতা কেশবমিশ্রের পিতামহ হলেও *তর্কভাষা*কার কোনমতেই তাঁর পৌত্র হতে পারে না। কাজেই উক্ত পরম্পরাটি ভ্রান্ত বলেই মনে হয়।

কেশবমিশ্র 'হেত্বাভাস' নামক ত্রয়োদশ পদার্থের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উদয়নাচার্যের উল্লেখ করেছেন - "তত্র চ **উদযনেন** 'ব্যাপ্তস্য হেতোঃ পক্ষধর্মতযা প্রতীতি সিদ্ধিঃ, তদভাবোঽসিদ্ধিঃ' ইত্যসিদ্ধিলক্ষণমুক্তম্।"[৩] উদয়নাচার্যের সময়কাল নবম শতকের শেষার্ধ থেকে দশম শতকের প্রথমার্ধ[৪] বলে স্থির হয়। আচার্য বর্ধমান উপাধ্যায়, উদয়নাচার্যের কিরণাবলীর উপর *কিরণাবলীপ্রকাশ* নামে একটি টীকা রচনা করেন। বর্ধমান ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে আবির্ভূত হন।[৫] এর পরবর্তীকালে পদ্মানাভ *কিরণাবলীভাস্কর* নামে একটি টীকা রচনা করেন। সুতরাং এঁরা দুজনেই প্রায় সমসাময়িক। এই অনুযায়ী পদ্মনাভমিশ্রের ভাই গোবর্ধনমিশ্রেরও সময়কাল ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ বলে নিশ্চিত হয়। এরূপ চিন্নংভট্ট চতুর্দশ শতকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় হরিহরে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অত এব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কেশবমিশ্র দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী কোন সময়ে আবির্ভূত হন।

১.৩. প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

উপস্থাপিত এই গবেষণানিবন্ধটির প্রথম অধ্যায় : **ভূমিকা** - এই অংশে গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য, বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য, গ্রন্থ কর্তৃত্বের পরিচয় প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় : **ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থের সামান্য পরিচয়**। যেহেতু সামান্যের জ্ঞান না হলে বিশেষের জ্ঞান হয় না, সেহেতু প্রথমে সামান্যরূপে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করে, তারপর আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। এখানে আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থবিষয়ে আচার্য বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি অপরাপর প্রাচীন নৈয়ায়িকদের দৃষ্টিভঙ্গী পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেমন - বাৎস্যায়নের মতে, জন্মমাত্রই জীব উৎকৃষ্ট, মধ্যম এবং হীন - এই তিন প্রকার দুঃখ ভোগ করে। আবার তিনি উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের সঙ্গে 'তর' শব্দ যোগ করে, উৎকৃষ্টতর, হীনতর ইত্যাদি প্রকার দুঃখের অবান্তর ভেদ স্বীকার করেছেন। আবার উদ্দ্যোতকর দুঃখের একুশ প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন। যথা - শরীর, ঘ্রাণাদি ছয় ইন্দ্রিয়, উক্ত ইন্দ্রিয়ের ছয় প্রকার গ্রাহ্য বিষয়, সেই বিষয়ের ছয় প্রকার বুদ্ধি বা জ্ঞান, সুখ এবং দুঃখ - এই একুশ প্রকার দুঃখের মধ্যে,

দুঃখ হল মুখ্য এবং শরীরাদি গৌণদুঃখ। দুঃখের সঙ্গে অনুষঙ্গবশত, সেগুলি দুঃখরূপে প্রতিভাত হয়। বাচস্পতিমিশ্র, উদয়নাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণও এই একুশ প্রকার দুঃখ স্বীকার করেছেন। মহর্ষি গৌতমের মতে, আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে আত্মা ও অপবর্গ উপাদেয় এবং অন্যান্য পদার্থগুলি হেয়। কিন্তু বাচস্পতিমিশ্রের মতে, মুমুক্ষুর কাছে স্বীয় আত্মা সুখদুঃখাদির ভোক্তারূপে উপপন্ন হলে, হেয়রূপে প্রতীত হয়। আবার কৈবল্যাবস্থায় আত্মা উপাদেয় হয়।

তৃতীয় অধ্যায় : **প্রমেয় পদার্থ-বিষয়ে কেশবমিশ্রের অভিমত**। শ্রীমদ্ কেশবমিশ্র ন্যায়সম্মত প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কীভাবে স্বাভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন? তা প্রদর্শন করাই হল এই অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয়। যেমন - মহর্ষি গৌতমের মতে, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গন্ধাদি পঞ্চ গুণ, যথাক্রমে ঘ্রাণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয়। ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে - 'গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ' (ন্যা.সূ.-১.১.১৮)। আবার মহর্ষি কণাদ 'অর্থ' বলতে, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি পদার্থকে বুঝিয়েছেন - 'অর্থ ইতি দ্রব্যগুণকর্মসু' (বৈ.সূ.-৮.২.৩)। কিন্তু কেশবমিশ্র 'অর্থ' বলতে, প্রথমে প্রতিযোগিরূপে দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থের কথা বলেছেন। আবার ঐ ছয়টি পদার্থ কথনের পর শেষে অভাব পদার্থের কথা বলেছেন। অত এব বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কেশবমিশ্র এই প্রমেয়টির দ্বারা ন্যায় ও বৈশেষিক সূত্রকারের 'অর্থ' বিষয়ক অভিমত ব্যক্ত করে উভয় সম্প্রদায়ের সমানতন্ত্রীয়তাও প্রদর্শন করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায় : ***তর্কভাষার* টীকাকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়**। সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনীকারগণ তাঁদের নিজ পরিচয় প্রদানে সর্বদা বিমুখ। কেননা, এতে গ্রন্থকর্তৃত্বের আত্ম-অহংকার প্রকাশিত হয়। সেজন্য, তাঁদের যথাযথ স্বরূপ উদ্ঘাটন বাস্তবিকই অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। অন্বেষণের ফলে *তর্কভাষার* যে সকল টীকাকারদিগের পরিচয় সম্বন্ধে আমরা যতটুকু অবগত হতে পেরেছি, তা সংক্ষেপে এরূপ - **গোবর্ধনমিশ্র** ছিলেন বিজয়শ্রী ও বলভদ্রের পুত্র এবং বিশ্বনাথ ও পদ্মনাভের অনুজ। তিনি পূর্বজ বিদ্বান পদ্মনাভের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে *তর্কভাষার* ব্যাখ্যামূলক *তর্কভাষাপ্রকাশ* নামক টীকা রচনা করেন। তাঁর সময় কাল ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগ। **চিন্নংভট্ট** ছিলেন সর্বজ্ঞের অনুজ, বিষ্ণুদেবের পুত্র এবং সহজসর্বজ্ঞের প্রপৌত্র। তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় হরিহরের পৃষ্ঠপোষকতায়

টীকাটি রচনা করেন। তাঁর সময় কাল চতুর্দশ শতক। **মাধবদেব** ছিলেন লক্ষণদেবের পুত্র ও গোদাবরী তীরের তথা শ্রীধরাসুরের অধিবাসী মাধবদেবের পৌত্র। তিনি কাশিতে বসবাস করতেন। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত তিনি বর্তমান ছিলেন। এরূপ **গোপীনাথ** ছিলেন গোঘটবংশীয় ঠাক্কুরভাবনাথের পুত্র। **নাগেশভট্ট** ছিলেন ভট্টোজিদীক্ষিতের পৌত্র হরিদীক্ষিতের সমসাময়িক। তার সময়কাল আনুমানিক সপ্তদশ শতক।

পঞ্চম অধ্যায় : ***তর্কভাষা* গ্রন্থের মর্মার্থজ্ঞাপনে *তর্কভাষাপ্রকাশ*, *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের অবদান**। টীকাকারগণ তাঁদের ব্যাখ্যানশৈলী অনুসারে *তর্কভাষা*কারোক্ত বিষয়গুলি পাঠকের কাছে কীভাবে সহজবোধ্য করে তুলেছেন, সেই বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন - *তর্কভাষা*র মঙ্গলাচরণ শ্লোকে উক্ত 'ন্যাযনয' পদের অর্থ বোঝাতে, ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। যার দ্বারা সহজেই এই বিষয়ে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বোধগম্য হয়। 'নীয়তে জ্ঞাপ্যতে বিবক্ষিতোঽর্থো যেনেতি' - এরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা উৎপন্ন 'ন্যায়' বলতে, পঞ্চাবয়ববাক্যযুক্ত অনুমানকে বোঝায়। যার দ্বারা বাদীর বিবক্ষিত অর্থ জানা যায়। একে 'পরমন্যায়'ও বলা হয়। আবার 'নীযতে প্রতিপাদ্যতে অনেন' - এরূপ ব্যুপত্তির দ্বারা উৎপন্ন 'ন্যায়' শব্দের অর্থ হল ন্যায়শাস্ত্র। *তর্কভাষা*কার ষোড়শ পদার্থের সম্যগজ্ঞানের জন্য সেগুলির উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার কথা বলেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - তত্ত্বজ্ঞান অনুমিতিস্বরূপ। পক্ষ জ্ঞানের জন্য উদ্দেশের, হেতু জ্ঞানের জন্য লক্ষণের এবং হেতুর ব্যভিচারাদি দোষ বিচারের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন। পক্ষ, সাধ্য ও হেতুর যথাযথ জ্ঞানের দ্বারা যেমন - সদ্ বা অসদনুমানের নিরূপণ করা যায়। সেরূপ - লক্ষণরূপে কথিত হেতুর দোষ বিচারের পরই আত্মাদি উদ্দেশে সেই লক্ষণের স্থাপনা করা যায়। *তর্কভাষা*কার কর্ম পদার্থের লক্ষণ ও বিভাগ নিরূপণ করলেও উৎক্ষেপণাদি পঞ্চ কর্মের বিশেষ লক্ষণ প্রতিপাদন করেননি। ***সারমঞ্জরী***কার এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পাঁচ প্রকার কর্মের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। যার দ্বারা সেই বিষয়ে যথার্থ বোধের উপপত্তি হয়। এভাবে *তর্কভাষা*র অর্থ উদ্ধারে টীকাকারদের যে প্রয়াস লক্ষিত হয়, তা ক্রমে আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ***তর্কভাষা*সম্মত প্রমেয় পদার্থ নিরূপণে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনা**। এই অধ্যায়টিতে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক *তর্কভাষা*কারোক্ত প্রমেয় পদার্থগুলি টীকাত্রয়ের আলোকে

তুলনামূলক ভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। যেমন - ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার 'প্রতিশরীরং ভিন্নঃ' - আত্মার এই স্বরূপটির দ্বারা 'আত্মত্ব' জাতি সিদ্ধির কথা বলেছেন। প্রতি শরীরে ভিন্ন আত্মা স্বীকৃত হলে, 'অহম্' 'অহম্' - এরূপ অনুগত প্রতীতির দ্বারা 'আত্মত্ব' জাতি সিদ্ধ হয়। তাই *তর্কভাষা*কার প্রতিটি শরীরে ভিন্ন আত্মা স্বীকারের কথা বলেছেন। কারণ, একব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম জাতির বাধক। কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, উক্ত বিশেষণটির দ্বারা গ্রন্থকার একাত্মবাদী বেদান্তীদের খণ্ডন করেছেন। কারণ, অদ্বৈতবাদীদের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অন্য সকল জাগতিক বিষয় মিথ্যারূপে কল্পিত হয়। আকাশ এক হয়েও যেমন উপাধিভেদে ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেরূপ একই ব্রহ্ম অবিদ্যা প্রযুক্ত হয়ে জীবাত্মারূপে তার ব্যপদেশ হয়। এরূপ চেতন পদার্থ এবং অচৈতন্য বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, তা স্বীকৃত না হওয়ায়, ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, গ্রন্থকার পূর্বোক্ত বিশেষণটির দ্বারা একাত্মবাদী বেদান্তীদের খণ্ডন করেছেন।

আবার ***সারমঞ্জরী***কারের মতে, আত্মা যদি একত্ববিশিষ্ট হয়, তাহলে আত্মার সুখাদি এবং বন্ধন বা মুক্তি ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। তাই *তর্কভাষা*কার প্রতিশরীরে আত্মার ভিন্নতার কথা বলেছেন। এই বিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "সর্বশরীরবৃত্ত্যাত্মন একত্বে সুখদুঃখাদিব্যবস্থা বদ্ধমুক্তব্যবস্থা ন স্যাত্। অতঃ প্রতিশরীরং ভিন্নঃ।"

বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 'প্রতিশরীরং ভিন্নঃ' আত্মার এই স্বরূপ সম্বন্ধে টীকাত্রয়ে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা প্রত্যেকটি আত্মাতে প্রসক্ত হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আত্মার এতাদৃশ স্বরূপই বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকারের এক একটি পদের দ্বারা টীকাকারগণ নিজ ব্যাখ্যান পদ্ধতিতে নিজ তন্ত্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

*তর্কভাষা*কার এই পৃথিবীর স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এটি কাঠিন্য এবং কোমলত্ব অবয়ব বিশিষ্ট। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, *তর্কভাষা*কার পৃথিবীর কোমলত্বাদি স্বরূপের প্রাভাকর মীমাংসকদিগের খণ্ডন করেছেন। কারণ, তাঁরা স্থূলপৃথিবীর কার্যত্ব স্বীকার করেননি। সেজন্য সাবয়বত্বহেতুর দ্বারা তাঁদের খণ্ডন করতে, গ্রন্থকার পৃথিবীর এরূপ স্বরূপের কথা বলেছেন।

*সারমঞ্জরী*কার এবিষয়ে ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর মতে, কেউ কেউ কাঠিন্যত্ব, কোমলত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট অবয়বগুলির যে সংগ্রহ বিশেষ, সেগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে পৃথিবী উৎপন্ন হয় - এরূপ অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু তা নয়। কারণ কঠিনত্ব, কোমলত্ব প্রভৃতি হল স্পর্শনিষ্ঠ। তাঁর মতে, পৃথিবী-দ্রব্য হল কঠিন, কোমলস্পর্শবত্ অবয়বের সংযোগবতী।

কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** টীকাটিতে পৃথিবী পদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পৃথিবীর পাকজ স্বরূপের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোন বিষয়ের কোন প্রকার আলোচনা পাওয়া যায় না।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার মনের অণুত্ব প্রতিপাদন প্রসঙ্গে, একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন - মনকে বিভু স্বীকার করলে, দীর্ঘ রস-গন্ধাদি যুক্ত শষ্কুল (এক ধরনের মাছ অথবা পিষ্টক) ভক্ষণকারী পুরুষের একই সময়ে রসাদি বিবিধ বিষয়ের যুগপত্ উপলব্ধি প্রসক্ত হবে। তাই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুগপত্ অনেক বিষয়ের সম্বন্ধ হলেও যার সন্নিধানবশত ক্রমে জ্ঞান উৎপন্ন হবে, তাদৃশ সহকারিকারণকে অণুপরিমাণ স্বীকার করতে। যেমন - ন্যায়সূত্রকার যুগপত্ জ্ঞানের অনুৎপত্তিকে মনের লিঙ্গ বলেছেন।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার মধ্যম ও বিভু পরিমাণ স্বীকার করলে, যে দোষ উৎপন্ন হয়, সেগুলির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, দেহ বা মধ্যম পরিমাণ স্বীকার করলে, মনের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হবে। কেননা, মধ্যম বা দেহপরিমাণ বস্তু সংকোচ ও বিকাশশালী হয়। কিন্তু মন নিরবয়ব হওয়ায় লাঘববশত নিত্য স্বীকার করতে হবে, অনিত্য স্বীকার করলে, গৌরবদোষ উপস্থিত হবে। নিজ স্বভাব অনুসারে মনের দ্বারা সমূহালম্বন জ্ঞান হলেও একই সময়ে নানা জাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না, সেজন্য মন অণুপরিমাণ।

এবিষয়ে ***সারমঞ্জরী***কার বলেছেন - চক্ষুরাদির সঙ্গে মনের সংযোগবশত চাক্ষুষাদি জ্ঞানে মনের কারণত্ব স্বীকার করতে হবে, অন্যথায় চাক্ষুষ জ্ঞানের সময় স্পার্শন প্রত্যক্ষের আপত্তি উপস্থিত হবে। ফলে দর্শন ও স্পার্শনের জন্য একই ক্ষণে একই বিষয়ের জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। কাজেই মনকে অণুপরিমাণ স্বীকার করতে হবে। এভাবে ক্রমে *তর্কভাষা*সম্মত প্রমেয় পদার্থগুলি টীকাত্রয়ের আলোকে পর্যালোচিত হয়েছে।

এই ছয়টি অধ্যায়ের শেষে রয়েছে **উপসংহার**, যেখানে তুলনামূলক সমীক্ষায় উপলব্ধ বিষয়ের পর্যালোচনা এবং সেই বিষয়ে নিজ মতামত ব্যক্ত হয়েছে।

১.৪. **গবেষণা কর্মের পদ্ধতি :** গবেষণামূলক এই নিবন্ধটিতে *তর্কভাষাপ্রকাশ, তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের আলোকে কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থের সমীক্ষায় তিনটি টীকারই সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যমূলক বিশেষত্বগুলি তুলনামূলক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা হল 'তুলনাত্মক'।

কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান এই গবেষণানিবন্ধের 'প্রয়োজন'। আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় এবং দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য 'বিষয়'। উক্ত পদার্থবিষয়ে সম্যগ্-জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি এই নিবন্ধের 'অধিকারী'। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে শাস্ত্রের (এই গবেষণানিবন্ধের) প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব হল 'সম্বন্ধ'।

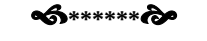

দ্বিতীয় অধ্যায় :

ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থের সামান্য পরিচয়

২.০. ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থগুলির স্বরূপ জানতে হলে, প্রথমে ন্যায়সম্মত পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কেননা, সামান্যের জ্ঞান না হলে কখনও বিশেষের জ্ঞান হতে পারে না। মহর্ষি গৌতম প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থান - এই ষোড়শ ভাবপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হতে জীবাত্মার নিঃশ্রেয়স লাভের কথা বলেছেন।[১] ন্যায়দর্শনোক্ত 'পদার্থতত্ত্ব' বলতে, উক্ত ষোড়শ পদার্থই প্রতিভাসিত হয়। এখন বক্তব্য হল, উক্ত পদার্থসমূহের মধ্যে 'সংশয়' হতে 'নিগ্রহস্থান' পর্যন্ত এই চতুর্দশ পদার্থ, পূর্বোক্ত প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থেরই অন্তর্গত। অত এব ঐ দুটি পদার্থের দ্বারাই তো উক্ত সকল পদার্থের বোধ হয়। তাহলে সংশয়াদি পদার্থের পৃথক্-উল্লেখের কারণ কী? এরূপ জিজ্ঞাসা হলে উত্তরে বলতে হবে, সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ হল ন্যায়বিদ্যার পৃথক্-প্রস্থান। সংসারে মানুষের হিতসাধনের জন্য যে চার প্রকার বিদ্যা উপদিষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যা উৎকৃষ্ট। বিদ্যাসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট হওয়ায়, এটি অন্য সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ এবং সর্বকর্মের উপায় ও সর্বধর্মের আশ্রয়স্বরূপ। বাৎস্যায়ন যথার্থই বলেছেন -

"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা॥"[২]

অত এব সংশয়াদি পদার্থ পৃথক্ভাবে প্রতিপাদিত না হলে, ন্যায়বিদ্যা উপনিষদ্ প্রভৃতির মত অধ্যাত্মবিদ্যারূপে গণ্য হত। এভাবে ন্যায়বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যহত হত। তাই মহর্ষি পৃথক্ভাবে সেই পদার্থগুলির উল্লেখ করেছেন।[৩]

২.১. ন্যায়দর্শনে প্রতিপাদিত পদার্থতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

● **প্রমাণ :** প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় পদার্থের সিদ্ধি হওয়ায়, প্রমেয় নিরূপণের পূর্বে প্রমাণ পদার্থের নিরূপণ আবশ্যক। সেজন্য মহর্ষি প্রথমে প্রমাণ এবং তারপর প্রমেয় পদার্থের প্রতিপাদন করেছেন। 'প্রমীয়তেঽনেন ইতি প্রমাণম্' - এরূপ ব্যুৎপত্ত্যনুসারে প্র-পূর্বক মা-ধাতুর উত্তর করণ-বাচ্যে ল্যুট্-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন 'প্রমাণ' শব্দটির অর্থ হল প্রকৃষ্ট বা যথার্থ জ্ঞানের করণ। মহর্ষি গৌতম প্রমাজ্ঞানের করণস্বরূপ প্রত্যক্ষাদি চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার

করেছেন - 'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি (ন্যা.সূ.-১.১.৩)।' বাচস্পতিমিশ্রের মতে, এটি প্রমাণের বিভাগসূত্রটি হলেও 'প্রমাণ' পদটির ব্যুৎপত্তির দ্বারা প্রমাণের সামান্যলক্ষণও বুঝতে হবে। *তাৎপর্যটীকা*তে বলা হয়েছে - "যদ্যপি বিভাগপরমেতত্ সূত্রম্, তথাপি প্রমাণপদসমভিব্যাহৃতং সত্ সামর্থ্যাত্ প্রমাণত্বমপি লক্ষযতীতি। তথা হি, প্রমীযতেঽনেনেত্যস্য বাক্যস্যার্থে প্রমাণপদপ্রযোগঃ। প্রমা চ স্মৃতেরন্যঃ অর্থাব্যভিচারী স্বতন্ত্রঃ পরিচ্ছেদঃ, তস্মাদ্ বিভাগপরাদপি সূত্রাত্ প্রতীযমানং প্রমাণসামান্যলক্ষণমপেক্ষিতং...।"[৪] এরূপ জয়ন্তভট্টও বলেছেন - "একেনানেন সূত্রেণ দ্বযং চাহ মহামুনিঃ। প্রমাণেষু চতুঃসংখ্যাযং তথা সামান্যলক্ষণম্॥"[৫]

মহর্ষি গৌতম স্বীকৃত প্রত্যক্ষাদি চার প্রকার প্রমাণ পদার্থের সংক্ষিপ্তরূপ -

ক. **প্রত্যক্ষ :** মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'ইন্দ্রিযার্থসন্নি-কর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসাযাত্মকং প্রত্যক্ষম্ (ন্যা.সূ. ১.১.৪)।' ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ হতে উৎপন্ন অশাব্দ, ভ্রমরহিত এবং নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ প্রমা। তার করণ হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অনুমিত্যাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ' পদ, সুখ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'জ্ঞান' পদ, শাব্দজ্ঞানে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'অব্যপদেশ্য' পদ, বিপর্যয়াত্মক ভ্রমজ্ঞানে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'অব্যভিচারী' পদ এবং সংশয়জ্ঞানে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'ব্যবসায়ত্মক' পদ লক্ষণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তবে *তাৎপর্যটীকা*কারের মতে, 'অব্যপদেশ্য' ও 'ব্যবসায়ত্মক' - এই দুটি পদের দ্বারা মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষের নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক ভেদের কথা বলেছেন।[৬] এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল ইন্দ্রিয়স্বরূপ। সেখানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ ব্যাপার এবং প্রত্যক্ষপ্রমা ফল। প্রত্যক্ষের এই লক্ষণটি জন্যবস্তুর ক্ষেত্রে প্রসক্ত হয়।

খ. **অনুমান :** গৌতম প্রত্যক্ষের পর হেতুতা সংগতির[৭] দ্বারা অনুমান প্রমাণের নিরূপণ করেছেন। কারণ, উভয়ের মধ্যে উপজীব্য-উপজীবক সম্বন্ধ বিদ্যমান। যেহেতু প্রথমে ধূমদর্শন না হলে, বহ্নি অনুমিতিতে কারো প্রসক্তি হয় না। আবার অনুমান বহুবাদিসম্মত। মহর্ষি অনুমান প্রমাণ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববচ্ছেষবত্ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ (ন্যা.সূ. ১.১.৫)।' সূত্রে 'অথ' পদটি পূর্বে নিরূপিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গে নিরূপ্যমান অনুমান প্রমাণের আনন্তর্য্যের জ্ঞাপক এবং এর দ্বারা উপজীব্য-উপজীবক ভাব সূচিত হয়েছে। তাই বিশ্বনাথ *ন্যায়সূত্রবৃত্তি*তে বলেছেন - 'আনন্তর্যবাচকোঽথশব্দো

হেতুহেতুমদ্ভাব-সংগতিসূচনায়।'[৮] এরূপ 'তৎপূর্বকম্' পদটি লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন এবং লিঙ্গদর্শনের জ্ঞাপক। তাই বাৎস্যায়ন বলেছেন - "তৎপূর্বকম্ ইত্যনেন লিঙ্গলীঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গদর্শনং চাভিসম্বন্ধ্যতে। লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধযোর্দর্শনেন লিঙ্গস্মৃতিরভিসম্বধ্যতে। স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন চাপ্রত্যক্ষো-ঽর্থোঽনুমীয়তে।"[৯] অর্থাৎ লিঙ্গপরামর্শের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ বিষয় অনুমিত হয়। সেজন্য অনুমিতির প্রতি এই লিঙ্গপরামর্শ ব্যাপার এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ। এই লিঙ্গলিঙ্গীপূর্বক অনুমান তিন প্রকার হয়। যথা - পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট।

গ. **উপমান :** অনুমান ও উপমান উভয়ই প্রত্যক্ষের উপজীবক। কিন্তু বহুবাদিসম্মতির জন্য প্রথমে অনুমান নিরূপিত হওয়ার পর, উপমান নিরূপণ অবশ্যকর্তব্য। তাই অবসর সংগতির দ্বারা সূত্রকার উপমান প্রমাণ নিরূপণ করেছেন। উপমানের লক্ষণপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন - 'প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্ (ন্যা.সূ. ১.১.৬)।' অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সমানধর্মবিশিষ্ট পদার্থের সঙ্গে সাদৃশ্যবশত সাধ্যপদার্থের নিশ্চয়ের করণ হল উপমান প্রমাণ। এর উৎপত্তি প্রক্রিয়া হল - প্রথমে ব্যক্তি আরণ্যক পুরুষয়ের কাছে হতে 'গোসদৃশো গবয়ঃ' - এরূপ অতিদেশবাক্য বাক্য শ্রবণ করার পর, সেই ব্যক্তি গোসদৃশ কোন প্রাণী দেখলে, তাঁর পূর্বের অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ হয়। তার ফলে অজ্ঞাত গবয়ত্ববিশিষ্ট পশুতে জ্ঞাত গো-পদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা তাঁর যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এরূপ যথার্থ জ্ঞানের করণকে বলা হয়, উপমান প্রমাণ। এখানে অতিদেশবাক্যার্থস্বরণ হল ব্যাপার, সাদৃশ্যজ্ঞান হল করণ এবং 'গোসদৃশ প্রাণীটি গবয় শব্দের বাচ্য' - এরূপ সংজ্ঞাসংজ্ঞীর সম্বন্ধের জ্ঞান হল উপমিতি। এই উপমিতি হল উপমানের ফল।

ঘ. শব্দ : ন্যায়দর্শনোক্ত প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দ হল চতুর্থ প্রমাণ। উপমান প্রমাণের নিরূপণের পর গ্রন্থকার অবসর সংগতির দ্বারা শব্দপ্রমাণ নিরূপণ করেছেন। মহর্ষি আপ্তব্যক্তির উপদেশকে শব্দপ্রমাণ বলে, পরবর্তী সূত্রে দৃষ্ট ও অদৃষ্টভেদে তার দুই প্রকার বিভাগের কথা বলেছেন - 'আপ্তোপদেশঃ শব্দ', 'স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ (ন্যা.সূ. ১.১.৭ ও ১.১.৮)।' এখন বক্তব্য হল, আপ্তব্যক্তি কাকে বলবো? এর উত্তরে বাৎস্যায়ন বলেছেন - 'আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপযিষযা প্রযুক্ত উপদেষ্টা।'[১০] অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার বক্তব্য বিষয়কে সূদৃঢ় প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় করেছেন এবং যিনি যথাদৃষ্ট বিষয়ের যথার্থ বাক্য প্রয়োগে প্রযুক্ত উপদেষ্টা, তিনিই আপ্ত। আর সেই ব্যক্তি ম্লেচ্ছ বা ত্রিকালদর্শী ঋষি, যে কেউ হতে পারেন। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তি হল শাব্দবোধের সহকারী কারণ। এই

আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট পদসমূহকে বাক্য বলা হয়। যথা - 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতঃ' ইত্যাদি। তাই পদজ্ঞান হল শাব্দবোধের করণ এবং পদজন্যপদার্থোপস্থিতি হল ব্যাপার।

● **প্রমেয় :** প্রমাতার যথার্থ জ্ঞানের বিষয় প্রমেয় পদবাচ্য। মহর্ষি গৌতম অপবর্গের সাক্ষাৎকারণরূপে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ করেছেন। এই অধ্যায়টির পরবর্তী অংশে সেই পদার্থগুলি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

● **সংশয় :** যে স্থলে সংশয়ের উৎপত্তি হয়, সেই স্থলেই 'ন্যায়' প্রবর্তিত হয়। অজ্ঞাত বা নিশ্চিত অর্থে ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয় না।[১১] তাই 'সংশয়' নামক পদার্থ হল পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়ের পূর্বাঙ্গস্বরূপ। মহর্ষি গৌতম সংশয় পদার্থের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'সমানানেকধর্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষা-পেক্ষো বিমর্শঃ সংশযঃ (ন্যা.সূ. ১.১.২৩)।' সূত্রোক্ত 'বিমর্শ' পদটি বি-পূর্বক মৃশ্-ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়। এই বি-উপসর্গটি 'বিরুদ্ধ' অর্থে প্রসিদ্ধ। আবার মৃশ্-ধাতুর অর্থ হল, জ্ঞান। অত এব 'বিমর্শ' শব্দের অর্থ বিরুদ্ধ বা বিপরীতজ্ঞান। তাই সংশয়, বিশেষ অপেক্ষারূপ বিমর্শ। যেমন - গাঢ় অন্ধকারে দণ্ডায়মান স্থাণুতে 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা' - এরূপ বিশিষ্টরূপে নিশ্চয় করতে না পারায়, সেখানে সংশয় উৎপন্ন হয়। আর সংশয়ের উৎপত্তি এই বিষয়গুলি থেকে হতে পারে, যেমন - (ক). সমান ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর সম্বন্ধ জ্ঞান হলে, (খ). অনেক ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান হলে, (গ). বিপ্রতিপত্তি বা বিরুদ্ধাত্মক বাক্য উপস্থিত হলে এবং (ঘ). উপলব্ধি বা অনুপলব্ধির অব্যবস্থা হলে। প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, সংশয় স্থলে বিরুদ্ধাত্মক নানা পদার্থের জ্ঞান হওয়ায়, সংশয়াত্মক জ্ঞানকে সমূহালম্বনজ্ঞান বলা যায় না।

● **প্রয়োজন :** শাস্ত্রের চারটি অনুবন্ধের মধ্যে প্রয়োজন অন্যতম। প্রয়োজন ব্যতীত কারো প্রবৃত্তি হতে পারে না। তাই শাস্ত্রে বলা হয় - 'প্রযোজনমনুদিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।'[১২] অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া মন্দ বুদ্ধিতেও প্রবৃত্তি হয় না। মহর্ষি প্রয়োজন পদার্থের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎপ্রযোজনম্ (ন্যা.সূ. ১.১.২৪)।' অর্থাৎ প্রমাতা যে বিষয়কে অধিকার করে প্রবৃত্ত হয়, সেটিকে প্রয়োজন বলে। বাৎস্যায়ন বলেছেন, যে পদার্থকে গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য - এরূপ নিশ্চয় করে, সেই পদার্থকে গ্রহণ বা ত্যাগের নিমিত্ত প্রমাতা প্রযুক্ত হয়, তাকে প্রয়োজন বলে। *ন্যায়ভাষ্যে* বলা হয়েছে - 'যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যম বা ব্যবসায তদাপ্তিহানোপাযমনুতিষ্ঠতি, প্রযোজনং তদ্বেদিতব্যম্।'[১৩] এরূপ উদ্দ্যোতকর বলেছেন - 'সুখদুঃখযোরবাপ্তিহানাভ্যামযং লোকঃ প্রযুজ্যতে ইতি সুখদুঃখাপ্তিহানী প্রযোজনমিতি।'[১৪] সুখ

ও দুঃখ জনক পদার্থবিষয়ে গ্রহণ বা বর্জনের নিমিত্ত প্রযত্নকে প্রয়োজন বলা হয়। প্রয়োজন পদার্থ ন্যায়ের পূর্বাঙ্গস্বরূপ। কারণ, প্রয়োজন ব্যতীত প্রবৃত্তি হয় না।

● **দৃষ্টান্ত :** মহর্ষি দৃষ্টান্ত পদার্থের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ (ন্যা.সূ. ১.১.২৫)।' অর্থাৎ যে পদার্থবিষয়ে লৌকিকের এবং পরীক্ষকের বুদ্ধি বা জ্ঞানসাম্য লক্ষিত হয়, তাকে দৃষ্টান্ত বলা হয়। এখানে 'লৌকিক' শব্দটির দ্বারা সাধারণ এবং 'পরীক্ষক' বলতে, যিনি প্রমাণের দ্বারা অর্থের বিচার করেন, তাকে বুঝতে হবে। এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগের দ্বারা প্রতিপক্ষের বাক্যের প্রতিষেধ করা যায়। আবার স্বপক্ষের প্রতিষ্ঠা করা যায়। এছাড়া পঞ্চাবয়ববাক্যের তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কল্পিত হয়। তাই বাৎস্যায়ন বলেছেন - 'দৃষ্টান্তবিরোধেন হি প্রতিপক্ষাঃ প্রতিষেদ্ধব্যা ভবন্তীতি, দৃষ্টান্তসমাধিনা চ স্বপক্ষাঃ স্থাপনীযা ভবন্তীতি, অবযবেষু চোদাহরণায কল্পত ইতি।'[১৫] দৃষ্টান্তের জ্ঞান না থাকলে, উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ সম্ভব হয় না। অত এব উদাহরণবাক্য, দৃষ্টান্তপদবাচ্য নয়। সংশয়, প্রয়োজন এবং দৃষ্টান্ত - এই তিনটি পদার্থ ছাড়া ন্যায়ের উপপত্তি হয় না। সেজন্য এগুলি ন্যায়ের পূর্বাঙ্গরূপে পরিচিত।

● **সিদ্ধান্ত :** মহর্ষি গৌতম 'সিদ্ধান্ত' নামক পদার্থের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ (ন্যা.সূ. ১.১.২৬)।' সূত্রস্থিত 'তন্ত্র' পদটি শাস্ত্রের বোধক এবং 'সংস্থিতি' বলতে বোঝায়, 'এই পদার্থ এই ধর্মবিশিষ্ট নয়' - এরূপ প্রামাণিক নিয়ম। মহর্ষি, সর্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ এবং অভ্যুপগমভেদে চার প্রকার সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন।[১৬] উক্ত চার প্রকার সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন শাস্ত্রদ্বারা নিশ্চয়কৃত সিদ্ধান্ত যদি অপর শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ হয়, তাহলে তাকে **সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত** বলে। যেমন - ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রভৃতি। এরূপ সমানতন্ত্রীয় শাস্ত্রসম্মত কোন সিদ্ধান্ত যখন অপর শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হয়, তখন সেই সিদ্ধান্তকে **প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত** বলে। যেমন - ন্যায়বৈশেষিক মতে, কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ। কিন্তু সাংখ্যমতে, সৎ বস্তুই সদ্রূপে উৎপন্ন হয়। আবার যে সিদ্ধান্তে একটি পদার্থের সিদ্ধিতে প্রকরণস্থিত অপর পদার্থেরও সিদ্ধি হয়, তাকে **অধিকরণসিদ্ধান্ত** বলে। যথা - দর্শন ও স্পর্শের দ্বারা একই বিষয়ের জ্ঞান হওয়ায়, এর দ্বারা যেমন কর্তারূপে আত্মার সিদ্ধি হয়, তেমনই ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় ব্যবস্থাও নির্দিষ্ট হয়। এরকম অপরীক্ষিত শাস্ত্র স্বীকৃত পদার্থের পরীক্ষা করাকে **অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত** বলে। যেমন - পরার্থানুমান ন্যায়শাস্ত্রে স্বীকৃত হলেও অনুমান সূত্রে তার উল্লেখ নেই। কিন্তু অবয়ব পদার্থের ব্যাখ্যায় প্রতিজ্ঞাদি

বাক্য পরীক্ষিত হওয়ায়, পরার্থানুমান যে ন্যায়স্বীকৃত তা বোঝা যায়। পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়কে আশ্রয় করে এই সিদ্ধান্তপদার্থ উৎপন্ন হওয়ায়, এটিকে 'ন্যায়াশ্রয়সিদ্ধান্ত' বলা হয়।

● **অবয়ব :** মহর্ষি গৌতম অবয়ব পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ (ন্যা.সূ. ১.১.৩২)।' প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ববাক্যের দ্বারা পরার্থানুমানের উৎপত্তি হয়। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বগুলি হল - (ক). প্রতিজ্ঞা : 'পর্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু তাতে ধূম আছে' - এখানে পক্ষ পর্বতে সাধ্য ধূমের সাধন করা হয়েছে। অত এব 'পর্বত বহ্নিমান্' - এই বাক্যটি হল এখানে প্রতিজ্ঞা। (খ). হেতু : এই স্থলে ধূম হেতু। কেননা, এখানে এই ধূমবত্তার দ্বারাই পর্বতে বহ্নিমত্তার নিশ্চয় করা হয়েছে। (গ). উদাহরণ : সকল ধূমবান্ বস্তুই বহ্নিমান্। যেমন - পাকশালা - এটি হল উদাহরণ। এখানে পাকশালার সঙ্গে পর্বতে ধূমের সমতা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। (ঘ). উপনয় : পর্বতও ধূমবান্। যেহেতু দৃষ্টান্তের সঙ্গে পর্বতের সমানতা উল্লিখিত হয়েছে। (ঙ). নিগমন : অত এব এই পর্বত বহ্নিমান্। উক্ত পঞ্চাবয়ববাক্যযুক্ত 'অবয়ব' নামক পদার্থটি 'ন্যায়' নামে পরিচিত। বাৎস্যায়ন এটিকে পরমন্যায় বলেছেন। এর দ্বারা বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা - এই ত্রিবিধ বিচার প্রবর্তিত হয়।

● **তর্ক :** মহর্ষি 'তর্ক' নামক পদার্থের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ (ন্যা.সূ. ১.১.৪০)।' অর্থাৎ যে বিষয়ের তত্ত্ব জ্ঞাত হয়নি, সেই পদার্থবিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব অবধারণের নিমিত্ত কারণ উপস্থিত হলে, যে ঊহের উৎপত্তি হয়, তাই তর্ক। এই তর্কপদার্থের স্বরূপবিষয়ে বহুবিধ যুক্তি পাওয়া যায়। উদ্দ্যোতকর সেই সকল মতের খণ্ডন করে, শেষে সম্ভাবনা মূলক 'ভবেদ্' শব্দের প্রয়োগ করে, তিনি সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানকে তর্ক বলেছেন - "কিং পুনরস্য স্বরূপম্? ভবেদিত্যেষ প্রত্যয ইত্যতদস্য স্বরূপমিতি।"[১৭] আবার উদয়নাচার্য অনিষ্টপ্রসঙ্গকে তর্ক বলে, তার পাঁচ প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। এই বিষয়ে *তাৎপর্যপরিশুদ্ধিতে* বলা হয়েছে - "স্বরূপমনিষ্টপ্রসঙ্গঃ। স চাত্মাশ্রযেতরেতরাশ্রযচক্রকানবস্থাপ্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গভেদেন পঞ্চবিধঃ।"[১৮] এছাড়াও তর্ক পদার্থের স্বরূপবিষয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিবিধ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

● **নির্ণয় :** পক্ষ ও প্রতিপক্ষের উদ্ভাবন করে, বিচারপূর্বক কোন এক পক্ষের অর্থের অবধারণ করাকে নির্ণয় বলে। মহর্ষি নির্ণয়ের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণযঃ (ন্যা.সূ. ১.১.৪১)।' অর্থাৎ সংশয় স্থলে বাদী ও

প্রতিবাদীর স্বপক্ষের স্থাপন এবং পরপক্ষের খণ্ডন দ্বারা যে অর্থের অবধারণ হয়, তাই নির্ণয়। কিন্তু নির্ণয় মাত্রই সংশয়পূর্বক নয়। সেজন্য বাৎস্যায়ন বলেছেন - "ন চাযং নির্ণযে নিযমঃ বিমৃশ্যৈব পক্ষ-প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয ইতি, কিং তর্হি? ভবতি খল্বিন্দ্রিযার্থ-সন্নিকর্ষাদুৎপন্নপ্রত্যক্ষেঽর্থাবধারণং নির্ণয ইতি, পরীক্ষাবিষযে তু বিমৃশ্য পক্ষ-প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণযঃ। শাস্ত্রে বাদে চ বিমর্শবর্জনম্।"[১৯] অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ' হতে, 'শাস্ত্র' ও 'বাদ নামক কথা হতে যে অর্থের অবধারণ হয়, সেগুলি সংশয়পূর্বক নয়। অত এব গৌতমোক্ত নির্ণয় তর্কপূর্বক তত্ত্বের নির্ণয়। ন্যায়প্রযুক্ত হওয়ায় পর, তর্ক ও নির্ণয় - এই দুটি বিষয় প্রযুক্ত হয়। তাই এই দুটি পদার্থ পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়ের 'উত্তরাঙ্গ' নামে পরিচিত।

● **বাদ :** মহর্ষি গৌতম 'বাদ' নামক পদার্থটির স্বরূপবিষয়ে বলেছেন- 'প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবযবোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ (ন্যা.সূ. ১.২.১)।' সূত্রস্থিত 'সাধন' পদটির অর্থ স্বপক্ষের স্থাপন এবং 'উপালম্ভ' পদটির অর্থ হল প্রতিপক্ষের প্রতিষেধ বা খণ্ডন। অর্থাৎ প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা নিজ পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষের প্রতিষেধজন্য সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, পঞ্চাবয়ব হতে উৎপন্ন এবং পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্বীকৃতিমূলক বাক্যসমূহকে বাদ বলা হয়।

● **জল্প :** মহর্ষি গৌতম জল্পের স্বরূপপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'যথোক্তোপপন্নশ্ছলজাতি-নিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভো জল্পঃ (ন্যা.সূ. ১.২.২)।' অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাদলক্ষণের উক্ত সকল বিশেষণ দল এখানে প্রযুক্ত হবে। সূত্রে 'যথোক্ত' পদটির দ্বারা সেই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বিচার স্থলে ছল জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা কোন বিষয়ের অবধারণ করাকে জল্প বলে হয়।

● **বিতণ্ডা :** সেই জল্প যদি প্রতিপক্ষের স্থাপনাশূন্য হয়, তাকে বিতণ্ডা বলা হয়। মহর্ষি বিতণ্ডার লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা (ন্যা.সূ. ১.২.৩)।' ন্যায়পদ্ধতি অনুসারে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা - 'কথা' নামে পরিচিত। আর এই কথাত্রয়ের মধ্যে জল্প ও বিতণ্ডা, মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞানের রক্ষণ করে। সেই বিষয়টি বোঝাতে মহর্ষি পরীক্ষা প্রকরণে বলেছেন - 'তত্ত্বাধ্যবসাযসংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে, বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবত্ (ন্যা.সূ.

৪.২.৫০)।' অর্থাৎ কণ্টকশাখা যেমন ক্ষেত্রে উৎপন্ন বীজের রক্ষক হয়, সেরূপ জল্প ও বিতণ্ডাও মুমুক্ষুর অর্জিত তত্ত্বজ্ঞানের রক্ষক।

● **হেত্বাভাস :** পূর্বোক্ত বাদ, জল্প ও বিতণ্ডায় হেত্বাভাসের জ্ঞান আবশ্যক। তাই মহর্ষি ঐ তিনটি কথার পর হেত্বাভাসের কথা বলেছেন। নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ হেত্বাভাসের সামান্যলক্ষণ দিয়েছেন - "যদ্বিষযকত্বেন জ্ঞানস্যানুমিতিবিরোধিত্বং তত্ত্বং হেত্বাভাসত্বম্।"[২০] মহর্ষি গৌতম হেত্বাভাস নিরূপণ-প্রসঙ্গে তার পাঁচ প্রকার বিভাগের কথা বলেছেন - 'সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ(ন্যা.সূ.-১.২.৪)।' এই হেত্বাভাস গুলির স্বরূপ ও প্রকার বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্যদের মধ্যে বিবিধ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন - সব্যভিচার হেত্বাভাসের অপর নাম অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। এটি সাধারণ, অসাধারণ এবং অনুপসংহারী ভেদে আবার তিন প্রকার। যে হেতুটি সাধ্যাভাবের অধিকরণেও থাকে, তাকে সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। যেমন - পর্বত বহ্নিবিশিষ্ট, যেহেতু তাতে প্রমেয়ত্ব আছে। এখানে প্রমেয়ত্ব হেতুটি বহ্নির অভাবের অধিকরণ জলহ্রদেও বিদ্যমান। এরূপ নৈয়ায়িকগণ হেত্বাভাসের নামান্তর ও দৃষ্টান্ত-বিষয়ে বহুবিধ মতবাদ পোষণ করেছেন।

● **ছল :** হেত্বাভাসের পর ছল পদার্থ নিরূপিত হয়েছে। মহর্ষি ছল পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন - 'বচনবিঘাতোঽর্থাবকল্পোপপত্ত্যা ছলম্ (ন্যা.সূ. ১.২.১০)।' অর্থাৎ বাদীর দ্বারা প্রযুক্ত হেতুর অন্যরূপ অর্থ কল্পনা করে, তার দ্বারা প্রতিবাদীর যে প্রতিষেধ, তাকে ছল বলা হয়। এই ছল পদার্থ বাক্, সামান্য ও উপচারভেদে তিন প্রকার হয়। সামান্যভাবে কথিত বিষয়কে বক্তার অভিপ্রায় হতে ভিন্ন অর্থ কল্পনা করে, বাক্য প্রয়োগ করাকে বাক্-ছল বলে। যেমন- বাদী যদি বলেন 'নবকম্বলবিশিষ্ট বালক'। অর্থাৎ এখানে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ যদি হয় 'নতুন কম্বলবিশিষ্ট বাকল,' প্রতিবাদী এর অন্যরূপ অর্থ কল্পনা করে বলবেন 'নব সংখ্যক কম্বলবিশিষ্ট বাকল'। এখানে যে ছলের প্রয়োগ হল, তা বাক্-ছল। এরূপ সম্ভাব্যমান পদার্থের সঙ্গে অতিসামান্য যোগবশত অসম্ভব অর্থ কল্পনা দ্বারা বাদীর অর্থের প্রতিষেধ করাকে 'সামান্যছল' বলে। আবার ধর্মবিকল্পনির্দেশক বাক্যে অর্থের সদ্ভাবের প্রতিষেধ করাকে 'উপচারছল' বলা হয়।

● **জাতি :** বৈশেষিক দর্শনে সামান্য বা জাতি বলতে, যা বোঝায়, ন্যায়শাস্ত্রে 'জাতি' শব্দটি সেই অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। মহর্ষি গৌতম জাতির স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন - 'সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ (ন্যা.সূ. ১.২.১৮)।' অর্থাৎ বাদী সাধ্যসাধনের জন্য কোন হেতু প্রয়োগ

করলে, সাধর্ম ও বৈধর্মের দ্বারা প্রতিবাদী, বাদীর বক্তব্যে যে দোষ উদ্ভাবন করেন, তাকে জাতি বলা হয়। মহর্ষি পরীক্ষা প্রকরণে সাধর্ম, বৈধর্ম, উৎকর্ষ, অপকর্ষ, বর্ণ, অবর্ণসমা প্রভৃতি চব্বিশ প্রকার জাতির উল্লেখ করে ক্রমে সেগুলি ব্যাখ্যা করেছেন।

● **নিগ্রহস্থান :** মহর্ষি গৌতম নিগ্রহস্থানের স্বরূপপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্ (ন্যা.সূ. ১.২.১৯)।' 'নিগ্রহ' শব্দটির অর্থ হল পরাজয়। অতএব 'নিগ্রহস্থান' বলতে বোঝায়, পরাজয়ের স্থান। সেটি বিপ্রতিপত্তি বা বিপরীত জ্ঞান এবং অপ্রতিপত্তি বা জ্ঞানবিশেষের অভাব থেকে হতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রে প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর ইত্যাদি দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থানের কথা বলা হয়েছে। হেত্বাভাস হতে নিগ্রহস্থান পর্যন্ত এই চারটি পদার্থ বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা - নামক কথার অঙ্গস্বরূপ।

পূর্বোক্তরূপে ন্যায়সম্মত পদার্থতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হল।

২.২. আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের সামান্য পরিচয় :

'প্রমা' হল যথার্থানুভব। প্রমার করণ হল প্রমাণ। সেজন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ বস্তুমাত্রই 'প্রমেয়' অভিহিত হয়। তাই বলা হয় - 'প্রমাতা যোঽর্থঃ প্রমীয়তে তৎপ্রমেযম্'।[২১] শ্রীমদ্ মাধবাচার্য বলেছেন – 'প্রমাযাং যদ্ধি প্রতিভাসতে তৎপ্রমেযম্।'[২২] এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি গৌতম প্রমাণকেও প্রমেয় বলেছেন – 'প্রমেযা চ তুলা প্রামাণ্যবত্ (ন্যা.সূ. ২.১.১৬)।' উপলব্ধির বিষয় হল প্রমেয় এবং তার সাধন প্রমাণ। তাই উপলব্ধির সাধনত্ব ও বিষয়ত্ব যথাক্রমে 'প্রমাণ' ও 'প্রমেয়' নামে অভিহিত হয়। এবিষয়ে আচার্য বাৎস্যায়ন বলেছেন - "প্রমাণং প্রমেযমিতি চ সমাখ্যা সমাবেশেন বর্ততে, সমাখ্যানিমিত্তবশাত্। সমাখ্যানিমিত্তং তূপলব্ধিসাধনং প্রমাণম্, উপলব্ধিবিষযশ্চ প্রমেযমিতি। যদা চোপলব্ধিবিষযঃ কস্যচিদুপলব্ধিসাধনং ভবতি, তদা প্রমাণং প্রমেযমিতি চৈকোঽর্থোঽভিধীযতে।"[২৩] তবে প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ বস্তুমাত্রেরই প্রমেয় সংজ্ঞা হলেও মহর্ষি গৌতম আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকেই 'প্রমেয়' নামে অভিহিত করেছেন। কারণ, তাঁর মতে, মোক্ষ বা অপবর্গের জনকতা সাক্ষাৎভাবে উক্ত দ্বাদশ পদার্থের মধ্যেই বিদ্যমান। তিনি বলেছেন - 'আত্মশরীরেন্দ্রিযার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেযম্ (ন্যা.সূ. ১.১.৯)।' অত এব ন্যায়সম্মত 'প্রমেয়-পদার্থ' বলতে, আমাদের আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকেই বুঝতে হবে।

কেননা, ‘প্রমেয়’ শব্দটি সেখানে পারিভাষিক অর্থে উক্ত দ্বাদশ পদার্থের জ্ঞাপক। বাৎস্যায়নের মতে, উক্ত দ্বাদশ পদার্থ ব্যতিরিক্ত প্রমেয় পদার্থ বিদ্যমান। কিন্তু এই দ্বাদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানজন্য জীবের অপবর্গ হয় এবং মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংসার হয়। সেজন্য মহর্ষি এগুলিকে বিশেষভাবে প্রতিপাদন করেছেন। *ন্যায়ভাষ্যে* এবিষয়ে বলা হয়েছে - “অস্ত্যন্যদপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষসমবাযাঃ প্রমেযং তদ্ভেদেন চাপরিসংখ্যেযম্। অস্য তু তত্ত্বজ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যাজ্ঞানাত্ সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টঃ বিশেষেণেতি।”[২৪] অত এব মহর্ষি কণাদ কথিত দ্রব্যাদি প্রমেয় পদার্থগুলি যে মহর্ষি গৌতমও স্বীকার করেছেন, তা বোঝা যায়।

তবে দ্রব্যাদি ভেদে প্রমেয় অসংখ্য হলেও গৌতমের মতে, উক্ত আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থই সাক্ষাৎভাবে মোক্ষের জনক। আর উল্লিখিত ঐ প্রমেয় পদার্থগুলির মধ্যে আত্মা ও অপবর্গ উপাদেয় এবং অন্যান্য পদার্থগুলি হেয়রূপে গণ্য হয়। তবে *তাৎপর্যটীকা*কারের মতে, মুমুক্ষুর কাছে স্বীয় আত্মা সুখদুঃখাদির ভোক্তারূপে উপপন্ন হলে, হেয়রূপে প্রতীত হয়। আবার কৈবল্যাবস্থায় আত্মা উপাদেয় হয়। এবিষয়ে *তাৎপর্যটীকা*তে বলা হয়েছে - ‘আত্মন্যযং বিশেষেণ যদনেন রূপেণ হেযঃ, কৈবল্যেন চোপাদেয।’[২৫]

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, উল্লিখিত প্রমেয় পদার্থগুলির মধ্যে ‘সুখ’ নামক কোন পদার্থ নেই। প্রশ্ন হতে পারে, মহর্ষি গৌতম কি সুখপদার্থকে স্বীকার করেননি? তাই পূর্বপক্ষের এরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে গৌতম বলেছেন - ‘ন সুখস্যাপ্যন্তরালনিষ্পত্তেঃ (ন্যা.সূ. ৪.১.৫৬)।’ অর্থাৎ সংসারে যেহেতু দুঃখের অন্তরালে সুখের উৎপত্তি হয়, তাই প্রত্যাত্মবেদনীয় সুখপদার্থ কখনও অস্বীকৃত হতে পারে না। তাই পরবর্তীকালে জৈন আচার্য হরিভদ্র সূরি গৌতমোক্ত আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে ‘সুখ’ পদার্থেরও উল্লেখ করেছেন - ‘প্রমেযং চাত্মদেহার্থবুদ্ধীন্দ্রিযসুখাদি চ...।’[২৬] তত্ত্বজ্ঞানে যত্নবান্ পুরুষ যদি সুখ ও সুখসাধন সকল বিষয়কে দুঃখরূপে উপলব্ধি করে, তাহলে তার কাছে সংসারের সকল বিষয়ই দুঃখরূপে প্রতীত হবে। ফলে সে সমাধিভাবনার দ্বারা ক্রমে অপবর্গ লাভ করতে পারবে। বাৎস্যায়ন গৌতমের এরূপ অভিপ্রায় বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – ‘জন্মন এবেদং সসুখসাধনস্য দুঃখানুসঙ্গাদ্দুঃখেনাবিপ্রযোগাদ্বিবিধবাধনাযোগাদ্দুঃখমিতি সমাধিভাবনামুপদিষ্যতে।’[২৭] সেজন্য মহর্ষি প্রমেয় সূত্রে সুখপদার্থের উল্লেখ না করে, সুখ ও তার সাধনসমূহকে দুঃখভাবনার উপদেশ করেছেন।

২.২.০. আত্মা : জীবাত্মা মিথ্যাজ্ঞান জন্য সংসার ভোগ করে। আবার তত্ত্বজ্ঞান জন্য অপবর্গ লাভ করে। তাই দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে আত্মা প্রধান। মহর্ষি গৌতম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন – 'ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্ (ন্যা.সূ. ১.১.১০)।' অর্থাৎ ইচ্ছাদি গুণগুলি হল আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক। এই গুণগুলির দ্বারা আত্মা অনুমিত হয়। মহর্ষি এই স্থলে আত্মন্ শব্দের দ্বারা দ্বিবিধ আত্মারই উল্লেখ করেছেন। পরমাত্মাতেও নিত্যসুখ, নিত্যপ্রযত্নাদি গুণগুলি স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত আত্মানুমাপক লিঙ্গের উপপাদন প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন বলেছেন – "যজ্জাতীযস্যার্থস্য সন্নিকর্ষাত্ সুখমাত্মোপলব্ধবান্, তজ্জাতীযমেবার্থং পশ্যন্নুপাদাতুমিচ্ছতি। সেযমুপাদাতুমিচ্ছা একস্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাদ্ ভবতি লিঙ্গমাত্মনঃ। নিযতবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি।"[২৮] অর্থাৎ প্রমাতা যে জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষ হলে সুখ উপলব্ধি করে, সেই জাতীয় পদার্থকে পুনরায় দেখে, তাকে গ্রহণের নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর সেই ইচ্ছা অনেকার্থদর্শী একই আত্মার দর্শন প্রতিসন্ধানের ফল। উক্ত দর্শন প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞাবশত সুখোপলব্ধি ও গ্রহণের ইচ্ছা হল আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক। কিন্তু আত্মা যদি নিয়ত বা ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী হয়, তাহলে উক্ত প্রকার দর্শন প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় না। যেমন - অন্য দেহে সম্ভব হয় না। একই ভাবে দুঃখজনক পদার্থ বিষয়ে দ্বেষ ও সুখজনক পদার্থকে গ্রহণের নিমিত্ত প্রযত্নও আত্মার অনুমাপক হয়।

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, বৌদ্ধ দর্শনে চিত্ত এবং তৎসম্বন্ধীয় রূপাদি পাঁচটি স্কন্ধের কথা বলা হয়েছে।[২৯] তাঁদের মতে, উক্ত পঞ্চস্কন্ধের সমুদায়ই হল আত্মা। এই পঞ্চস্কন্ধ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। সুতরাং বৌদ্ধ মতে, আত্মা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আত্মা ক্ষণস্থায়ী হলে প্রমাতার পূর্বোক্ত প্রকার দর্শন প্রতিসন্ধান সম্ভব হতে পারে না। অত এব বাৎস্যায়ন আত্মার স্বরূপ কথন প্রসঙ্গে বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদের খণ্ডন এবং আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন উভয়েরই সূচনাও করেছেন।

নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথের মতে, আত্মলক্ষণস্থিত 'লিঙ্গম্' পদটি 'লক্ষণ' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এবিষয়ে *ন্যায়সূত্রবৃত্তি*তে বলা হয়েছে - "অত্র চাঽত্মনঃ প্রত্যক্ষত্বাল্লিঙ্গকথনমসংগতম্...।"[৩০] অর্থাৎ 'অহং সুখী', 'অহং দুঃখী' ইত্যাদি প্রকার মানসপ্রত্যক্ষ কালে মনের দ্বারা সেই অহং জ্ঞানের আশ্রয়রূপে নিজশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার প্রত্যক্ষ হয়। তাই তিনি আত্মাকে মনোমাত্রের গোচর বলেছেন - 'অহংকারস্যাশ্রযোঽযং

মনোমাত্রস্য গোচরঃ।'[৩১] অর্থাৎ প্রত্যক্ষবেদ্য হওয়ায়, আত্মার লিঙ্গকথন অসংগত। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, আচার্য বাৎস্যায়নও *বৈশেষিকসূত্র* উপস্থাপনপূর্বক আত্মমনোসংযোগ দ্বারা যোগজ সন্নিকর্ষজন্য আত্মার অলৌকিকপ্রত্যক্ষের কথা বলেছেন – "প্রত্যক্ষং যুঞ্জানস্য যোগসমাধিজম্ 'আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মা প্রত্যক্ষম্' (বৈ.সূ. ৯.১.১১) ইতি।"[৩২]

কিন্তু যোগজ সন্নিকর্ষজন্য নিজ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার প্রত্যক্ষ হলেও দেবদত্তাদি শরীরস্থিত আত্মা অনুমেয় পদার্থ। তাই বাৎস্যায়ন ও অন্যান্য প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ আত্মলক্ষণের ঐরূপ ব্যাখ্যা করেননি। কারণ, মহর্ষি গৌতম সূত্রস্থিত আত্মন্ শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা - এই উভয়বিধ আত্মাকেই বুঝিয়েছেন। তাই নিজশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা প্রত্যেক্ষ হলেও পরমাত্মা কখনও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয় হতে পারে না। সেজন্য তাঁদের মতে, লক্ষণস্থিত 'লিঙ্গম' পদটি অনুমাপক অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। তাড়াছা 'লিঙ্গতে জ্ঞায়তে অনেন ইতি' অথবা 'লীনমর্থং গময়তীতি' ইত্যাদি প্রকার ব্যুৎপত্তির দ্বারা 'লিঙ্গ' শব্দের জ্ঞাপক বা অনুমাপক অর্থেরই বোধ হয়। বৈশেষিক দর্শনেও সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্নাদি গুণগুলি আত্মার লিঙ্গরূপে উক্ত হয়েছে। সেখানে মহর্ষি কণাদ বলেছেন – 'প্রাণাপাননিমেষোন্মেষ-জীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চ আত্মনো লিঙ্গানি (বৈ.সূ. ৩.২.৪)।' অর্থাৎ প্রাণ, অপান, নিমেষ, উন্মেষ প্রভৃতি বায়ুর ক্রিয়া যার দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি প্রযত্নের দ্বারা যিনি অনুমিত হন, তিনিই আত্মা। প্রশস্তপাদাচার্যও সুখাদি গুণের দ্বারা গুণী আত্মার অনুমানের কথা বলেছেন - 'সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নৈশ্চ গুণৈর্গুণ্যনুমীয়তে।'[৩৩] অতএব 'লিঙ্গম্' পদটি অনুমাপক অর্থেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

নাস্তিক শিরোমণি চার্বাকদের মধ্যে আত্মবিষয়ক তিনটি মতবাদ প্রচলিত। সেগুলি হল - দেহাত্মাবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ এবং মনাত্মবাদ। তাঁদের মধ্যে, দেহাত্মবাদীরা বলেন লৌকিকে আমরা 'স্থুলোঽহম', 'কৃশোঽহম' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করি। এর দ্বারা সমানাধিকরণ্যবশত স্থুলত্বাদিতে দেহধর্মত্বই প্রকাশিত হয়। কিণ্ব প্রভৃতি মদশক্তির ফলে পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয় হতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ উৎপন্ন হয়। সেই চৈতন্যবিশিষ্টদেহই আত্মা।

বস্তুত পূর্বপক্ষের এরূপ অভিপ্রায় যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, চৈতন্য শরীরের গুণই নয়। তাই শরীরকে আত্মারূপে প্রতিপন্ন করা ভ্রান্তিমাত্র। চৈতন্য বা জ্ঞান যদি শরীরের গুণ হত, তাহলে শরীরের স্থিতিকাল পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকত। কিন্তু তা থাকে না। তাই গৌতম

বলেছেন - 'যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদ্রূপাদীনাম্ (ন্যা.সূ. ৩.২.৪৭)।' অর্থাৎ রূপ প্রভৃতি গুণ যেমন বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত গুণী দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, সেরূপ 'চৈতন্য' নামক গুণটি শরীরে থাকে না। অত এব চৈতন্য শরীরের গুণ নয়।

অন্য এক শ্রেণীর চার্বাকদের মতে, লৌকিকে যে, 'মূকোঽহম্' 'কাণোঽহম্' ইত্যাদি প্রকার বাক্য প্রয়োগ হয়, তার দ্বারা ইন্দ্রিয়ধর্ম সমানাধিকরণ্যবশত ইন্দ্রিয়ই 'অহম্' আলম্বনের বিষয়রূপে জ্ঞাত হয়। অত এব ইন্দ্রিয়ই আত্মা। কিন্তু নৈয়ায়িকদের মতে, ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলা যাবে না। যেহেতু, দর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা একই কর্তার একই অর্থ বা বিষয়ের গ্রহণ হয় - 'দর্শনস্পার্শনাভ্যামেকার্থ গ্রহণাত্ (ন্যা.সূ. ৩.১.১)।' অর্থাৎ কোন পদার্থ একই সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে চক্ষু বা ত্বগিন্দ্রিয় উক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্তা নয়। অত এব এর দ্বারা সূচিত হয় উক্ত দর্শন ও ত্বাচ্ প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্তা একজনই। আর সেই কর্তা হলেন আত্মা। অত এব ইন্দ্রিয় আত্মা নয়।

আপত্তি হতে পারে, প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেহেতু তাদের গ্রাহ্যবিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়, সেহেতু তদ্ব্যতিরিক্ত চেতন পদার্থ স্বীকার অযৌক্তিক। কিন্তু নৈয়ায়িকদের মতে, ইন্দ্রিয়গুলির ঐরূপ বিষয়ব্যবস্থা থেকে আত্মার স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বারা আত্মার প্রতিষেধ হয় না। সেজন্য মহর্ষি বলেছেন – 'তদ্ব্যবস্থানাদেবাত্মসদ্ভাবাদপ্রতিষেধঃ (ন্যা.সূ. ৩.১.৩)।' কারণ, যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় ব্যবস্থা নির্দিষ্ট, সেহেতু ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত বিষয়ের উপলব্ধির জন্য, একজন সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয় গ্রাহী জ্ঞাতা বা চেতন পদার্থ স্বীকার আবশ্যক। উক্ত চেতন পদার্থটি হল আত্মা। তাই বাৎস্যায়ন বলেছেন – 'যস্মাত্তু ব্যবস্থিতবিষযাণীন্দ্রিযাণি, তস্মাত্তেভ্যোঽন্যশ্চেতনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিষযগ্রাহী বিষয়ব্যবস্থিতিতোঽনুমীযতে।'[৩৪] অত এব সেই বিষয় ব্যবস্থার দ্বারা চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মাই অনুমিত হয়।

অন্য একদল চার্বাক বলেন, সুসুপ্তিকালে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উপরম হলে, স্বপ্নাবস্থায় দেবশরীর লাভ করে, 'নাহং মনুষ্য, দেবোঽহম্' ইত্যাদি প্রকার প্রতীতি হয়। আবার সেই অনুযায়ী ভোগও সম্পন্ন হয়। অত এব মনই উক্ত 'অহম্' আলম্বনের বিষয়। সুতরাং মনই আত্মা। এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য হল, মন হল জ্ঞানের সাধন। আর আত্মা হল সেই জ্ঞানের বোদ্ধা বা জ্ঞাতা। তাই মনকে যদি আত্মা বলা হলে, তা নাম মাত্রই। কার্যত মন সুখ দুঃখাদি অন্তর্বিষয় উপলব্ধর সাধন। তাই মহর্ষি বলেছেন – 'জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ

সংজ্ঞাভেদমাত্রম্ (ন্যা.সূ. ৩.১.১৬)।' কারণ, বাহ্যবিষয় প্রত্যক্ষের করণ থাকবে, কিন্তু অন্তর্বিষয়ের প্রত্যক্ষের করণ থাকবে না, এরূপ নিয়ম হতে পারে না। সেজন্য মহর্ষি বলেছেন – 'নিযমশ্চ নিরনুমানঃ (ন্যা.সূ. ৩.১.১৭)।' মনের দ্বারা আত্মা সকল প্রকার সুখদুঃখাদি বিষয় অনুভব করে। তাই আত্মা সর্বদ্রষ্টা, সর্বভোক্তা, সর্বজ্ঞ ও সর্বানুভাবী নামে অভিহিত হয়।[৩৫] সুতরাং আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন হতে ভিন্ন পদার্থ।

শরীরাদি হতে ব্যতিরিক্ত আত্মা নিত্যস্বরূপ। কারণ, জন্মমাত্রই শিশুর স্তন্যপানের প্রবৃত্তি দেখা যায়। নবজাত শিশুর এরূপ স্তন্যপানের প্রবৃত্তি, তার পূর্বজন্মের অভ্যাসজনিত কারণে উপপন্ন হয়। কেননা, পূর্বে যদি কোন বিষয়ের জ্ঞান না থাকে, তাহলে সেই বিষয়টির প্রথম দর্শনে আমরা সেটিকে অজ্ঞাত বলেই চিহ্নিত করি। সেরূপ পূর্বে যদি দুগ্ধপান না করত, বা সেই বিষয়ক কোন সংস্কার না থাকত, তাহলে সে ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই দুগ্ধপানে সচেষ্ট হত না। এছাড়াও নবজাত শিশুর যে, হর্ষ, ভয় ও শোক প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাও তার পূর্বজন্মস্থিত হর্ষাদি বিষয়ের স্মরণরূপ সংস্কার বিশেষ। কেননা, নবজাত শিশুর উক্ত বিষয়গুলির অনুভব না হওয়ায়, বর্তমান জন্মে সেই বিষয়ক সংস্কার উৎপন্ন হতে পারে না। তাই *ন্যায়সূত্রকার* বলেছেন - 'পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষভযশোকসম্প্রতিপত্তেঃ।' 'প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাত্ স্তন্যাভিলাষাত্ (ন্যা.সূ. ৩.১.১৮ ও ৩.১.২১)।' ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা অনুমিত আত্মা স্বরূপত নিত্যশুদ্ধমুক্ত স্বভাবের। মহর্ষি গৌতম ন্যায়শাস্ত্রে এভাবে আরও বহুবিধ যুক্তিসমন্বয়ে পূর্বপক্ষখণ্ডনপূর্বক দেহাদি ভিন্ন আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

এখন বক্তব্য হল, নিজ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা যোগজসন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ হলেও দেবদত্তাদি শরীরস্থিত আত্মা অনুমেয় পদার্থ। তাই নিত্যত্ববিশিষ্ট আত্মার অনুমান-প্রামাণ্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন সামান্যতঃদৃষ্ট অনুমানের কথা বলেছেন – 'সামান্যতো দৃষ্টং নাম যত্রাপ্রত্যক্ষে লিঙ্গলিঙ্গীনোঃ সম্বন্ধে কেনচিদর্থেন লিঙ্গস্য সামান্যাদপ্রত্যক্ষো লিঙ্গী গম্যতে। যথেচ্ছাদিভিরাত্মা। ইচ্ছাদযো গুণাঃ গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থানাঃ তদ্-যদেষাং স্থানং স আত্মেতি।'[৩৬] অর্থাৎ যে স্থলে অনুমেয় পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, যেখানে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষগম্য হয় না, সেখানে কোন পদার্থের সামান্যব্যাপ্তিসম্বন্ধের ফলে, সেই অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গী অনুমিত হলে, ঐ অনুমানকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে। যেমন – ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা আত্মা অনুমিত হয়। আত্মা লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য। তাই ইচ্ছা প্রভৃতি গুণে আত্মার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়

না। কিন্তু গুণমাত্রই দ্রব্যাশ্রিত – এরূপ সামান্যব্যাপ্তির ফলে গুণত্বে দ্রব্যাশ্রয়ত্বের প্রত্যক্ষ হয়। এভাবে ইচ্ছাদি গুণের আশ্রয়রূপে অপ্রত্যক্ষ আত্মা অনুমিত হয়।

কিন্তু উদ্দ্যোতকরের মতে, আত্মা শেষবদ্ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। তাঁর মতে, গুণ পদার্থমাত্রই দ্রব্যাশ্রিত - এরূপ সামান্যব্যাপ্তির ফলে গুণের দ্রব্যাশ্রিতত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের আশ্রয় পৃথিব্যাদি অন্য কোন দ্রব্য সিদ্ধ না হলে, শেষে পরিশেষ অনুমানের দ্বারা আত্মতন্ত্রতাই সিদ্ধ হয়। এবিষয়ে *ন্যায়বার্তিকে* বলা হয়েছে - "আত্মতন্ত্রতা পরিশেষাত্, আত্মসংবেদ্যত্বাত্ বাহ্যকরণাপ্রত্যক্ষাত্বাচ্চ। ন পৃথিব্যাদিষু। পৃথিব্যাদিগুণাঃ প্রত্যক্ষাঃ যে তে স্বাত্মপরাত্মপ্রত্যক্ষাঃ বাহ্যকরণপ্রত্যক্ষাশ্চ। আত্মপ্রত্যক্ষাস্ত্বিচ্ছাদয়ঃ। তস্মান্ন পৃথিব্যাদিষু আকাশান্তেষু। ন দিক্কালমনঃসু, তদ্ গুণানাং তদ্বদতীন্দ্রিয়ত্বাত্। ন চ দ্রব্যান্তরং শিষ্যতে। আত্মা চ শেষঃ। তস্মাত্ তন্ত্রতা। ইতি।"[৩৭]

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, মহর্ষি গৌতম কিন্তু এই পরিশেষ অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের আত্মগুণত্ব সিদ্ধ করেছেন। বাৎস্যায়ন সেই বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন – "পরিশেষো নাম প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাচ্ছিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়মনসাং প্রতিষেধে দ্রব্যান্তরং ন প্রসজ্যতে, শিষ্যতে চাত্মা, তস্য গুণো জ্ঞানমিতি জ্ঞাযতে।"[৩৮]

অত এব আমরা বলতে পারি যে, 'গুণ মাত্রই দ্রব্যাশ্রিত' - এটি হল সামান্যব্যাপ্তি। ইচ্ছা প্রভৃতি পৃথিব্যাদি কোন দ্রব্যের গুণ না হলে, শেষে সেগুলির আত্মগুণত্ব সিদ্ধ হয়। তাই 'যথোত্তরোত্তরঃ হি মুনিনাং প্রামাণ্যম্' - এই ন্যায় অনুসারে উদ্দ্যোতকরের যুক্তিটি সমীচীন বলে মনে হয়।

২.২.২. শরীর : চৈতন্যবিশিষ্ট জীবের ভোগের আধার হল শরীর। শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মারই ভোগ সম্পন্ন হয়। তাই মহর্ষি আত্মার পর তার ভোগের অধিষ্ঠান শরীরের উল্লেখ করেছেন। তিনি শরীর পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন – 'চেষ্টেন্দ্রিযার্থাশ্রযঃ শরীরম্ (ন্যা.সূ. ১.১.১১)।' অর্থাৎ চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয় হল শরীর। সূত্রস্থিত 'চেষ্টা' পদটি ক্রিয়ামাত্রের বাচক হলেও এখানে ক্রিয়াবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। স্থূলশরীরকে আশ্রয় করে, জীব সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহারের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়। জীবের সেরূপ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াবিশেষই এখানে চেষ্টা পদবাচ্য। আর ঐরূপ চেষ্টার আশ্রয়ই হল শরীর। তাই বাৎস্যায়ন বলেছেন - "কথং চেষ্টাশ্রযঃ? ঈপ্সিতং জিহাসিতং বাঽর্থমধিকৃত্য ঈপ্সা-জীহাসা-প্রযুক্তস্য তদুপাযানুষ্ঠানলক্ষণা

সমীহা চেষ্টা। সা যত্র বর্ততে, তচ্ছরীরম্।"[৩৯] অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি এবং অনভীষ্ট বস্তুর পরিত্যাগের নিমিত্ত যত্নবান্ ব্যক্তির ক্রিয়া হল চেষ্টা। আর এই চেষ্টা যেখানে থাকে, সেটি হল শরীর। *তাৎপর্যটীকা*কারের মতে, চেষ্টা হল ব্যাপার। আর সেই ব্যাপার হল বিশিষ্টব্যাপার। সেই বিশিষ্টব্যাপারের আশ্রয় হল শরীর। কিন্তু ব্যাপারমাত্রই সূত্রকারোক্ত চেষ্টা নয়।[৪০]

ইন্দ্রিয়গুলি শরীরকে অবলম্বন করে নিজ বিষয় গ্রহণে ব্যাপৃত থাকে। এই অর্থে শরীর উক্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়। সেজন্য মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়কেও শরীর বলেছেন। প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, 'আশ্রয়' শব্দটি আধার অর্থে প্রযুক্ত হলেও শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কিন্তু সেই আধারাধেয়ভাব নেই। আবার সংযোগাদি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াশ্রয় বললে, ঘটাদি দ্রব্যও ইন্দ্রিয়াশ্রয় হয়ে পড়ে। ফলে তাতে শরীরলক্ষণ অতিব্যাপ্ত হয়। এখন তাহলে প্রশ্ন হল, কোন সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গুলি শরীরের আশ্রয় হয়? এরূপ জিজ্ঞাসায় বলতে হবে, শরীরের বিনাশে ইন্দ্রিয়গুলিও বিনষ্ট হয়, আবার শরীরের অনুগ্রহে ইন্দ্রিয়গুলিও অনুগৃহীত হয়। এখানে এরূপ অনুগৃহীতা বা অনুগামীতা উক্ত 'আশ্রয়' শব্দের অর্থ। তাই বাৎস্যায়ন বলেছেন - "কথমিন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ? যস্যানুগ্রহেণানুগৃহীতানি উপঘাতে চোপহতানি স্ববিষয়েষু সাধ্বাসাধুষু প্রবর্ত্তন্তে স এষামাশ্রয়স্তচ্ছরীরম্।"[৪১] *তাৎপর্যটীকা*কার ভাষ্যকারোক্ত উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন - ন পুনঃ আধারাধেয়ভাবেনেন্দ্রিয়াণি শরীরঃ বর্তন্তে ইতি। অপি তু শরীরানুগ্রহোপঘাতানুবিধানম্ ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বস্যার্থঃ।"[৪২] নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথের মতে, ইন্দ্রিয়গুলি অবচ্ছেদকতা নামক স্বরূপসম্বন্ধে শরীরবৃত্তি হয়। শরীর হল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় বা অবচ্ছেদক। অত এব তাতে আশ্রয়তা বা অবচ্ছেদকতা বিদ্যমান। তাই অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গুলি শরীরবৃত্তি হয়। এই বিষয়ে তিনি *ন্যায়সূত্রবৃত্তি*তে বলেছেন - 'ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং চ অবচ্ছেদকতাখ্যস্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষেণ, চক্ষুষ্মান্ দেবদত্তোঽয়মিত্যাদি প্রতীতেঃ।'[৪৩] অর্থাৎ লৌকিকে 'চক্ষু বিশিষ্ট দেবদত্ত' - এরূপ প্রয়োগ হয়। এই স্থলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় দেবদত্তাদি শরীর। অত এব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হল শরীর।

এই শরীরাশ্রিত ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষ হলে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য আত্মাতে যে সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা শরীরে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়। তাই শরীর হল সেই সুখাদিরূপ অর্থের আশ্রয়। সেজন্য মহর্ষি অর্থাশ্রয়ত্বকেও শরীর বলেছেন। বাৎস্যায়ন অর্থাশ্রয়ত্ব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন - "কথমর্থাশ্রয়ঃ? যস্মিন্নাযতনে ইন্দ্রিযার্থসন্নিকর্ষাদ্ উৎপন্নযোঃ সুখদুঃখযোঃ প্রতিসংবেদনং প্রবর্ত্ততে, স এষামাশ্রযস্তচ্ছরীরমিতি।"[৪৪] অর্থাৎ যে

অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষজন্য উৎপন্ন সুখ দুঃখের অনুভব জন্মায়, সেই অধিষ্টান হল উক্ত সুখ দুঃখরূপ অর্থসমুহের আশ্রয়।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, মনুষ্য শরীর হল পার্থিব। কারণ, সেখানে গন্ধাদি পার্থিব গুণের উপলব্ধি হয়।[৪৫] তবে মনুষ্য শরীরের মত জরায়ুজ অন্যান্য শরীরেও উক্ত চেষ্টাশ্রয়াদি লক্ষণ সমন্বিত হয়। কিন্তু জীবাত্মার বন্ধন ও মুক্তি যেহেতু মনুষ্য শরীরকে অধিকার করে উপপন্ন হয়। সেহেতু, মহর্ষি গৌতম এখানে মনুষ্য শরীরের কথাই বলেছেন। কেননা, তৎপ্রণীত শাস্ত্রে মানবেরই অধিকার বিদ্যমান।

২.২.৩. ইন্দ্রিয় : ভোগাশ্রয় শরীর নিরূপণের পর, ভোগসাধন ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়েছে। মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন – 'ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বকশ্রোত্রাণীন্দ্রিযাণি ভূতেভ্যঃ (ন্যা.সূ. ১.১.১২)।' ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গুলি যথাক্রমে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি ভূত হতে উৎপন্ন হয়। সূত্রে 'ভূতেভ্যঃ' পদটির দ্বারা সেই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। আপত্তি হতে পারে, পৃথিবী হতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বা অপ্ হতে 'রসনা' নামক ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হলেও আকাশ হতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হতে পারে না। কারণ, আকাশ নিত্য পদার্থ। সেজন্য নিত্যত্ববিশিষ্ট আকাশ হতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় কীভাবে? বস্তুত এরূপ শঙ্কা নিরর্থক। কারণ, সর্বত্র আকাশের উপলব্ধি হওয়ায়, আকাশ সর্বব্যাপী পদার্থ। আর তাই মহর্ষি বলেছেন – 'শব্দসংযোগবিভবাচ্চ সর্বগতম্ (ন্যা.সূ. ৪.২.২১)।' শব্দের সংযোগ এবং বিভব বা সার্বত্রিক হওয়ায় আকাশ সর্বব্যাপী। যে কোন প্রদেশে শব্দ উৎপন্ন হলে তা আকাশেই উৎপন্ন হয়। আকাশ এক এবং নিত্যপদার্থ। ঔপাধিক ভেদে ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। অত এব ঘটস্থিত আকাশ যেমন ঘটাকাশ, তেমনই কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশকে বলা হয় কর্ণাকাশ। আর ঐ কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রযোজক হয়। তাই *তাৎপর্যটীকা*তে যথার্থই বলেছেন - 'অত্র চ কর্ণশষ্কুলীসংযোগোপাধিনা শ্রোত্রস্য নভসঃ কথঞ্চিদ্ ভেদং বিবক্ষিত্বা ভূতেভ্য ইতি পঞ্চম্যর্থো ব্যাখ্যেযঃ।'[৪৬] এই অনুসারে নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথও *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে বলেছেন - "আকাশ একঃ সন্নপ্যুপাধেঃ কর্ণশুষ্কল্যাদের্ভেদাদ্ ভিন্নং শ্রোত্রং ভবতীত্যর্থঃ।"[৪৭]

প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য হল, যে ইন্দ্রিয় যে বস্তুর গ্রাহক হয়, সেই ইন্দ্রিয় সেই বস্তুগ্রাহক নামেই অভিহিত হয়। যেমন – গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ, রসগ্রাহক ইন্দ্রিয় রসনা, রূপগ্রাহক ইন্দ্রিয় চক্ষু প্রভৃতি। অত এব ইন্দ্রিয়গুলির গ্রাহ্যবিষয় নির্দিষ্ট। আর তাই এক ইন্দ্রিয় অন্য

ইন্দ্রয়ের বিষয় গ্রহণে সক্ষম হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন বলেছেন – 'ভূতেভ্য ইতি নানা প্রকৃতীনামেষাং সতাং বিষযনিযমো নৈকপ্রকৃতীনাম্। সতি চ বিষযনিযমে স্ববিষযগ্রহণলক্ষণত্বং ভবতীতি।'[৪৮] অর্থাৎ বাৎস্যায়নের মতে, পঞ্চভূত নামক নানা প্রকৃতি বা কারণ হতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং নিজ গ্রাহ্যবিষয়ের গ্রহণের জন্য, ইন্দ্রিয়গুলির ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু কেবলমাত্র একটি কারণ হতে সকল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হলে, ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় ব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। সাংখ্যমতে, 'অহংকার' হতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় মন এবং পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। তারপর পঞ্চতন্মাত্র হতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। সেখানে 'অহংকার' নামক এক প্রকৃতি বা কারণ হতে সকল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু নৈয়ায়িকদের মতে, সেরূপ হলে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হতে পারে না। কারণ, তাহলে একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা একাধিক গুণোপলব্ধির প্রসঙ্গ উপস্থিত হবে। অত এব বাৎস্যায়নের এরূপ উক্তির দ্বারা সাংখ্যমতও খণ্ডিত হয়েছে। তাই *তাৎপর্যটীকা*তে বলেছেন - "অনেন খল্বাহঙ্কারিকাণীন্দ্রিযাণি ইতি যদাহুঃ সাংখ্যাঃ, তত্ নিরাকৃতম্। নিরাকরণহেতুমাহ - একাত্ম্য ইতি...।"[৪৯]

ন্যায়দর্শনে মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকৃত। এখন প্রশ্ন হল ইন্দ্রিয়সূত্রে মনের উল্লেখ নেই কেন? এর উত্তর হল, 'ইন্দ্রিয়' নামক প্রমেয়র দ্বারা মহর্ষি বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রহণ করায়, সূত্রে মনের উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ মন স্বরূপত ভিন্ন হওয়ায়, তার পৃথক্ উপদেশ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন বলেছেন - "ইন্দ্রিযস্য বৈ সতো মনস ইন্দ্রিযেভ্যঃ পৃথগুপদেশো ধর্ম্মভেদাত্। ভৌতিকানীন্দ্রিযাণি নিযতবিষযাণি, স্বগুণানাঞ্চৈষামিন্দ্রিযভাব ইতি। মনস্ত্বভৌতিকং সর্ববিষযঞ্চ, নাস্য স্বগুণস্যেন্দ্রিযভাব ইতি...।"[৫০] উদ্দ্যোতকরের মতে, অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয়। যে বিষয়টি শাস্ত্রে অভ্যুপগত বা স্বীকৃত, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তার পরীক্ষা করা হয়নি, সেই পদার্থবিশেষের পরীক্ষা করাকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত বলে। *ন্যায়বার্তিকে* এই বিষয়ে বলা হয়েছে – "যোঽর্থঃ সূত্রেষু নোপনিবদ্ধঃ শাস্ত্রে চাভ্যুপগতঃ সোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি। যথা নৈযাযিকানাং মন ইন্দ্রিযমিতি।"[৫১] সুতরাং সূত্রে মনের উল্লেখ না হলেও 'মন' পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে তার বিশেষ ধর্ম পরীক্ষিত হওয়ায়, সেটির ইন্দ্রিয়ত্ব যে শাস্ত্রসিদ্ধ তা অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা বোঝা যায়।

২.২.৪. অর্থ : মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের পর, উক্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় অর্থের উল্লেখ করেছেন। তিনি অর্থের স্বরূপপ্রসঙ্গে বলেছেন – 'গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ (ন্যা.সূ. ১.১.১৪)।'

অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের গন্ধাদি পঞ্চগুণ, যথাক্রমে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয়। সূত্রে 'তদ্' পদটি পূর্বসূত্রস্থিত 'ইন্দ্রিয়' পদের বিশেষণ। অত এব 'তদর্থাঃ' বলতে এখানে সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়কেই বোঝায়। যেমন - গন্ধ পৃথিবীর গুণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। এরূপ রস অপের গুণ, রসনা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় ইত্যাদি। সেজন্য বাৎস্যায়ন বলেছেন - 'পৃথিব্যাদীনাং যথাবিনিযোগং গুণা ইন্দ্রিযাণাং যথাক্রমমর্থা বিষযা ইতি।'[৫২] কিন্তু সমানতন্ত্রীয় বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি পদার্থকে 'অর্থ' নামে অভিহিত করা হয়েছে - 'অর্থ ইতি দ্রব্যগুণকর্মসু (বৈ.সূ.-৮.২.৩)।' নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথের মতে, বৈশেষিক দর্শনোক্ত অর্থ বিষয়ক অভিমতকে নিরসন করতে সূত্রে 'তদর্থাঃ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন – 'বৈশেষিকাণাং দ্রব্যগুণকর্মস্বর্থশব্দাভিধেযত্বমতঃ পঞ্চাণাং গন্ধাদীনামেব কথং তত্ত্বমিত্যাশঙ্কানিরাসায তদর্থা ইত্যুক্তম্...।'[৫৩] অর্থাৎ ন্যায়দর্শনে 'অর্থ' বলতে ইন্দ্রিয়ার্থ (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়কে) বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু উদ্দ্যোতকরের মতে, সূত্রোক্ত 'পৃথিব্যাদি' পদটির দ্বারা পৃথিবী, অপ্ ও তেজ এবং 'গুণাঃ' পদটির দ্বারা সংখ্যা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্যান্য গুণগুলিকেও গ্রহণ করতে হবে। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় সেই সকল গুণেরও ইন্দ্রিয়ার্থত্ব উপপন্ন হয়। তাই তিনি বলেছেন - 'পৃথিব্যাদিগ্রহণেন পৃথিব্যপ্তেজাংসি বাহ্যকরণগ্রাহ্যাণ্যপদিশ্যন্তে, গুণগ্রহণেন চ সর্বাশ্রিতো গুণা ইতি সংখ্যাপরিমাণপৃথকত্বসংযোগাঃ...।''[৫৪] এই বিষয়ে তিনি বিবিধ যুক্তি দেখিয়ে শেষে, প্রমাণ হিসেবে 'দর্শনস্পর্শাভ্যাম্..' ইত্যাদি *ন্যায়সূত্রের* উল্লেখ করেছেন। তবে বাৎস্যায়ন বা অন্যান্য নৈয়ায়িকদের মতে, মহর্ষি ঐ সূত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রই অর্থ পদবাচ্যের কথা বললেও চতুর্থ প্রমেয়ে 'অর্থ' বলতে, গন্ধাদি পাঁচটি গুণকেই বুঝিয়েছেন। কারণ, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি কাম্যবিষয়রূপে গণ্য হয়। এগুলির দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে জীব-শরীরে নানা প্রকার কামনা-বাসনার উদ্ভব হয়। তাই বাৎস্যায়ন 'অর্থ' বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণমাত্রের ব্যবচ্ছেদ করতে সূত্রোল্লেখের পূর্বে 'ইমে তু...' ইত্যাদি বাক্য যোগ করেছেন। *তাৎপর্যটীকা*কার উক্ত উদ্ধৃতিটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন – ''তু শব্দেনার্থমাত্রাদ্ ব্যবচ্ছিনত্তি। যেষামিন্দ্রিযবিষযত্বেন ভাব্যমানানাং নিঃশ্রেযসসাধকত্বম্, মিথ্যাজ্ঞানবিষযীকৃতানাং তু সংসারনিমিত্ততা, ত ইমে ইত্যর্থঃ।''[৫৫] অর্থাৎ গন্ধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞানজন্য জীবাত্মার সংসার হয়। আবার তত্ত্বজ্ঞান জন্য নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। তাই মহর্ষি গন্ধাদি পাঁচটি গুণের কথাই বলেছেন।

উক্ত গন্ধাদি পঞ্চগুণসমূহের মধ্যে গন্ধ, রস, রূপ এবং স্পর্শ - এই চারটি হল পৃথিবীর গুণ। রূপ, রস ও স্পর্শ - এই তিনটি হল অপের গুণ। রূপ ও স্পর্শ - এই দুটি হল তেজের গুণ। স্পর্শ হল বায়ুর গুণ। আর শব্দ কেবলমাত্র আকাশের গুণ। এখন প্রশ্ন হল, যদি রূপাদি গুণগুলিও যদি পৃথিবীর গুণ হয়, তাহলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেগুলির উপলব্ধি হয় না কেন? মহর্ষি বিচারপূর্বক এরূপ শঙ্কার নিরসন করতে বলেছেন - ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গুলি যথাক্রমে পূর্বস্থিত গন্ধাদি গুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত হয়ে, গন্ধাদি গুণপ্রধান হয়। আর তাই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। *ন্যায়সূত্রে* বলা হয়েছে – 'পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুণোৎকর্ষাত্ তত্তৎপ্রধানম্ (ন্যা.সূ. ৩.১.৬৬)।' এরূপ ইন্দ্রিয়গুলির উক্ত উৎকর্ষতা বোঝাতে আরও বলা হয়েছে– 'তদ্ব্যবস্থানন্তু ভূয়স্তাত্ (ন্যা.সূ. ৩.১.৬৯)।' অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়সমূহের পার্থিবাদি বিষয় ব্যবস্থা ভুয়স্ত বা প্রকর্ষবশত হয়। অত এব মহর্ষি গৌতমের মতে, 'অর্থ' বলতে, ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিষয়কে বুঝতে হবে।

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যদ্রব্যের উপলব্ধিতে সমর্থ হলেও নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষ করতে পারে না। যেমন - বাহ্যদ্রব্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। কিন্তু চক্ষু নিজ রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তবে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বগত শব্দ গুণের উপলব্ধি হয়। কারণ, শব্দ সমবায়সম্বন্ধে আকাশেই উৎপন্ন হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় বলতে, কর্ণশূষ্কল্যবচ্ছিন্ন আকাশকেই বোঝায়। তাই শব্দ এবং শব্দগুণের আশ্রয় আকাশ স্বরূপত ইতর ইন্দ্রিয় বা ভূত হতে ভিন্ন। সেই ভিন্নতাবশত শব্দগুণের উপলব্ধি হয়। এই বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন বলেছেন - "ন শব্দেন গুণেন স্বগুণমাকাশমিন্দ্রিযং ভবতি। ন শব্দঃ শব্দস্য ব্যঞ্জকঃ, ন চ ঘ্রাণাদীনাং স্বগুণগ্রহণং প্রত্যক্ষং, নাপ্যনুমীযতে, অনুমীযতে তু শ্রোত্রেণাকাশেন শব্দস্য গ্রহণং শব্দগুণত্বঞ্চাকাশস্যেতি। পরিশষেশ্চানুমানং বেদিতব্যম।"[৫৬]

২.২.৫. বুদ্ধি : মহর্ষি অর্থের পর তদ্বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন। এই 'বুদ্ধি' নামক প্রমেয়ের লক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে মহর্ষি বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞানাদি সমানার্থ বোধক শব্দের উল্লেখ করেছেন - 'বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্ (ন্যা.সূ. ১.১.১৫)।' কারণ, জ্ঞা-ধাতু, বুধ্-ধাতু এবং উপপূর্বক লভ্-ধাতু সমানার্থের বাচক। অত এব বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান – এই পর্যায় শব্দগুলি কখনো ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে না।

সাংখ্যদর্শনে এই পর্যায়বাচক শব্দগুলি ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেখানে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হল বুদ্ধি। এই বুদ্ধি মহৎ, অন্তঃকরণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধি দর্পণের মত স্বচ্ছ, নির্মল, সঙ্কোচ ও বিকাশ স্বভাবযুক্ত। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্দেশে গমন করে ঘটাদি বিষয়াকার ধারণ করতে পারে। বুদ্ধির এরূপ ঘটাদিবিষয়াকার পরিণতিকে বলা হয় বৃত্তি বা জ্ঞান। আবার সেই জ্ঞানে পুরুষ বা আত্মা প্রতিবিম্বিত হলে সেই বৃত্তি বিশিষ্ট পুরুষকে বলা হয় বোধ বা উপলব্ধি।

কিন্তু ন্যায়মতে, বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা কখনো ভিন্ন অর্থের প্রকাশ হতে পারে না। তাই উদ্দ্যোতকর বলেছেন - "ন চ পর্যাযশব্দৈঃ পদার্থানাং নানাত্বং যুক্তম, যথা ধ্বনিঃ শব্দো নাদ ইতি। অন্যথা হি ইন্দ্রঃ শক্র ইতি নানাত্বং স্যাদিতি।"[৫৭] অত এব পূর্বোক্ত সাংখ্য মতটি যুক্তি যুক্ত নয়। কারণ, জ্ঞান যদি চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষের ধর্ম হয়, তাহলে সেটি অচেতন বুদ্ধির পরিণাম হতে পারে না। আবার, অচেতন বুদ্ধি হতে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহলে তাকে চেতনরূপে স্বীকার করতে হবে। ফলে পুরুষ এবং বুদ্ধি উভয়ই চৈতন্যবিশিষ্ট হবে। কিন্তু একটি শরীরে দেহেন্দ্রিয়াদি হতে ভিন্ন একটি চেতন পদার্থ স্বীকার করতে হবে। তাই ব্যাৎস্যায়ন উক্ত সাংখ্যমতের বিরোধীতা করে বলেছেন – "নাচেতনস্য করণস্য বুদ্ধের্জ্ঞানং ভবিতুমর্হতি, তদ্ধি চেতনং স্যাত্, একশ্চাযং চেতনো দেহেন্দ্রিযসংঘাতব্যতিরিক্ত ইতি। প্রমেযলক্ষণার্থস্য বাক্যস্যান্যার্থপ্রকাশনম্ উপপত্তিসামর্থ্যাদিতি।"[৫৮]

মহর্ষি গৌতম পরীক্ষা-প্রকরণে বুদ্ধির নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে, শেষে বিচারপূর্বক বুদ্ধির অনিত্যত্ব সাধন করেছেন। প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, বুদ্ধির অনিত্যত্ব সাংখ্যাচার্যগণও স্বীকার করেছেন। সেখানে প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত অন্য সকল পদার্থকে অনিত্য বলা হয়েছে। *সাংখ্যসূত্রে* এই বিষয়ে বলা হয়েছে – 'প্রকৃতিপুরুষযোরন্যত্ সর্বমনিত্যম্ (সাং.সূ. ৫.৭২)।' এখন প্রশ্ন হল - গৌতম কী উদ্দেশ্যে সিদ্ধ বিষয়ের সাধন করলেন? এর উত্তর হল, সাংখ্যমতে, বুদ্ধি অনিত্য হলেও নিত্যত্ববিশিষ্ট পুরুষের সঙ্গে প্রতিবিম্বিত বা সংযুক্ত হলে, বুদ্ধি নিত্যপদার্থ রূপে প্রতিভাসিত হয়। সেখানে বুদ্ধি এবং জ্ঞান- এই দুটি পৃথক পদার্থ। কিন্তু পুরুষে প্রতিবিম্বিত বুদ্ধির যদি অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, তাহলে বুদ্ধি এবং জ্ঞান - এই দুটি পদার্থের অভিন্নত্ব সিদ্ধ হবে। আর এভাবে অভিন্নত্ব

স্বীকৃত হলে তাঁদের ন্যায় সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করতে হবে। এরূপ গূঢ় তত্ত্বের প্রতিপাদন করতে মহর্ষি বিচারপূর্বক বুদ্ধির অনিত্যত্ব সিদ্ধ করেছেন।

২.২.৬. মন : মহর্ষি গৌতম বুদ্ধির পর অন্তরিন্দ্রিয় মনের উল্লেখ করেছেন। মন জ্ঞানমাত্রের প্রতি সাধারণকারণ। যে ক্ষণে যে বিষয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ হয়, সেই ক্ষণে আত্মমনসংযোগ দ্বারা সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। সেজন্যই মহর্ষি একই সময়ে বিজাতীয় নানা জ্ঞানের অনুৎপত্তিকে মনের লিঙ্গ বা অনুমাপক বলেছেন।[৫৯] তবে বাৎস্যায়নের মতে, স্মৃতি, অনুমান, আগম, সংশয়, প্রতিভা, স্বপ্নজ্ঞান, ঊহ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতিও মনের অনুমাপক। এবিষয়ে *ন্যায়ভাষ্যে* বলা হয়েছে – 'স্মৃত্যনুমানাগমসংশয়প্রতিভাস্বপ্নজ্ঞানোহাঃ সুখাদিপ্রত্যক্ষমিচ্ছাদযশ্চ মনসো লিঙ্গানি।'[৬০] এখানে 'আগম' বলতে, শাব্দবোধ এবং 'ঊহ' বলতে 'তর্ক' বোঝায়। এই মন স্বরূপত একত্ব বিশিষ্ট অণুপরিমাণ নিত্যপদার্থ। মহর্ষি গৌতমের মতে, একই সময়ে একই ব্যক্তির ভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া, এর দ্বারা যেমন মন অনুমিত হয়, তেমনই তার একত্ব ও অণুত্ব উভয়ই সিদ্ধ হয়।[৬১]

আপত্তি হতে পারে, একই সময়ে দুটি ভিন্ন বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়ায়, মনকে যে একটি বলা হয়েছে, তা অযৌক্তিক। কেননা, লৌকিকে এর বিপরীত দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, - 'দেবদত্ত ছাতা হাতে গুণগুণিয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে'। এরূপ স্থলে দেবদত্তের গমন ক্রিয়া, সংগীত চর্চা, ছত্র ধারণ - এই তিনটি ক্রিয়ার উপলব্ধি একই সময়ে হয়। অত এব স্বীকার করতে হবে যে, একই সময়ে যুগপৎ অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

বস্তুত পূর্বপক্ষের এরূপ কথন অযৌক্তিক। কারণ, ক্রিয়াগুলি অতিদ্রুত ঘটলেও তার মধ্যে ক্ষণকালের ব্যবধান থাকে। কুম্ভকারের ঘুর্ণনচক্রে যেমন ঘুর্ণন ক্রিয়ার ক্রম থাকলেও দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ায়, সেই ক্রমের উপলব্ধি হয় না। সেরূপ উক্ত ক্রিয়াগুলি অতিদ্রুত সম্পন্ন হওয়ায়, তার ক্রম উপলব্ধি হয় না। এপ্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে - 'অলাতচক্রদর্শনবত্তদুপলব্ধিরাশুসঞ্চরাত্ (ন্যা.সূ. ৩.২.৫৮)।' অর্থাৎ চক্রাকার আতস্-বাজির ন্যায়, অতিদ্রুত ক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ায়, সেই ক্রিয়ার ক্রম উপলব্ধি হয় না।

মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন পদার্থ। যেমন, আমরা আলাপচারিতায় আনমনাবশতঃ অনেক সময় পার্শ্ববর্তী অপর কোন ব্যক্তিকে দেখতে পাই না। বা কোন বিষয়

ঘটে গেলে, তা কি করে হল বুঝতে পারি না। এই সকল লোকব্যবহার মনের গতিশীলতা বা চঞ্চলতার সাক্ষ্য বহন করে। মনের এই স্বরূপ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* উক্ত হয়েছে -

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বাযোরিব সুদুষ্করম্॥"[৬২]

এখানে অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মনের চপলতা এবং বলবদ্দৃঢ়তার কথা বলেছেন। মনকে যদি বিভু পরিমাণ স্বীকার করা হয়, তাহলে মনের পূর্বোক্ত গতিশীলতা সিদ্ধ হয় না। কোন বিভু পদার্থ গতিশীল হতে পারে না। আবার বিভু পদার্থ সর্বব্যাপী হওয়ায়, সর্বদা সর্ব বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি প্রসঙ্গ আসবে। ফলে সুসুপ্ত্যবস্থারও অনুপপত্তি হবে। এরূপ যদি মধ্যমপরিমাণ স্বীকার করা হয়, তাহলে তার অনিত্যত্ব প্রসক্ত হবে। যেহেতু, মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ অনিত্য হয়। তাই মনকে অণুপরিমাণ স্বীকার করতে হবে।

২.২.৭. প্রবৃত্তি : 'প্রবৃত্তি' শব্দের অর্থ হল প্রযত্ন বা ক্রিয়া। মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তির লক্ষণ নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলেছেন – 'প্রবৃত্তির্ব্বাগ্-বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ (ন্যা.সূ. ১.১.১৭)।' সাধারণত 'বুদ্ধি' শব্দের অর্থ জ্ঞান হলেও 'বুদ্ধতেঽনেন'- এরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা করণবাচ্যে নিষ্পন্ন 'বুদ্ধি' শব্দটি জ্ঞানের সাধন হয়। তাই সূত্রস্থিত 'বুদ্ধি' বলতে, মনকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি শারীরিক, বাচিক ও মানসিক ভেদে এই তিন প্রকার হয়।

উক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তির ফলে জীব শুভ এবং অশুভকর্মে প্রযুক্ত হয়। বাৎস্যায়নের মতে, অশুভ কর্মের ফলে জীব শারীরের দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে হিংসা, অস্তেয়, নিষিদ্ধ ও মৈথুন আচরণ করে। এরূপ বাক্যের দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে মিথ্যাভাষণ, কটূক্তি, অসূয়া ও প্রলাপাদি আচরণ করে। মনের দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে পরদ্রোহ, পরদ্রব্যের প্রতি ইপ্সা ও নাস্তিক আচরণ করে। আবার ধর্মজন্য শুভপ্রবৃত্তির ফলে জীব শরীরের দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে দান, পরিত্রাণ, পরিচর্যা প্রভৃতি আচরণ করে। এরূপ বাক্যের দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে সত্য, হিত, প্রিয়, বেদপাঠ প্রভৃতি স্বাধ্যায় আচরণ করে। মনের দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে দয়া, অস্পৃহা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি শীল আচরণ করে।[৬৩]

তবে *তাৎপর্যটীকা*কার আরম্ভ বা কর্মকেই প্রবৃত্তি বলে, জ্ঞানহেতু এবং ক্রিয়াহেতুরূপে সেই প্রবৃত্তির দুইটি ভাগের কথা বলেছেন। জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা যা পাপপুণ্যের হেতু হয়, তাকে বলা হয়, বাক্-প্রবৃত্তি। এই বাক্-প্রবৃত্তি হল জ্ঞানজনক প্রবৃত্তি। মনের দ্বারা

ইষ্টদেবতার অনুচিন্তন এবং চক্ষুরাদির দ্বারা সাধু বা অসাধু পদার্থের দর্শন বা জ্ঞান প্রভৃতি ঐ বাক্-প্রবৃত্তির অন্তর্গত। এরূপ শরীরজন্য ও মনোজন্য প্রবৃত্তিকে বলা হয় ক্রিয়াজনক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিজন্য ধর্মাধর্মরূপ সকল ব্যবহার সম্পন্ন হয়। এবিষয়ে *তাৎপর্যটীকা*তে বলা হয়েছে–"আরম্ভো প্রবৃত্তিঃ। সা চ দ্বিবিধা জ্ঞানহেতুঃ ক্রিয়াহেতুশ্চ। তত্র যা জ্ঞানোৎপাদনদ্বারেণ পুণ্যপাপহেতুঃ সা বাক্-প্রবৃত্তিঃ। বাগিতি চ জ্ঞাপকহেতুলক্ষণম্। তেন মনসা ইষ্টদেবতাদ্যনুচিন্তনং চক্ষুরাদিভিশ্চ সাধ্বসাধুদর্শনাদি সূচিতং ভবতি। ক্রিয়াহেতুর্দ্বয়ী কাযনিমিত্তা মননিমিত্তা চেতি।"[৬৪] সুতরাং জীবের বিবিধ ক্রিয়া বা কর্ম প্রচেষ্টাই ন্যায়দর্শনোক্ত 'প্রবৃত্তি' পদবাচ্য।

২.২.৮. দোষ : মহর্ষি গৌতম 'প্রবৃত্তি' নামক পদার্থের নিরূপণের পর, সেই প্রবৃত্তি হতে উৎপন্ন দোষের উল্লেখ করেছেন। তিনি দোষের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন – 'প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ (ন্যা.সূ. ১.১.১৯)।' অর্থাৎ প্রবৃত্তির দ্বারা যা লক্ষিত হয়, তাই দোষ। ন্যায়মতে, উক্ত প্রবৃত্তি হতে, রাগ্, দ্বেষ ও মোহ – এই তিন প্রকার দোষের উৎপত্তি হয়। এই রাগাদি দোষসমূহই জীবাত্মাকে পাপ ও পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত করে। তবে উক্ত ত্রিবিধ দোষের মধ্যে মোহই প্রধান। কারণ, মোহশূন্য ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, মন্বাদি শাস্ত্রে জীবের কামাদি বিবিধ দোষের কথা বলা হলেও সকল প্রকার দোষ উক্ত তিন প্রকার দোষের অন্তর্গত। তাই মহর্ষি বলেছেন – 'তত্ ত্রৈরাশ্যং রাগদ্বেষমোহান্তর্ভাবাত্ (ন্যা.সূ. ৪.১.৩)।' বাৎস্যায়ন সূত্রোক্ত 'ত্রৈরাশ্য' শব্দটির অর্থ করেছেন - তিনটি রাশি বা পক্ষ। সেখানে কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা ও লোভ হল রাগ পক্ষের অন্তর্গত। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ ও অমর্ষ হল দ্বেষপক্ষের অন্তর্গত। মিথ্যাজ্ঞান, বিচিকিৎসা, মান ও প্রমাদ হল মোহপক্ষের অন্তর্গত। সেই কামাদি দোষগুলি রাগ্, দ্বেষ ও মোহ - এই তিনটি রাশি বা পক্ষের অন্তর্গত।[৬৫] এই পক্ষগুলির মধ্যে রাগ আসক্তিস্বরূপ, দ্বেষ অমর্ষস্বরূপ এবং মোহ হল মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ। এই কামাদি দোষগুলি উক্ত রাগ্, দ্বেষ ও মোহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, *ন্যায়সূত্রে* পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হয়নি।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, পরীক্ষা প্রকরণে প্রবৃত্তি ও দোষের পরীক্ষাবিষয়ক কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে মহর্ষির বক্তব্য হল, 'উদ্দেশ্য' এবং 'লক্ষণ' প্রকরণে প্রবৃত্তি যেভাবে উক্ত হয়েছে, সেভাবে তা পরীক্ষিতও হয়েছে। এরূপ প্রবৃত্তি পরীক্ষিত হওয়ায়, প্রবৃত্তি হতে উৎপন্ন দোষও পরীক্ষিত হয়েছে। তাই *ন্যায়সূত্রে* বলা হয়েছে - 'প্রবৃত্তির্যথোক্তা', 'তথা

দোষাঃ (ন্যা.সূ. ৪.১.১ ও ৪.১.২)।' সেজন্য পরীক্ষা প্রকরণে প্রবৃত্তি ও দোষের পৃথক্-ভাবে পরীক্ষা করা হয়নি।

২.২.৯. প্রেত্যভাব : প্রবৃত্তি জন্য দোষের ফলে জীব সংসার চক্রে আবর্তিত হয়। সেজন্য প্রবৃত্তি ও দোষের পর মহর্ষি প্রেত্যভাবের কথা বলছেন। মহর্ষি প্রেত্যভাবের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন – 'পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ (ন্যা.সূ. ১.১.১৯)।' প্র-পূর্বক ইণ্-ধাতুর উত্তর ল্যপ্ যোগে 'প্রেত্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল লোকান্তর বা মৃত্যুর পর। এরূপ ভূ-ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয় যোগে 'ভাব' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল উৎপত্তি বা আবির্ভাব। সুতরাং জীবের এই জন্মমৃত্যুরূপ আবর্তনই প্রেত্যভাব পদবাচ্য। জীবকে এই আবর্তনরূপ প্রেত্যভাব হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অপবর্গ লাভ করতে হবে। আর তা না হলে, তাঁকে বার বার ভোগের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করতে হবে। সূত্রে 'পুনঃ' শব্দটি সংসারের অনাদিত্ব জ্ঞাপনের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। এবিষয়ে *ন্যায়বার্ত্তিকে* বলা হয়েছে - "পূর্বোপাত্তশরীরাদিপরিত্যাগাদন্যশরীরাদ্যুপসংক্রান্তিঃ প্রেত্যভাব ইতি। পুনর্গ্রহণং সংসারস্যানাদিত্বজ্ঞাপনার্থম্। পুনঃ পুনর্জন্মরণে ভবত ইত্যনাদিত্বং সংসারস্য জ্ঞাপযতি।"[৬৬]

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, আত্মা শরীর পরিত্যাগ করায় জীবের মৃত্যু হয়। আবার পুনরায় শরীরান্তর গ্রহণ করায় জন্মরূপ উৎপত্তি হয়। এখন প্রশ্ন হল উৎপত্তি ও বিনাশরহিত নিত্য আত্মার প্রেত্যভাব সিদ্ধি হয় কীভাবে? এর উত্তরে মহর্ষি বলেছেন – 'আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাবসিদ্ধিঃ (ন্যা.সূ. ৪.১.১০)।' অর্থাৎ আত্মার নিত্যত্বের জন্যই প্রেত্যভাব সম্পন্ন হয়। অনাদিকাল ধরে নিত্য আত্মা এক শরীর পরিত্যাগপূর্বক অন্য শরীর গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মা যদি অনিত্য হত, তাহলে তার পূনরায় আবির্ভাব (শরীর গ্রহণ) সম্ভব হত না। আত্মার এরূপ শরীর পরিগ্রহ শ্রুত্যাদিতেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* বলা হয়েছে – 'তদ্ যথা তৃণজলাযুকা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবাযমাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গমযিত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি।'[৬৭] অর্থাৎ তৃণাশ্রিত জোঁক যেমন একটি তৃণের প্রান্তভাগে গমন করে, প্রথমে অপর তৃণকে আশ্রয় করে শরীরের অবশিষ্ট অংশ সেখানে নিয়ে যায়, সেরূপ এই আত্মা একটি শরীরকে অচতনপূর্বক ত্যাগ করে, অপর শরীর আশ্রয়পূর্বক নিজেকে সেই শরীরে নিয়ে যায়।

২.২.১০. ফল : মহর্ষি জীবের সর্ববিধ সুখ দুঃখের কারণ প্রবৃত্তি ও দোষ নিরূপণের পর, সেই প্রবৃত্তি ও দোষ হতে যে বিষয়টি উৎপন্ন হয়, সেই ফলের কথা বলেছেন – 'প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্ (ন্যা.সূ. ১.১.২০)।' জীবের ত্রিবিধ প্রবৃত্তি ও দোষের ফলে উৎপন্ন সুখদুঃখাদি বিষয় 'ফল' নামে অভিহিত হয়। বাৎস্যায়ন এই ফল পদার্থের ব্যাখ্যায় বলেছেন -"সুখদুঃখসংবেদনং ফলম্। সুখবিপাকং কর্ম্ম দুঃখবিপাকঞ্চ। তৎপুনর্দ্দেহেন্দ্রিযবিষযবুদ্ধিষু সতীষু ভবতীতি সহ দেহাদিভিঃ ফলমভিপ্রেতম্।"[৬৮] অর্থাৎ সুখদুঃখের সংবেদনই হল ফল। কর্ম সুখ জনক হোক বা দুঃখ জনক হোক শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি যদি থাকে, তবেই তার ভোগ সম্পন্ন হয়। তাই 'শরীর' থেকে 'দুঃখ' পর্যন্ত প্রমেয় পদার্থগুলি যেমন দুঃখের সঙ্গে সংযোগবশত দুঃখরূপে প্রতীত হয়, সেরূপ 'ফল' নামেও অভিহিত হয়। উদ্দ্যোতকরের মতে, উক্ত ফলসমূহের মধ্যে সুখ ও দুঃখ হল মুখ্যফল এবং শরীরাদি হল গৌণফল।[৬৯] এরূপ জয়ন্তভট্টও তাঁর *ন্যায়মঞ্জরী*তে ফলের উক্ত দুই প্রকার ভেদের কথা বলেছেন।[৭০]

২.২.১১. দুঃখ : মুমুক্ষুর কাছে 'শরীর' হতে 'ফল' পর্যন্ত প্রমেয়গুলি দুঃখের সঙ্গে সংযোগবশত দুঃখরূপে প্রতীত হবে। এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি ফলের পর দুঃখের কথা বলেছেন। তিনি দুঃখের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন – 'বাধনালক্ষণং দুঃখম্ (ন্যা.সূ. ১.১.২১)।' বাৎস্যায়ন সূত্রস্থিত 'বাধনা' শব্দটির অর্থ করেছেন 'পীড়া'। সেই বাধনা বা পীড়ার দ্বারা যে বিষয়টি লক্ষিত হয়, তাই দুঃখ। জীব জন্মমাত্রই বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। তাই ন্যায়সূত্রে জীবের জন্মরূপ উৎপত্তিকে 'দুঃখ' নামে অভিহিত করা হয়েছে – 'বিবিধবাধনাযোগাদ্দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ (ন্যা.সূ. ৪.১.৫৪)।'

বাৎস্যায়নের মতে, জন্মমাত্রই জীব উৎকৃষ্ট, মধ্যম এবং হীন - এই তিন প্রকার দুঃখ ভোগ করে। আবার তিনি উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের সঙ্গে 'তর' শব্দ যোগ করে, উৎকৃষ্টতর, হীনতর ইত্যাদি প্রকার দুঃখের অবান্তর ভেদ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, নরক লোকে গমনকারী ব্যক্তির দুঃখ হল উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ নরকযন্ত্রণা ভোগ করা হল সকল প্রকার দুঃখের মধ্যে কষ্টদায়ক। এরূপ পশু প্রভৃতি যে দুঃখ ভোগ করে, তা হল মধ্যমপরিমাণ। আবার মানুষ যে দুঃখ ভোগ করে তা হল হীন। মানুষের দুঃখ পশ্বাদির তুলনায় স্বল্প কষ্টদায়ক। আবার দেবতা ও বিতরাগব্যক্তিদের দুঃখ হল হীনতর। তাদের দুঃখ খুবই সামান্য।[৭১]

কিন্তু উদ্দ্যোতকর একবিংশতি প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন। এবিষয়ে *ন্যায়বার্ত্তিকে* বলা হয়েছে - "একবিংশতিপ্রভেদভিন্নং পুনর্দুঃখম্, শরীরং ষডিন্দ্রিযাণি ষড়-বিষযাঃ ষড়-বুদ্ধযঃ সুখং দুঃখং চেতি। শরীরং দুঃখাযতনত্বাদ্ দুঃখম্। ইন্দ্রিযাণি বিষযাঃ বুদ্ধযশ্চ তৎসাধনভাবাত্। সুখং দুঃখানুষঙ্গাত্। দুঃখং স্বরূপত ইতি।"[৭২] অর্থাৎ তাঁর মতে, দুঃখ স্বরূপতই দুঃখবিশিষ্ট। সেই দুঃখের সঙ্গে অনুসঙ্গবশত শরীরাদি পদার্থগুলিও দুঃখরূপে উপলব্ধি হয়। উক্ত একুশ প্রকার দুঃখের মধ্যে দুঃখ মুখ্য এবং শরীরাদি গৌণ। উদ্দ্যোতকরোক্ত এই দুঃখ প্রভেদ অন্যান্য প্রাচীন আচার্যগণও সমর্থন করেছেন।

আপত্তি হতে পারে, উদ্দ্যোতকর যে একুশ প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন, সেখানে ক্রমানুসারে তিনি প্রথমে শরীর, তারপর ছয়প্রকার ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, বুদ্ধি এবং শেষে সুখ ও দুঃখের উল্লেখ করেছেন। ছয়প্রকার ইন্দ্রিয় বলতে, ঘ্রাণাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয় মনকেও বোঝায়। সুখ বা দুঃখ সেই মনেরই গ্রাহ্যবিষয়। তাহলে উদ্দ্যোতকর প্রথমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের কথা বলে, আবার পুনরায় সুখ ও দুঃখের কথা বললেন কেন? এরূপ জিজ্ঞাসার নিরিখে বলতে হবে, কেবলমাত্র সুখ বা দুঃখই ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনের বিষয় নয়, তৎসঙ্গে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি বিষয়গুলিও মনের দ্বারা গৃহীত হয়। উক্ত বিষয়গুলিকে বোঝানোর জন্য উদ্দ্যোতকর ছয়প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা বুদ্ধির কথা বলেছেন। তবে বাধনা বা দুঃখের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়ে প্রমাতার কাছে পূর্বোল্লিখিত শরীরাদি পদার্থগুলি যে দুঃখরূপে প্রতিভাসিত হয়। তা *ন্যায়ভাষ্য*কারও স্বীকার করেছেন।[৭৩] কিন্তু তিনি দুঃখের প্রকার বলতে, উত্তম, মধ্যম, হীন ইত্যাদিকেই বুঝিয়েছেন।

২.২.১২. অপবর্গ : দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে জীব চরম নিঃশ্রেয়সরূপ অপবর্গ লাভ করে। সেজন্য মহর্ষি দুঃখের পর অপবর্গের কথা বলেছেন। এই 'অপবর্গ' শব্দটি অপ-পূর্বক বৃজ্-ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়। এর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল আত্যন্তিক নিবৃত্তি। কিন্তু কিসের আত্যন্তিক নিবৃত্তি? এর উত্তর হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে – 'তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ (ন্যা.সূ. ১.১.২২)।' সূত্রে 'তদ্' পদটি পূর্বসূত্রোক্ত 'বাধনা' পদের বিশেষণ। প্রলয়কালেও জীবের বিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু তা আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়। কারণ, পুনঃসৃষ্টিতে জীবাত্মার শরীর গ্রহণ হলে, সেই সকল দুঃখেরও পুনরায় আবির্ভাব হয়। কিন্তু অপবর্গ লাভ হলে, জীবের আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তাই বাৎস্যায়ন বলেছেন – 'যত্র তু নিষ্ঠা যত্র তু পর্য্যবসানং সোঽযং...।'[৭৪] অর্থাৎ যেখানে জীবের সকল

প্রকার দুঃখের পর্যবসান হয় এবং যেখানে জন্মমৃত্যুপ্রবাহের নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি ঘটে, তাই অপবর্গ। এই অপবর্গের নামান্তর হল নির্বানমুক্তি বা বিদেহমুক্তি। বাৎস্যায়ন অপবর্গকে অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন।[৭৫]

*তাৎপর্যটীকা*কার *ন্যায়ভাষ্য*কারের পূর্বোক্ত অভিপ্রায়টিকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, অপবর্গ প্রাপ্ত হলে জীবের আর সংসার ভয় থাকে না, সেজন্য বলা হয়েছে 'অভয়'। এরূপ নির্বিকার নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মের কোনরূপ জরা বা পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। তাই যারা জগৎকে ব্রহ্মের পরিণামরূপে স্বীকার করেন, তাঁদের নিরসন করতে বলা হয়েছে 'অজর'। আবার যারা প্রদীপবৎ চিত্তের চিরনির্বাণকে মোক্ষরূপে স্বীকার করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'অমৃত্যুপদ'। কারণ নিত্যস্বরূপ জীবাত্মার বিদেহমুক্তি হলে, তার আর মৃত্যু বা বিনাশ হয় না। আর জীবের এরূপ মুক্তি শাস্ত্রে 'ক্ষেমপ্রাপ্তি' নামে অভিহিত হয়।[৭৬] প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, জীবের সকল প্রকার কামনাবাসনার অবসান না হলে কখনো মুক্তি লাভ হতে পারে না। তাই জয়ন্তভট্ট তাঁর *ন্যায়মঞ্জরী* গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন -

"যাবদাত্মগুণাঃ সর্বে নোচ্ছিন্না বাসনাদয়ঃ।

তাবদাত্যন্তিকী দুঃখব্যাবৃত্তির্নাবকল্পতে॥"[৭৭]

এভাবে ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের পরিচয় সংক্ষেপে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক আলোচিত হল।

তৃতীয় অধ্যায় :
প্রমেয় পদার্থবিষয়ে কেশবমিশ্রের অভিমত

৩.০. কেশবমিশ্র তাঁর *তর্কভাষা* গ্রন্থটিতে প্রথম অংশে ন্যায়দর্শনসম্মত প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণ পদার্থ এবং দ্বিতীয় অংশে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের প্রতিপাদন করেছেন। গ্রন্থকার সেখানে প্রমাণ পদার্থের নিরূপণের পর নিরূপয়িষ্যমাণ প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন - "প্রমাণান্যুক্তানি, অথ প্রমেযান্যুচ্যন্তে। 'আত্মশরীরেন্দ্রিযার্থবুদ্ধিমনঃ-প্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেযম্' - ইতি সূত্রম্।"[১] রচনা শৈলী অনুসারে এই গ্রন্থটিকে আমরা প্রাচীন ন্যায়দর্শনের একটি প্রকরণ গ্রন্থ বলতে পারি। কিন্তু *তর্কভাষা* গ্রন্থটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সেখানে কেশবমিশ্র আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের মধ্যে দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থ এবং অভাব পদার্থেরও সন্নিবেশ করেছেন। এখন বক্তব্য হল, বৈশেষিক সূত্রে মহর্ষি কণাদ এই দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম ও বৈধর্মরূপ তত্ত্বজ্ঞান হতে, নিঃশ্রেয়স লাভের কথা বলেছেন।[২] এই দ্রব্যাদি পদার্থগুলি, ন্যায়দর্শনেও স্বীকার করা হয়েছে, বাৎস্যায়ন তাঁর *ন্যায়ভাষ্যে* উক্ত বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। আর তাই পরবর্তীকালে নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে যথার্থই বলেছেন - '...এতে চ পদার্থাঃ বৈশেষিকপ্রসিদ্ধাঃ নৈযাযিকানামপ্যবিরুদ্ধাঃ প্রতিপাদিতশ্চৈবমেব ভাষ্যে।'[৩] এছাড়াও নব্য নৈয়ায়িকগণ এই দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের মধ্যে গৌতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্ভাবের কথা বলেছেন - 'দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবাযাভাবাঃ সপ্তৈব পদার্থাঃ ষোড়শানামত্রৈবান্তর্ভাবাদিতি প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ।'[৪] অত এব *তর্কভাষা* গ্রন্থটি ন্যায়শাস্ত্রাবলম্বনে রচিত হলেও ব্যাখ্যাপদ্ধতি অনুসারে এই গ্রন্থটিকে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় সম্প্রদায়েরই প্রকরণ গ্রন্থ বলা যায়।

ন্যায়সম্মত প্রমেয় পদার্থগুলিকে *তর্কভাষা*কার নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সেই ব্যাখ্যানশৈলীকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। **প্রথমত,** জাতিঘটিত লক্ষণের দ্বারা প্রমেয় পদার্থের স্বরূপ কথন, **দ্বিতীয়ত**, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সমানতন্ত্রীয়তা প্রদর্শন এবং **তৃতীয়ত**, প্রমেয় পদার্থ-বিষয়ে কেশবমিশ্রের স্বাভিমতের সামান্য পর্যালোচনা।

৩.১. জাতিঘটিত লক্ষণের দ্বারা প্রমেয় পদার্থের স্বরূপ কথন :

কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থটিতে অধিকাংশ পদার্থের লক্ষণ সেই পদার্থগত জাতির দ্বারা নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু তিনি আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে কেবলমাত্র 'আত্মা'রই জাতিঘটিত লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। যদিও 'অর্থ' নামক প্রমেয়টির মধ্যে *তর্কভাষা*কার বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত দ্রব্যাদি পদার্থের সন্নিবেশ করেছেন, সেখানে তিনি অন্যান্য ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যের মত সেই পদার্থগুলির জাতিঘটিত লক্ষণ দিয়েছেন, তথাপি ন্যায়সম্মত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে কেবলমাত্র আত্মারই জাতিঘটিত লক্ষণ নির্বচন করেছেন। তাই এটিকে একটি পৃথক্ পর্যায় ধরা হয়েছে। আপত্তি হতে পারে, জাতিঘটিত লক্ষণে আত্মাশ্রয় দোষ প্রসক্ত হয়। তাহলে *তর্কভাষা*র কেন সেরূপ লক্ষণ নিরূপণ করলেন? এর উত্তর হল 'বিশিষ্টাৎ ভাবপ্রত্যয়ঃ বিশেষণমবগাহতি' - এই ন্যায় অনুসারে বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান কারণ হয়। যেমন - 'পৃথিবীত্বসামান্যবতী পৃথিবী'। সেজন্য জাতিঘটিত লক্ষণে বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্টের জ্ঞান হওয়ায়, তা কোন দোষের হয় না।

● **আত্মা :** *তর্কভাষা*কার 'আত্মত্ব' সামান্যের দ্বারা আত্মার লক্ষণ নিরূপণ করেছেন।[৫] 'আত্মত্ব' সামান্য উভয়বিধ আত্মাতে প্রসক্ত হওয়ায়, এর দ্বারা দ্বিবিধ আত্মাকেই বুঝতে হবে। কারণ, ঈশ্বর হল সুখদুঃখাদির স্বরূপযোগ্যকারণ। শরীর, অদৃষ্ট প্রভৃতি সহকারিকারণ না থাকায়, উক্ত সুখাদি সেখানে প্রতিভাসিত হয় না। কিন্তু তা না হলেও সেখানে সুখদুঃখাদির কারণতাবচ্ছেদকরূপে আত্মত্ব জাতি বিদ্যমান। অত এব কেশবমিশ্র 'আত্মত্ব' সামান্যের দ্বারা আত্মার লক্ষণ নিরূপণ করায়, সেখানে তিনি দ্বিবিধ আত্মারই উল্লেখ করেছেন।

*তর্কভাষা*কার আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে বলেছেন যে, আত্মা দেহ ইন্দ্রিয়াদি হতে অতিরিক্ত, প্রতিশরীরে ভিন্ন, নিত্য ও বিভু পরিমাণ। আত্মার এতাদৃশ স্বরূপ সিদ্ধ করতে, *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "স চ সর্বত্র কার্যোপলম্ভাদ্ বিভুঃ। পরমমহৎপরিমাণবানিত্যর্থঃ। বিভুত্বাচ্চ নিত্যোঽসৌ ব্যোমবৎ। সুখাদিনাং বৈচিত্র্যাত্ প্রতিশরীরং ভিন্নঃ।"[৬] অত এব সুখদুঃখের বৈচিত্র্যবশত আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হন। সংসারে একই সময়ে একই ব্যক্তি কখনো সুখ বা দুঃখ ভোগ করতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতে সেগুলি একই সময়ে উৎপন্ন হতে দেখা যায়। যেমন - যে সময় দেবদত্ত গভীর দুঃখাচ্ছন্ন, সেই সময় যজ্ঞদত্তকে অপার আনন্দ উপভোগ করতে দেখা যায়। এভাবে জগতের সর্বত্র আত্মার

সুখদুঃখাদিরূপ কার্য উপলব্ধ হওয়ায়, আত্মা সর্বব্যাপক বা বিভু, পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট। এরূপ বিভুত্বের জন্য আকাশাদির মত নিত্য।

আত্মা মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়। যোগজসন্নিকর্ষ জন্য যুঞ্জানযোগির নিজ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা প্রত্যক্ষ হয়। তবে নিজ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা প্রত্যক্ষগম্য হলেও দেবদত্তাদি শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। তাই *তর্কভাষা*কার প্রথমে আত্মার মানসপ্রত্যক্ষের কথা বলে, তারপর অনুমানের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সাধন প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আত্মার প্রত্যক্ষ-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি উপপন্ন হলে সেক্ষেত্রে বুদ্ধাদি গুণগুলি তার লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়।

অনুমান প্রামাণের সাহায্যে বুদ্ধাদি গুণের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব নিরূপণপ্রসঙ্গে *তর্কভাষা*কার প্রথমে উক্ত বুদ্ধাদির গুণত্ব সিদ্ধ করেছেন। তারপর পরিশেষ অনুমানের দ্বারা উক্ত বুদ্ধাদির আত্মগুণত্ব সিদ্ধ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধাদি গুণ, যেহেতু এগুলি অনিত্য হয়েও একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়।

গুণ সর্বদা গুণীকে আশ্রয় করে থাকে। এই অনুসারে বুদ্ধাদিও কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। কিন্তু বুদ্ধাদি গুণগুলি ভূতদ্রব্যের গুণ নয়, যেহেতু এগুলির মানসপ্রত্যক্ষ হয়। ভূতদ্রব্যের গুণ মনের দ্বারা গৃহীত হয় না। যেমন - রূপাদি। এরূপ বুদ্ধাদি দিক্, কাল ও মনেরও গুণ হতে পারে না, যেহেতু এগুলি বিশেষগুণ (যেহেতু এগুলি গুণ হওয়া, সত্ত্বেও একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়)। কিন্তু দিগাদি ত্রয়ে বিদ্যমান সংখ্যাদি গুণগুলি সর্বদ্রব্যবৃত্তি সামান্যগুণ। এভাবে বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগুলি পৃথিব্যাদি পঞ্চ এবং দিগাদি ত্রয়ের গুণ না হওয়ায়, পরিশেষ অনুমানের দ্বারা এগুলির আত্মগুণত্বই সিদ্ধ হয়।

*তর্কভাষা*কার সেই অনুমানের প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে, দুই প্রকার ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যথা - বুদ্ধাদি গুণগুলি পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্য হতে অতিরিক্ত কোন দ্রব্যাশ্রিত, যেহেতু এগুলি ঐ আটটি দ্রব্যে অনাশ্রিত হয়েও গুণ হয়। যে পদার্থ পৃথিব্যাদি আটটি হতে অতিরিক্ত দ্রব্যে আশ্রিত নয়, সেই পদার্থ পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্য হতে অতিরিক্ত দ্রব্যে অনাশ্রিত হয়ে, গুণও হয় না। যেমন - রূপাদি। এ হল ব্যতিরেক ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত।

আবার, বুদ্ধাদি গুণগুলি পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্য হতে অতিরিক্ত কোন দ্রব্যাশ্রিত, যেহেতু পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যে অনাশ্রিত হয়েও এগুলি গুণ হয়। যে পদার্থ, যাকে আশ্রয় না করেও গুণ হয়, সেই পদার্থ অবশ্যই তদতিরিক্ত কোন দ্রব্যাশ্রিত। যেমন - শব্দ। এই 'শব্দ'

পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যে অনাশ্রিত হয়েও গুণ হওয়ার জন্য পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যের অতিরিক্ত আকাশে আশ্রিত হয়। এভাবে অন্বয়ব্যাপ্তি এবং পূর্বের ব্যতিরেকব্যাপ্তি-এই দুই প্রকার ব্যাপ্তির দ্বারা সিদ্ধ হয় বুদ্ধাদি গুণগুলি পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যের অতিরিক্ত আত্মার অন্তর্গত।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মহর্ষি গৌতম ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার অস্তিত্ব সাধক লিঙ্গের দ্বারা আত্মার লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। কিন্তু *তর্কভাষা*কার আত্মত্ব সামান্যের দ্বারা আত্মার লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। সেখানে সর্বমূর্তসংযোগী হওয়ায় আত্মাকে বিভু বলা হয়েছে। *তর্কভাষা*কার সুখাদিরূপ কার্য সর্বত্র উপলব্ধ হওয়ায়, আত্মাকে বিভু বলেছেন। সেখানের আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করতে, নবজাত শিশুর দুগ্ধপান ইত্যাদি অভিলাসের কথা বলা হয়েছে। *তর্কভাষা*কার বিভুত্বের জন্য আত্মাকে নিত্য বলেছেন। এরূপ যোগজসন্নিকর্ষ জন্য আত্মার অলৌকিক প্রত্যক্ষ ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। সেই অনুসারে *তর্কভাষা*কারও আত্মার মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেছেন। আচার্য বাৎস্যায়নের মতে, সামান্যতঃদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা আত্মা অনুমিত হয়। আবার উদ্দ্যোতকরের মতে, আত্মা পরিশেষ নামক শেষবদ্ অনুমানের দ্বারা অনুমিত হয়। এরূপ অন্যান্য প্রাচীন এবং নব্য নৈয়ায়িকগণও এই পরিশেষ অনুমানের দ্বারা আত্মার অনুমান-গম্যতার কথা বলেছেন। *তর্কভাষা*কারও সেরূপ পরিশেষ অনুমানের কথা বলেছেন। অধিকন্তু তিনি সেই অনুমানের প্রয়োগ হিসেবে, অন্বয় ও ব্যতিরেকব্যাপ্তির দৃষ্টান্তও দেখিয়েছেন। যা আত্মবিষয়ক অনুমানের অভিনব কৌশলরূপে গণ্য হতে পারে। আত্মা পদার্থের ব্যাখ্যায় অপরাপর নৈয়ায়িক ও *তর্কভাষা*কারের মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকার বিশেষত্বগুলি দৃষ্টিগোচর হয়।

৩.২. ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সমানতন্ত্রীয়তা প্রদর্শন :

● **অর্থ :** মহর্ষি কণাদ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি পদার্থকে 'অর্থ' নামে অভিহিত করেছেন। এরূপ মহর্ষি গৌতম 'অর্থ' নামক প্রমেয়টির দ্বারা পৃথিব্যাদি পাঁচটি ভূতের ঘ্রাণাদি পাঁচটি গুণের কথা বলেছেন। কিন্তু *তর্কভাষা*কার এই 'অর্থ' নামক চতুর্থ প্রমেয়ে প্রথমে দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থের সন্নিবেশ করেছেন। তারপর প্রতিযোগিরূপে এই ছয়টি ভাবপদার্থের বর্ণনা করে, শেষে অভাব পদার্থের বর্ণনা করেছেন। অত অব *তর্কভাষা*কার দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থকে 'অর্থ' নামক চতুর্থ প্রমেয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ

করলে দেখা যায়, এর দ্বারা একদিকে যেমন তিনি মহর্ষি কণাদের 'অর্থ'-বিষয়ক অভিমত ব্যক্ত করেছেন, অন্যদিকে তেমনই গুণ পদার্থের ব্যাখ্যায় মহর্ষি গৌতমের 'অর্থ'-বিষয়ক অভিমতও ব্যক্ত হয়েছে। আবার উক্ত পদার্থগুলি ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনে স্বীকৃত। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের সমানতন্ত্রীয়তা প্রদর্শনই যে গ্রন্থকারের অভিপ্রায়, তা বোঝা যায়।

দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :–

* **দ্রব্য :** মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের লক্ষণ করেছেন - 'ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্ (বৈ.সূ.-১.১.১৫)।' অর্থাৎ যে পদার্থ ক্রিয়াবিশিষ্ট, গুণবিশিষ্ট, সমবায়িকারণ, তাই দ্রব্য। কিন্তু ক্রিয়াবত্তকে দ্রব্যের লক্ষণ বললে, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা - এই চারটি নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে উক্ত লক্ষণটি অব্যাপ্ত হয়। সেজন্য *তর্কভাষা*কার সমবায়িকারণ অথবা গুণের আশ্রয়কেই দ্রব্য বলেছেন - 'তত্র সমবায়িকারণং দ্রব্যম্, গুণাশ্রযো বা।'[৭] যেমন - জ্ঞানের সমবায়িকারণ আত্মা নামক দ্রব্য। এই 'জ্ঞান' নামক গুণটি সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতে উৎপন্ন হয়। তাই আত্মা জ্ঞানের সমবায়িকারণ এবং আশ্রয় উভয় হয়।

আপত্তি হতে পারে, গুণবত্ত্ব বা গুণাশ্রয়ত্ব ধর্মটি দ্রব্যের লক্ষণ হতে পারে না। কেননা, উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে গুণ থাকে না। এরূপ শঙ্কার নিরসনে বক্তব্য হল, এখানে 'গুণবত্ত্ব' শব্দটির অর্থ হল - 'গুণসমানাধিকরণসত্ত্বাভিন্নজাতিবিশিষ্ট'। 'সত্ত্বা' জাতিটি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি পদার্থে থাকে। অত এব 'সত্ত্বা' এবং 'দ্রব্যত্ব' নামক জাতি দুটি গুণের সমানাধিকরণবৃত্তি হয়। আর ঐ সমানাধিকরণরূপ জাতিদ্বয়ের মধ্যে সত্ত্বাভিন্ন জাতি হল দ্রব্যত্ব। অত এব 'গুণ-সমানাধিকরণ-সত্ত্বাভিন্ন জাতি' বলতে, ঐ দ্রব্যত্বকেই বোঝায়। আর ঐ দ্রব্যত্ব জাতিটি উৎপত্তিকালীন বা উৎপন্নবিনষ্ট উভয় দ্রব্যে বিদ্যমান হওয়ায়, 'গুণাশ্রয়ত্ব বা গুণবত্ত্ব' শব্দের ঐরূপ অর্থ করলে, দ্রব্যলক্ষণটি তাতে সমন্বিত হয়। সুতরাং 'সত্ত্বাভিন্নং গুণসমানাধিকরণত্বং দ্রব্যত্বম্' - দ্রব্যের এরূপ লক্ষণও আমরা নিরূপণ করতে পারি। প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে বিশ্বনাথ কার্যসমবায়িকারণতা, সংযোগসমবায়িকারণতা এবং বিভাগসমবায়িকারণতারূপ তিনটি হেতুর দ্বারা উক্ত দ্রব্যত্ব জাতিটি সিদ্ধ করেছেন।[৮]

ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকগণ 'দ্রব্য' বলতে - পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন - এই নয়টি পদার্থকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ তার্কিক মতে, দ্রব্যসংখ্যা নয়টি। কিন্তু ভাট্টমীমাংসকগণ, এই নয়টি দ্রব্যের সঙ্গে 'অন্ধকার' এবং 'শব্দ' নিয়ে মোট

একাদশ প্রকার দ্রব্যের কথা বলেছেন। কিন্তু তার্কিক মতে, 'শব্দ' হল গুণ পদার্থ এবং সেটি আকাশের গুণ। কেননা, শব্দ সমবায়সম্বন্ধে কেবলমাত্র আকাশেই উৎপন্ন হয়। এরূপ 'অন্ধকার' হল আলোকের অভাবস্বরূপ। অত এব সেটি অভাব পদার্থ। কিন্তু মীমাংসক মতে, তমঃ বা অন্ধকারকে ভাবপদার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁদের মতে, গুণ ও কর্মের সদ্ভাববশত প্রতিযোগী বস্তুর স্মরণ ছাড়াই অন্ধকার গ্রাহ্য হওয়ায়, তমঃ বা অন্ধকার নিশ্চিতরূপে ভাবপদার্থ। এছাড়াও তাঁদের মতে, অন্ধকার চলনাত্মক ক্রিয়াযুক্ত, নীলরূপবিশিষ্ট এবং পরত্ব-অপরত্ব-বিভাগরূপ গুণযুক্ত। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ ভাট্টকারিকাটি হল-

"তমো খলু চলং নীলং পরাপরবিভাগবত্।
প্রসিদ্ধদ্রব্যবৈধর্ম্যান্নবভ্যো ভোক্তুমর্হতি॥"[৯]

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকগণ অন্ধকারকে দশম দ্রব্যরূপে স্বীকার করেন না। কারণ, তাতে দ্রব্যের স্বরূপগত ভেদ বর্তমান। এই বিষয়ে বৈশেষিকসূত্রে বলা হয়েছে - 'দ্রব্যগুণকর্মনিষ্পত্তিবৈধর্ম্যাদভাবস্তমঃ (বৈ.সূ.-৫.২.১৯)।' অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম হতে স্বরূপত ভেদবশত তমঃ অভাবপদার্থ। আর সেই অভাবত্ব হল তেজ পদার্থের অভাবস্বরূপ। আর অন্ধকারের যে রূপের কথা বলা হয়েছে, তা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, কোন রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যক্ষে আত্মমনসংযোগের মত আলোকও সহকারী কারণ হয়। কিন্তু অন্ধকারের ঐ নীলরূপ আলোকের সাহায্য ছাড়াই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। অন্ধকার যদি ঘট প্রভৃতির মত রূপবিশিষ্ট দ্রব্য হত, তাহলে আলোক-সংযোগে তার নীলরূপেরও প্রত্যক্ষ হত। কিন্তু তা হয় না। কাজেই অন্ধকার তেজ বা আলোকের অভাবস্বরূপ। আর ঐ অভাব হল অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট তেজ সামান্যের অভাব। কেননা, চক্ষুকে তৈজস্ ইন্দ্রিয় বলা হলেও তার রূপ উদ্ভূত হয় না, এরূপ সুবর্ণও তৈজস্ পদার্থ হলেও তার রূপও পার্থিবরূপের দ্বারা অভিভুত। কিন্তু প্রদীপ প্রভৃতিতে যে তেজ বা আলোক থাকে, তা পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট। অন্ধকার হল সেরূপ প্রকৃষ্টমহত্ত্ববিশিষ্ট তেজের অভাবস্বরূপ। তাই অন্ধকারকে প্রৌঢ়প্রকাশক-তেজঃসামান্যের অভাব বলা হয়।[১০] সুতরাং ন্যায়-বৈশেষিক মতে, দ্রব্য নয়টি সিদ্ধ হয়। *তর্কভাষা*কার দ্রব্যের বিভাগপ্রসঙ্গে 'নব' শব্দটির সঙ্গে 'এব' পদটি যুক্ত করে, অন্যান্য পদার্থের ব্যবচ্ছেদ করেছেন।

নব দ্রব্যের সামান্য পরিচয় :–

উক্ত নব দ্রব্যের মধ্যে, **পৃথিবী**, **অপ্**, **তেজ** এবং **বায়ু** - এই চারটি নিত্য এবং অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। নিত্য হল পরমাণুরূপ এবং অনিত্য কার্যরূপ। এই অনিত্য পৃথিব্যাদি আবার শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় ভেদে তিন প্রকার হয়। **আকাশ**, **কাল** এবং **দিক্** - এই তিনটি দ্রব্যের মধ্যেও সমানতা বিদ্যমান। তিনটি দ্রব্যই এক, নিত্য এবং বিভু পরিমাণ। এরূপ **আত্মা** নামক দ্রব্যটি নিত্য ও বিভু পরিমাণবিশিষ্ট হলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে তার দুটি ভেদ বর্তমান। সেখানে পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক এবং সর্বজ্ঞ। কিন্তু জীবাত্মা বহু এবং অল্পজ্ঞ। অর্থাৎ আকাশাদি চারটি দ্রব্যের মধ্যে সমানতা হল এই দ্রব্যগুলি নিত্য এবং বিভু পরিমাণ। এরূপ মন নামক দ্রব্যটিও নিত্যত্ববিশিষ্ট পরমাণুরূপ। প্রতিটি জীবাত্মায় একটি করে মন থাকায়, এটি অসংখ্য। তবে অসংখ্য হলেও মন বিভু পরিমাণ নয়, অণু পরিমাণবিশিষ্ট। নব দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু এবং আকাশকে ভূতদ্রব্য বলা হয়। আবার পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু এবং মনকে মূর্ত্যদ্রব্য বলা হয়। দ্রব্যগুলি নিজ অবয়বে সমবায়সম্বন্ধে থাকে এবং দুটি দ্রব্যের মধ্যে সংযোগসম্বন্ধ বিদ্যমান।

● **পৃথিবী :** *তর্কভাষা*কার 'পৃথিবীত্ব' সামান্যের দ্বারা পৃথিবীর লক্ষণ নিরূপণ করেছেন।[১১] পৃথিবীতে সমবায়সম্বন্ধে 'গন্ধ' নামক গুণটি উৎপন্ন হয়। তাই গন্ধের সমবায়িকারণতা পৃথিবীতে বিদ্যমান। ঐ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদেকরূপে পৃথিবীত্ব সামান্য সিদ্ধ হয়। এই পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংয়োগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগাখ্য সংস্কার - এই **চৌদ্দটি** গুণ থাকে। উক্ত চতুর্দশ গুণের মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ - এই চারটি গুণ অনিত্য এবং পাকজ হয়। 'পাক' বলতে, তেজ সংযুক্ত হওয়াকে বোঝায়। এর দ্বারা পার্থিব বস্তুর পূর্বরূপের বিনাশ হয় এবং নতুন রূপ উৎপন্ন হয়। তাই বলা হয়েছে - 'পাকস্তু তেজঃসংযোগঃ, তেন পৃথিব্যাঃ পূর্বরূপাদযো নস্যন্ত্যন্যে জনযন্ত ইতি পাকজাঃ।'[১২] যেমন - হরিৎ বর্ণের আম্রফল সূর্যের তেজরূপ অগ্নিসংযোগের ফলে হরিৎরূপ পীতরূপে, অম্লরস মধুর রসে, অব্যক্ত সুরভি ব্যক্ত সুরভিতে এবং কঠিন স্পর্শ কোমলস্পর্শে পরিণত হয়।

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, এই পাকজ প্রক্রিয়া-বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বৈশেষিকগণ পদার্থের পরমাণুতে পাক স্বীকার করেন। তাই তাঁদের

পীলুপাকবাদী বলা হয়। 'পীলু' শব্দের অর্থ পরমাণু। আবার নৈয়ায়িকগণ অবয়বিতে পাক স্বীকার করেন। তাই তাদের পীঠরপাকবাদী বলা হয়। 'পীঠর' শব্দের অর্থ, পিণ্ড বা অবয়বী। এখানে বলা আবশ্যক যে, বৈশেষিক দর্শনে তিনটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়, তা হল - দ্বিত্বসংখ্যা, পাকজোৎপত্তি এবং বিভাগজ বিভাগ।

● **অপ :** *তর্কভাষা*কার 'অপ্ত্ব' সামান্যের দ্বারা অপ বা জল-দ্রব্যের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন।[১৩] 'অপ্ত্ব' শব্দটির অর্থ হল জলত্ব। এই জলত্ব জাতি দুই প্রকার অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। **প্রথমত**, জলের বিশেষগুণ হল স্নেহ। এই স্নেহ নিত্য এবং অনিত্য ভেদে দুই প্রকার হয়। জলীয় পরমাণুর স্নেহ নিত্য, সেখানে কার্যকারণভাব থাকে না। কিন্তু অনিত্য জল ও অনিত্য স্নেহের মধ্যে কার্যকারণভাব সিদ্ধ হয়। তাই সমবায়সম্বন্ধে অনিত্য স্নেহের প্রতি তাদাত্মসম্বন্ধে অনিত্য জল কারণ হয়। আর এই অনিত্য জলের সমবায়িকারণতা অবশ্যই কোন ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। সেই ধর্মরূপে জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ অনিত্য স্নেহের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে অনিত্য জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। **দ্বিতীয়ত**, অনিত্য জলের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। এখানে অনিত্য জলের কারণতা নিত্য এবং অনিত্য উভয় জলেই বিদ্যমান। কারণ, অনিত্য জলীয় দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয় নিত্য জলীয় পরমাণু হতে। আবার দ্ব্যণুক ভিন্ন অনিত্য জলের উৎপত্তি হয় অনিত্য জলীয় দ্ব্যণুকাদি হতে। সুতরাং অনিত্য জলের উৎপত্তি নিত্য বা অনিত্য উভয় জল হতে হয়।

জলে রূপ, রস, স্নেহ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংয়োগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগাখ্য সংস্কার - এই **চৌদ্দটি** গুণ থাকে। অর্থাৎ পৃথিবীর যে চৌদ্দটি গুণের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে গন্ধ পদার্থকে বাদ দিয়ে, স্নেহ পদার্থকে যুক্ত করলে, উক্ত গুণগুলি জলদ্রব্যের গুণ হয়। উক্ত চতুর্দশ গুণের মধ্যে, জলে অভাস্বর শুক্লরূপ, মধুর রস এবং সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব বিদ্যমান।

● **তেজ :** *তর্কভাষা*কার 'তেজস্ত্ব' সামান্যের দ্বারা তেজ-দ্রব্যের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন।[১৪] তৈজস-বিষয়কে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা - ভৌম, দিব্য, ঔদর্য ও আকরজ। বহ্ন্যাদির তেজ 'ভৌম', বিদ্যুদাদির তেজ 'দিব্য', ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাককারী তেজ 'ঔদর্য' এবং সুবর্ণাদি খনিজ পদার্থের তেজ 'আকরজ'। এই তেজ-দ্রব্যে রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগাখ্য সংস্কার - এই **এগারোটি** গুণ

থাকে। পরমাণুরূপ তেজের রূপ, স্পর্শ, একত্ব-সংখ্যা, পরিমাণ এবং এক-পৃথকত্ব - এই পাঁচটি গুণ নিত্য এবং তদ্ভিন্ন গুণ অনিত্য। আবার অনিত্য তেজের সকল গুণই অনিত্য। তেজে ভাস্বরশুক্লরূপ এবং উষ্ণস্পর্শ বিদ্যমান। পরমাণুরূপ তেজে কেবল দৈশিক পরত্বাপরত্বে থাকে, কিন্তু কার্যরূপ তেজে দৈশিক ও কালিক উভয় পরত্বাপরত্ব গুণ থাকে। তেজে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব থাকে, যেহেতু অগ্নি সংযোগের ফলে তার দ্রবত্ব উৎপন্ন হয়। যেমন - সুবর্ণ প্রভৃতির দ্রবত্ব।

নিত্যানিত্য ভেদে বিভক্ত তেজ পদার্থের মধ্যে অনিত্য তেজ আবার চার প্রকার হয়। যথা - (ক). উদ্ভূতরূপস্পর্শ, যেমন - সূর্য, পুঞ্জীভূত বহ্নি প্রভৃতির তেজ। এদের ভাস্বর শুক্লরূপ এবং উষ্ণস্পর্শ উভয়ই আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। (খ). অনুদ্ভূতরূপস্পর্শ, যেমন - চক্ষুরিন্দ্রিয়। চক্ষু তৈজস ইন্দ্রিয় হলেও তার ভাস্বর শুক্লরূপ এবং উষ্ণস্পর্শ উভয়ই অনুদ্ভূত। অর্থাৎ অনুভবযোগ্য হয় না। (গ). অনুদ্ভূতরূপ-উদ্ভূতস্পর্শ, যেমন - গরম জল। গরম জলের ভাস্বর শুক্লরূপের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, এর রূপ অনুদ্ভূত। কিন্তু উষ্ণস্পর্শের উপলব্ধি হওয়ায়, এর স্পর্শ উদ্ভূত। তাই এটি অনুদ্ভূতরূপ-উদ্ভূতস্পর্শ-বিশিষ্ট তেজপদার্থ। (ঘ). উদ্ভূতরূপমনুদ্ভূতস্পর্শ, যেমন - প্রদীপের প্রভামণ্ডল। দূর হতে প্রদীপ শিখার ভাস্বর শুক্লরূপ প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তার উষ্ণস্পর্শ অনুভূত হয় না। সেজন্য প্রদীপের প্রভামণ্ডলের তেজ হল উদ্ভূতরূপ-অনুদ্ভূতস্পর্শ-বিশিষ্ট।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, মীমাংসা দর্শনে সুবর্ণকে পৃথিব্যাদি নয়টি দ্রব্য হতে অতিরিক্ত পদার্থ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকগণ সেটিকে তেজ পদার্থের অন্তর্গত করেছেন। কারণ, অত্যন্ত অগ্নিসংযোগেও সুবর্ণের কোন ক্ষয় হয় না।[১৫] আপত্তি হতে পারে, সুবর্ণ যদি তৈজসপদার্থ হয়, তাহলে তার ভাস্বর শুক্লরূপ এবং উষ্ণস্পর্শ উদ্ভূত হয় না কেন? এই প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যদের বক্তব্য হল, সুবর্ণের রূপ এবং স্পর্শ উভয়ই উদ্ভূত, কিন্তু পার্থিব রূপ ও স্পর্শের দ্বারা সেটি অভিভূত হওয়ায়, ভাস্বর শুক্লরূপের পরিবর্তে পীতরূপ এবং উষ্ণ-স্পর্শের পরিবর্তে অনুষ্ণশীতস্পর্শ উপলব্ধি হয়। তাই সুবর্ণ হল উদ্ভূতাবিভূতরূপস্পর্শবিশিষ্ট পদার্থ। অর্থাৎ পূর্বোক্ত চার প্রকার অনিত্য তেজ হতে পৃথক্। এবিষয়ে *তর্কভাষা*তে বলা হয়েছে - "সুবর্ণং তু উদ্ভূতাভিভূতরূপস্পর্শ নানুদ্ভূতরূপস্পর্শ, তদনুদ্ভূতরূপত্বেঽচাক্ষুষং স্যাদ্, অনুদ্ভূতস্পর্শবত্বে ত্বচা ন গৃহ্যতে। অভিভবস্তু বলবৎসজাতীযেন

পার্থিবরূপেণ স্পর্শেন চ কৃত।"[১৬] সুতরাং বলবৎ সজাতীয় পার্থিব রূপের দ্বারা অভিভুত হওয়ায়, সুবর্ণের ভাস্বর শুক্লরূপ এবং উষ্ণ-স্পর্শের উপলব্ধি হয় না।

● **বায়ু :** *তর্কভাষা*কার বায়ু-দ্রব্যের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'বায়ুত্বাভিসম্বন্ধবান্ বায়ুঃ।'[১৭] অর্থাৎ যে পদার্থটি বায়ুত্ব জাতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তাই বায়ু। এই বায়ু রূপহীন দ্রব্য হওয়ায়, প্রত্যক্ষ হয় না। তবে স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি ও কম্পন - এই চারটি বিষয়ের দ্বারা বায়ু অনুমিত হয়। তাই গ্রন্থকার সেখানে বলেছেন - 'স চ স্পর্শাদ্যনুমেযা...।' বায়ুতে স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ - এই নয়টি গুণ থাকে। প্রসঙ্গত বক্তব্য হল ন্যায়-বৈশেষিক মতে, বায়ুলোকে প্রসিদ্ধ শরীরকে বায়বীয়-শরীর বলা হলেও *তর্কভাষা*কার বায়বীয়-বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের কথা বললেও শরীরের কথা বলেননি।

বায়ু যেহেতু অনুমেয় পদার্থ, তাই এর প্রামাণ্য নিরূপণাবসরে *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "তথাহি যোঽযং বাযৌ বাতি অনুষ্ণশীতস্পর্শ উপলভ্যতে স গুণত্বাদ্ গুণীনমন্তরেণ অনুপপদ্যমানো গুণিনমনুমাপযতি। গুণী চ বাযুরেব। পৃথিব্যাদ্যনুপলব্ধেঃ...।"[১৮] অর্থাৎ বায়ু প্রবাহিত হলে, অনুষ্ণশীতস্পর্শ অনুমিত হয়। সেই স্পর্শ গুণ হওয়ায়, গুণী ব্যতীত তার আশ্রয়তা সিদ্ধ হতে পারে না। স্পর্শ গুণের আশ্রয়রূপে পৃথিব্যাদি কোন দ্রব্য সিদ্ধ না হওয়ায়, শেষে বায়ু ঐ স্পর্শ গুণের আশ্রয়রূপে সিদ্ধ হয়।

● **পৃথিব্যাদি কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশক্রম :**

গ্রন্থকার পৃথিবী প্রভৃতি চারটি কার্যদ্রব্য নিরূপণ করার পর, তাদের উৎপত্তি এবং বিনাশ প্রক্রিয়া ক্রমে বর্ণনা করেছেন। উৎপত্তি প্রসঙ্গে সেখানে বলা হয়েছে যে, দুইটি পরমাণু ক্রিয়ার দ্বারা সংযুক্ত হলে, দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন দ্ব্যণুকের প্রতি পরমাণুদ্বয় হল সমবায়িকারণ, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হল অসমবায়িকারণ এবং ঈশ্বরীয় ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি হল নিমিত্তকারণ। এভাবে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হওয়ায় পর, তিনটি দ্ব্যণুক ক্রিয়ার দ্বারা সংযুক্ত হলে, ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। একই ভাবে এখানেও ত্রিবিধ কারণ প্রযুক্ত হয়। এই ত্রসরেণু হল তিনটি দ্ব্যণুক বা ছয়টি পরমাণুর সমষ্টি। আর সেজন্য ত্রসরেণু মহৎপরিমাণবিশিষ্ট। তারপর চারটি ত্রসরেণু ক্রিয়ার দ্বারা সংযুক্ত হলে, চতুরণুক উৎপন্ন হয়। এভাবে ক্রমে চতুরণুক থেকে অন্য স্থূলতর পদার্থের উৎপত্তি হয়। আবার সেই স্থূলতর পদার্থ থেকে স্থূলতম পদার্থের উৎপত্তি হয়। এভাবে উৎপন্ন হতে হতে ক্রমে মহাপৃথিবী, মহদ্জল, মহদগ্নি ও

মহদ্বায়ু উৎপন্ন হয়। যেহেতু কারণ গুণই কার্য গুণের আরম্ভক হয়, তাই পৃথিবী প্রভৃতি কার্য দ্রব্যে যে রূপাদি গুণগুলি প্রতিভাত হয়, সেগুলি স্বাশ্রয়ভূত সমবায়িকারণে বিদ্যমান রূপাদি গুণ হতে উৎপন্ন হয়। এবিষয়ে *তর্কভাষা*তে বলা হয়েছে –"কার্যগতা রূপাদয়ঃ স্বাশ্রযসমবায়ি-কারণগতেভ্যো রূপাদিভ্যো জাযন্তে। 'কারণগুণাঃ হি কার্যগুণানারভন্তে' ইতি ন্যাযাত্।"[১৯]

দুইটি পরমাণু ক্রিয়ার দ্বারা সংযুক্ত হলে, দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। প্রশ্ন হতে পারে, দুটি পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়া উৎপন্ন হবে কেন? এর কারণ কি? এরূপ জিজ্ঞাসার নিরিখে বলতে হবে, দ্ব্যণুক উৎপত্তির প্রতি নিমিত্তকারণ হল ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের ইচ্ছাবশত দুটি পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়ার উৎপন্ন হয়।[২০]

*তর্কভাষা*কার কার্য-দ্রব্যের উৎপত্তি প্রক্রিয়া বর্ণনার পর, ক্রমে সেই সকলের পদার্থের বিনাশের কথা বলেছেন। উৎপন্ন পৃথিব্যাদি চারটি মহাভূতের সংহারকাল উপস্থিত হলে, ঈশ্বরের তাদৃশ সংহার-ইচ্ছার ফলে ক্রমে পৃথিব্যাদি কার্য-পদার্থের বিনাশ হয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে, এই বিনাশ প্রক্রিয়া দুইটি কারণে হয়। যথা - অসমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ এবং সমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ। তবে নব্য নৈয়ায়িকদের মতে, সর্বত্র অসমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের বিনাশ হয়।[২১] তাঁরা সমবায়িকারণের নাশে কার্য-দ্রব্যের নাশ স্বীকার করেন না। যেহেতু, পরমাণু ধ্বংস না হওয়ায়, দ্ব্যণুক ধ্বংস হয় না।

*তর্কভাষা*কার অসমাবায়ী ও সমবায়ী উভয় প্রকার কারণের নাশে ঘটাদি কার্য-দ্রব্যের নাশ দেখিয়েছেন। প্রথমে অসমবায়িকারণের নাশে কার্য-দ্রব্যের নাশ প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলেছেন, উৎপন্ন রূপবিশিষ্ট ঘটাদি কার্য-দ্রব্যে নোদন বা অভিঘাত দ্বারা ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। সেই ক্রিয়া দ্বারা কপালাদি অবয়বে বিভাগরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। উক্ত বিভাগের ফলে ঘটাদির আরম্ভক অসমবায়িকারণরূপ কপাল-দ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হয়। এভাবে সংযোগরূপ অসমবায়িকারণের নাশে ঘটাদি কার্য-পদার্থের নাশ হয়।

এরূপ সমবায়িকারণের নাশে কার্য-দ্রব্যের নাশ প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলেছেন, দ্ব্যণুকের উৎপাদক পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়ার ফলে বিভাগ দ্বারা পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হয়। এভাবে দ্ব্যণুক বিনষ্ট হওয়ায়, ত্রসরেণু বিনষ্ট হয়, তারপর ত্রসরেণু বিনষ্ট হওয়ায়, চতুরণুক বিনষ্ট হয়। এভাবে স্বাশ্রয়নাশে ত্রসরেণু প্রভৃতিরও নাশ হয়। এভাবে ক্রমে নাশ হতে হতে মহৎ পৃথিবী অপ, তেজ ও বায়ু প্রভৃতির নাশ হয়। যেমন - পটের সমবায়িকারণ

তন্তু, তার নাশে পটেরও নাশ হয়। সেভাবে তন্তুগত রূপেরও নাশ হয়। কেননা, রূপ সমবায়সম্বন্ধে তন্তুতেই থাকে। আর তাই আশ্রয় নাশে তন্তুগত রূপের নাশ হয়। তবে অনেক সময় আশ্রয় নাশ না হলেও রূপ নাশ হতে দেখা যায়। যেমন - ঘট। ঘট দ্রব্যের নাশ না হলেও পাকজ রক্ত রূপের প্রাদুর্ভাবে পূর্বস্থিত শ্যামরূপের নাশ হয়।

● পরমাণুর অস্তিত্ব নিরূপণ :

পরমাণুসমূহের সংযোগ, বিভাগরূপ ক্রিয়ার দ্বারা পৃথিব্যাদি চারটি কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ ক্রম বিশ্লেষণের পর, *তর্কভাষা*কার পরমাণুর অস্তিত্ব নিরূপণ করেছেন। সেখানে *তর্কভাষা*কার প্রশ্ন উপস্থাপন পূর্বক সেই বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন - "কিং পুনঃ পরমাণুসদ্ভাবে প্রমাণম্? উচ্যতে, যদিদং জালসূর্যমরীচিস্থং সর্বতঃ সূক্ষ্মতমং রজ উপলভ্যতে, তত্ স্বল্পপরিমাণদ্রব্যারব্ধং কার্যদ্রব্যত্বাদ্ ঘটবত্। তচ্চ দ্রব্যং কার্যমেব মহদ্দ্রব্যারম্ভকস্য কার্যত্বনিযমাত্। তদেবং দ্ব্যণুকাখ্যং দ্রব্যং সিদ্ধম্। তদপি স্বল্পপরিমাণসমবায়িকারণারব্ধং কার্যদ্রব্যত্বাদ্ ঘটবত্। যস্তু দ্ব্যণুকারম্ভকঃ স এব পরমাণুঃ।"[২২] অর্থাৎ অন্ধকার ঘরে জানালা বা ঘুলঘুলি দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করলে, অত্যুজ্বল আলোতে যে অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেটি স্বল্পপরিমাণ দ্রব্য হতে উৎপন্ন হয়। সেই পদার্থটি ঘটবৎ একটি কার্য-পদার্থ। যেহেতু কার্যদ্রব্যই মহৎদ্রব্যের আরম্ভক হয়, সেহেতু সেই স্বল্প পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যটি অবশ্যই কার্য। আর ঐ স্বল্প পরিমাণবিশষ্ট কার্যদ্রব্যটি হল ত্রসরেণু। এরূপ দ্ব্যণুকও স্বল্প পরিমাণবিশিষ্ট সমবায়িকারণ হতে উৎপন্ন হওয়ায়, ঘটবৎ এটিও কার্যদ্রব্য হয়। এই দ্ব্যণুকের আরম্ভকই হল পরমাণু। সুতরাং ঐ ধূলিকণারূপ ত্র্যসরেণুর ছয় ভাগের এক ভাগ পরমাণু।

● পরমাণুর নিত্যত্ব প্রতিপাদন :

*তর্কভাষা*কার পরমাণুর অস্তিত্ব নিরূপণের পর, তার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেছেন। আপত্তি হতে পারে, যদি কার্যদ্রব্যই কার্যদ্রব্যের আরম্ভক হয়, তাহলে পরমাণু কীভাবে অনারব্ধ হয়? এর উত্তরে *তর্কভাষা*কার জিজ্ঞাসাপূর্বোক বলেছেন - "ননু কার্যদ্রব্যারম্ভকস্য কার্যদ্রব্যত্বাব্যভিচারাত্ তস্য কথমনারব্ধত্বম্? উচ্যতে, অনন্তকার্যপরম্পরাদোষপ্রসঙ্গাত্। তথাচ সত্যনন্তদ্রব্যারব্ধত্বাবিশেষণ মেরুসর্ষপযোরপি তুল্যপরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ। তস্মাদনারব্ধ এব পরমাণুঃ।"[২৩] অত এব দ্ব্যণুকাদি কার্যদ্রব্য অনিত্য হলেও তার মূল-কারণ পরমাণু নিত্যপদার্থ। ঐ পরমাণুকেও যদি কার্য স্বীকার করা হয়, তাহলে অনন্তকার্যপরম্পরা দোষ প্রসক্ত হবে।

তাই পরমাণুর কারণ স্বীকার করা হলে, বিশাল আয়তন মেরুপর্বতের সঙ্গে সর্ষের আয়তনও একই বলতে হবে। কারণ, সেরূপ হলে উভয়ই অনন্তাবয়বযুক্ত হবে। সুতরাং পরমাণুকে অনারব্ধ বা নিত্যই স্বীকার করতে হবে।

● **দ্ব্যণুকাদির অবয়ব নিয়ম :**

*তর্কভাষা*কার পরমাণুর নিত্যত্ব প্রতিপাদনের পর, দ্ব্যণুক প্রভৃতির অবয়বের উৎপত্তি নিয়মের কথা বলেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, দ্ব্যণুক দুইটি পরমাণুর দ্বারাই উৎপন্ন হয়, যেহেতু একটি পরমাণু কোন কার্যের আরম্ভক হতে পারে না। আবার তিনটি বা তার বেশী পরমাণু কল্পনা অপ্রমাণিক, সেজন্য দুইটি পরমাণুর দ্বারাই দ্ব্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। একই ভাবে ত্র্যণুকও তিনটি দ্ব্যণুক দ্বারা উৎপন্ন হয়। কারণ, দুইটি দ্ব্যণুক দ্বারা যদি ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহলে কার্যগত ত্র্যণুকে মহৎপরিমাণ গুণের উৎপত্তি হবে না। কেননা, কারণে যদি মহৎ পরিমাণ গুণ না থাকে, তাহলে কার্য-বস্তুতে সেই মহৎপরিমাণবিশিষ্ট গুণের উৎপত্তি হতে পারে না। কার্যদ্রব্যের মহত্ব কারণমহত্ব বা কারণবহুত্বের উপর নির্ভরশীল। দ্ব্যণুক মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট নয়। আর তাই দ্ব্যণুক থেকে ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করলে, ত্র্যণুকে মহৎ পরিমাণের অনুপপত্তি হবে। কিন্তু যদি তিনটি দ্ব্যণুককে ত্র্যণুকের কারণ স্বীকার করা হয়, তাহলে কারণবহুত্ববশত ত্র্যণুকে মহৎপরিমাণ গুণের সন্নিবেশ হবে। অত এব তিনটি দ্ব্যণুকের দ্বারাই মহৎপরিমাণ গুণের উৎপত্তি হওয়ায়, ত্রসরেণু উৎপত্তিতে তিনটির অধিক দ্ব্যণুকের কল্পনা করা অপ্রামাণিক। এভাবে *তর্কভাষা*কার পৃথিব্যাদি চারটি কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ ক্রম, পরমাণুর অস্তিত্ব নিরূপণ, নিত্যত্ব প্রতিপাদন, দ্ব্যণুকাদির অবয়ব নিয়ম প্রভৃতি বিষয়গুলি উপপাদন করেছেন।

● **আকাশ :** আকাশ বিভু দ্রব্য। 'শব্দ' নামক গুণটি সমবায়সম্বন্ধে কেবলমাত্র আকাশেই উৎপন্ন হয়। তাই আকাশ হল শব্দগুণ যুক্ত। তাই *তর্কভাষা*কার 'আকাশ' নামক দ্রব্যটির নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'শব্দগুণকমাকাশম্।'[২৪] এই তবে শব্দ ছাড়াও আকাশে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ - এই পাঁচটি সামান্যগুণও বিদ্যমান। সর্বত্র এই আকাশের কার্য উপলব্ধি হওয়ায়, এটি বিভু পরিমাণ এবং বিভুত্বের জন্য নিত্য স্বরূপ।[২৫] প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, মহর্ষি কণাদ বিভবযুক্ত হওয়ায়, আকাশ ও আত্মাকে পরমমহৎপরিমাণ বলেছেন - 'বিভবান্মহানাকাশস্তথা চাত্মা (বৈ.সূ.,-৭.১.২২)।' 'বিভব' শব্দের অর্থ হল -

সর্বমূর্ত্তসংযোগী। অর্থাৎ সর্বব্যাপক পদার্থ। আবার সংযোগ ও বিভাগ নামক গুণ দুটি হতে শব্দের উৎপত্তি হওয়ায়, ঐ দুটি গুণও আকাশে বিদ্যমান। তাই কণাদ পরে বলেছেন - 'সংযোগাদ্বিমভাগাচ্চ শব্দনিষ্পত্তিঃ (বৈ.সূ.-২.২.৩১)'। তাই প্রশস্তপাদাচার্য আকাশস্থিত গুণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন - "শব্দলিঙ্গবিশেষাদেকত্বং সিদ্ধম্। তদুবিধানাদেকপৃথকত্বম্। বিভববচনাত্ পরমমহৎপরিমাণম্। শব্দকারণত্ববচনাত্ সংযোগবিভাগাবিতি।"[২৬]

পরিশেষ নামক শেষবদ্ অনুমানের দ্বারা আকাশের শব্দগুণত্ব সিদ্ধ হয়। তাই গ্রন্থকার বলেছেন - "শব্দলিঙ্গত্বমস্য কথম্? পরিশেষাৎ। 'প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ পরিশিষ্যমাণে সংপ্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ।'[২৭] তারপর অনুমান বাক্যের দ্বারা প্রথমে শব্দের বিশেষগুণত্ব সাধন করেছেন। তারপর শব্দের আকাশগুণত্ব সিদ্ধ করেছেন।

● **কাল :** *তর্কভাষা*কার কাল-দ্রব্যের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'কালোঽপি দিগ্বিপরীতপরত্বা-পরত্বানুমেয়ঃ।'[২৮] অর্থাৎ কাল দিকের বিপরীত, পরত্বাপরত্ব গুণের দ্বারা অনুমিত হয়। এখন বক্তব্য হল, কাল যদি দিকের বিপরীত হয়, তাহলে তো প্রথমে দিক্-কে জানতে হবে। তা না হলে কাল-পদার্থের বিষয় বোধগম্য হবে না। বক্তব্য হল, এই 'কাল' ও 'দিক্' উভয় এক, নিত্য ও বিভু পরিমাণ। এরূপ উভয়ই পরত্ব ও অপরত্ব গুণের দ্বারা অনুমিত হয়। তবে এই কালের অনুমাপক 'পরত্ব' এবং 'অপরত্ব' নামক গুণকে কালিক-পরত্বাপরত্ব বলা হয়। স্বরূপত এক হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এরা ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। যেমন - কালের দ্বারা অতীতাদি ব্যবহার সম্পন্ন হয় এবং দিকের দ্বারা পূর্ব, পশ্চিমাদি ব্যবহার সম্পন্ন হয়। তাই *তর্কভাষা*কার কালের এতাদৃশ স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "স চৈকোঽপি বর্তমানাতীতভবিষ্যত্-ক্রিয়োপাধিবশাদ্ বর্তমানাদিব্যপদেশং লভতে, পুরুষ ইব পচ্যদিক্রিয়োপাধিবশাত্ পাচকপাঠকাদিব্যপদেশম্।"[২৯] অর্থাৎ একই পুরুষ যেমন উপাধিবশত 'পাচক', 'পাঠক' প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, সেরূপ কালও একটি হয়েও উপাধিবশত অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, প্রশস্তপাদাচার্য পরত্ব ও অপরত্ব ব্যতীত, যৌগপদ্য, অযৌগপদ্য, চির, ক্ষিপ্র প্রভৃতিকে কালের লিঙ্গরূপে উল্লেখ করেছেন।[৩০] এরূপ আচার্য প্রশস্তপাদের মতে, এই কাল ক্ষণ, লব, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত, যাম, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বর্ষ, যুগ, কল্প, মন্বন্তর, প্রলয় এবং মহাপ্রলয় - এই সকল ব্যবহারের হেতু বা কারণ হয়।[৩১] কাল

সকল জন্যপদার্থের জনক এবং জগতের আশ্রয়। এবিষয়ে বিশ্বনাথ যথার্থই বলেছেন- 'জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রযো মতঃ।'[৩২] সর্ব ব্যাপক হওয়ায়, বিভু। বিভুত্বের জন্য নিত্য স্বরূপ। এটি সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ - এই **পাঁচটি** সামান্যগুণবিশিষ্ট।

পরত্ব ও অপরত্ব গুণের দ্বারা কালের অনুমেয়তা দেখাতে *তর্কভাষা*কার বলেছেন - সমীপস্থ কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিতে সন্নিধানবশত দৈশিক অপরত্ব ব্যবহারের যোগ্য হলেও কালিক দৃষ্টিতে সেখানে পরত্বের জ্ঞান হয়। আবার দৈশিক পরত্ব ব্যবহারের যোগ্য দূরস্থ কোন যুবাপুরুষে, ব্যবধানবশত কালিক দৃষ্টিতে সেখানে অপরত্বের প্রতীতি হয়। অত এব এই সন্নিধান ও ব্যবধানবশত উক্ত বৃদ্ধ এবং যুবাপুরুষে প্রতীয়মান তৎ তৎ অপরত্ব এবং পরত্বের বিপরীত পরত্ব ও অপরত্ব হল কার্য। আর সেই কার্য অবশ্যই কোন কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়। দিক্ প্রভৃতি পদার্থ সেই কার্যের কারণ না হওয়ায়, পরিশেষে ঐ কার্যের কারণরূপে কালই অনুমিত হয়।

● **দিক :** দিক এবং কাল উভয়ই স্বরূপত একত্ব-সংখ্যা, নিত্য ও বিভুপরিমাণ হলেও এরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে একে অন্যের বিপরীত। তাই গ্রন্থকার কালের মত, দিকের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'কালবিপরীতপরত্বাপরত্বানুমেযা দিক্।'[৩৩] এই দিক সূর্যের তত্তদেশসংযোগরূপ উপাধিবশত পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। তাই বলা হয়েছে - 'সা চৈকাপি সবিতুস্তত্তদেশসংযোগোপাধিবশাত্ প্রাচ্যাদিসংজ্ঞা লভতে।'[৩৪] তবে প্রশস্তপাদাচার্যের মতে, উপাধিভেদে প্রাচ্যাদি দশ প্রকার দিক দেবতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়, এগুলি মাহেন্দ্রী, বৈশ্বানরী, যাম্যা, নৈঋতী, বারুণী, বায়ব্যা, কৌবেরী, ঐশানী, ব্রাহ্মী ও নাগী - এই দশ প্রকার দেবনাম যুক্ত হয়।[৩৫]

কালিক পরত্ব ও অপরত্ব গুণের দ্বারা যেমন কাল অনুমিত হয়, সেরূপ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব গুণের দ্বারা দিক্ অনুমিত হয়। তবে এতদ্ব্যতিরিক্ত পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি ব্যবহার জ্ঞানের দ্বারাও দিক্ অনুমিত হয়। কেননা, এছাড়া পূর্বাদি প্রতীতির অন্য কোন নিমিত্ত নেই। তাই *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "পূর্বাদিপ্রত্যয়ৈরনুমেযা। তেষামন্যনিমিত্তাসম্ভবাত্।"[৩৬] দৈশিক পরত্বাপরত্ব এবং পূর্বপশ্চিমাদির দ্বারা অনুমিত এই দিক্ সংখ্যাদি **পাঁচটি** সামান্যগুণ যুক্ত।

অর্থাৎ পরাত্ব ও অপরত্ব ব্যবহারের দ্বারা দিক এবং কাল উভয়ই অনুমিত হলেও ঐ দুটি পদার্থ দিক্ বা কালের গুণ নয়।

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, **আকাশ**, **কাল** এবং **দিক** - এই তিনটি দ্রব্য সংখ্যায় একটি করে হওয়ায়, *তর্কভাষা*কার এগুলির জাতিঘটিত লক্ষণ নির্বচন করেননি। কারণ, এক ব্যক্তিনিষ্ঠধর্ম জাতির বাধক।

● **আত্মা :** *তর্কভাষা*কার 'আত্মা' নামক দ্রব্যের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'আত্মত্বাভিসম্বন্ধবান্ আত্মা।'[৩৭] এরূপ আচার্য প্রশস্তপাদও বলেছেন - 'আত্মত্বাভিসম্বন্ধাদ্ আত্মা।'[৩৮] 'অভিসম্বন্ধ' শব্দের অর্থ হল 'অভিমত-সম্বন্ধ'। এখানে 'অভিমত সম্বন্ধটি' হল সমবায়। কারণ, আত্মাতে সমবায়-সম্বন্ধে আত্মত্ব সামান্য থাকে। সুতরাং আত্মা হল আত্মত্ব সম্বন্ধবান্ পদার্থ। প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, ইন্দ্রিয়গুলি এই আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বিবিধ বিষয় উপলব্ধিত সমর্থ হয়। তাই বিশ্বনাথ আত্মদ্রব্যকে করণরূপ ইন্দ্রয়গুলির অধিষ্ঠাতারূপে বর্ণনা করেছেন - 'আত্মেন্দ্রিযাদ্যধিষ্ঠাতা করণং হি সকর্তৃকম্।'[৩৯] আত্মাতে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি সামান্যগুণ এবং বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম এবং ভাবনাখ্য সংস্কার - এই নয়টি বিশেষগুণ। সর্বমোট **চৌদ্দটি** গুণ থাকে। সুখাদি বৈচিত্রের জন্য আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। আত্মা নামক দ্রব্যের অন্যান্য স্বরূপগুলি পূর্বে আত্মা নামক প্রমেয় পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

● **মন :** এই 'মন' নামক দ্রব্যটির সুখাদি অন্তর্বিষয় উপলব্ধির সাধন। *তর্কভাষা*কার আত্মার মত মন-দ্রব্যের লক্ষণপ্রসঙ্গেও 'অভিসম্বন্ধ' পদের প্রয়োগ করেছেন, সেখানে বলেছেন - 'মনস্ত্বাভিসম্বন্ধবান্ মনঃ।'[৪০] অর্থাৎ যে পদার্থ মনস্ত জাতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তাই মন। এই মন নামক দ্রব্যটি সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, দৈশিক পরত্ব-অপরত্ব এবং বেগাখ্য নামক সংস্কার - এই **আটটি** গুণবিশিষ্ট হয়। সুখাদি অন্তর্বিষয়গুলি মনের দ্বারা গৃতীত হওয়ায়, মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষে আত্মমনসংযোগ ব্যতীত কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। স্বরূপত মন অণু পরিমাণ, নিত্য পদার্থ এবং আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, সকল বিষয় উপলব্ধির সাধন হয়। সেজন্য *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "অণু, আত্মসংযোগী, অন্তরিন্দ্রিযং সুখাদ্যুপলব্ধিকারণং নিত্যঞ্চ। সংখ্যাদ্যষ্টগুণবত্। তৎসংযোগেন বাহ্যেন্দ্রিযমর্থগ্রাহকম্। অত এব সর্বোপলব্ধি সাধনম্।"[৪১] মহর্ষি কণাদ সর্বমূর্তসংযোগীত্বের

অভাববশত মনকে অণু পরিমাণ বলেছেন। সূত্রে বলা হয়েছে - 'তদভাবাদণু মনঃ (বৈ.সূ.-৭.১.২৩)।' এছাড়াও এই মন অত্যন্ত গতিশীল পদার্থ। প্রশস্তপাদাচার্যের মতে, মনে প্রযত্ন ও অদৃষ্ট পরিগ্রহবশত মন দ্রুত গতিসম্পন্ন হয় 'প্রযত্নাদৃষ্টপরিগ্রহবশাদাশুসঞ্চারি চেতি।'[৪২]

অনুমান প্রমাণের দ্বারা মনের অস্তিত্ব সাধন করতে, তর্কভাষা কার বলেছেন - "তথাহি সুখাদ্যুপলব্ধযশ্চক্ষুরাদ্যতিরিক্তকরণসাধ্যাঃ, অসৎস্বপি চক্ষুরাদিষু জাযমানত্বাৎ। যস্তু যদ্বিনৈবোৎপদ্যতে তত্ তদতিরিক্তকরণসাধ্যং, যথা - কুঠারং বিনা উৎপদ্যমানা পচনক্রিযা তদতিরিক্ত বহ্ন্যাদিকরণসাধ্যা। যচ্চ করণং তন্মনঃ। তচ্চ চক্ষুরাদ্যতিরিক্তম্।"[৪৩] অর্থাৎ সুখাদির উপলব্ধি চক্ষুরাদি অতিরিক্ত কোন করণ-সাধ্য, যেহেতু ঐ চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি না থাকলেও সুখাদির উৎপত্তি হতে দেখা যায়। যেমন - কুঠার বিনা উৎপন্ন পাকক্রিয়া, তদতিরিক্ত 'বহ্নি' নামক করণসাধ্য।

*তর্কভাষা*কারের অভিপ্রায়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেমন - কুঠার কাষ্ঠ ছেদনক্রিয়ার করণ। কিন্তু যদি আমরা সেই কাষ্ট সমূহকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি, তাহলেও সেই কুঠার কিংবা সেই জ্বালানি উক্ত পাকক্রিয়ার সাধকতম নয়। কারণ, সেই কারণগুলি ছাড়াও পাকক্রিয়া উৎপন্ন হতে পারে। অত এব স্বীকার করতে হবে, সেই পাকক্রিয়া অবশ্যই অন্য কোন করণ-সাধ্য। সেরূপ চক্ষু প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় না থাকলেও সুখাদি উৎপন্ন হওয়ায়, তা অতিরিক্ত করণ-সাধ্য - এরূপ নিশ্চয় হয়। তার ফলে সুখাদি অন্তর্বিষয় উপলব্ধির সাধনরূপে মন অনুমিত হয়।

* **গুণ :** *তর্কভাষা*কার গুণ-পদার্থের লক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'সামান্যবান্ অসমবায়িকারণমস্পন্দাত্মা গুণঃ।'[৪৪] যদি কেবল 'সামান্যবান্ গুণঃ' - এরূপ বলা হয়, তাহলে লক্ষণটি দ্রব্য ও কর্মে অতিব্যাপ্ত হয়। সেই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণে 'অসমবায়িকারণ' ও 'অস্পন্দাত্মা' - এই দুটি পদ যুক্ত হয়েছে। কারণ, অসমবায়িকারণ সর্বদা গুণ ও কর্ম হয়। আবার 'অস্পন্দ' শব্দে কর্ম-ভিন্নের গ্রহণ হওয়ায়, এর দ্বারা গুণকে বুঝতে হবে। অত এব 'অসমবায়িকারণ' বলাতে, দ্রব্যের নিষেধ হল এবং 'অস্পন্দাত্মা' বলাতে, কর্মের নিষেধ হল। সুতরাং সামান্যবিশিষ্ট, অসমবায়িকারণ এবং কর্মভিন্ন পদার্থ বলতে, গুণেরই অভিধান হয়। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, মহর্ষি কণাদ গুণের লক্ষণ করেছেন - 'দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্ (বৈ.সূ.-১.১.১৬)।' অর্থাৎ যে পদার্থটি

দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান্ এবং সংযোগ ও বিভাগের প্রতি অনপেক্ষ অর্থাৎ নিরপেক্ষ কারণ নয়, সেই পদার্থটি হল গুণ। গুণমাত্রই দ্রব্যাশ্রিত, সেজন্য গুণে দ্রব্যাশ্রয়িত্ব বিদ্যমান। কিন্তু সাবায়ব দ্রব্যও অবয়বিদ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। অত এব উক্ত দ্রব্যাশ্রয়িত্ব সাবয়বদ্রব্যেও বিদ্যমান। সেজন্য 'যা দ্রব্যাশ্রয়ী তাই গুণ' - এরূপ বললে, গুণ লক্ষণটি অবয়বিদ্রব্যে অতিব্যাপ্ত হয়। তাই বলা হয়েছে - অগুণবান্। কারণ, অবয়বিদ্রব্যে গুণ থাকে, তা কখন গুণরহিত হয় না। আবার 'দ্রব্যাশ্রয়ী অগুণবান্' পদার্থকে যদি গুণ বলা হয়, তাহলে লক্ষণটি কর্মে অতিব্যাপ্ত হবে। তাই বলা হয়েছে 'সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষঃ'। কারণ, কর্ম সংযোগ ও বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ। অত এব সংযোগ ও বিভাগের প্রতি অনপেক্ষ অকারণ বলতে, কর্মভিন্ন গুণকেই বোঝায়। তাই সূত্রকার দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান্ এবং সংযোগ বিভাগের প্রতি অনপেক্ষ কারণ নয় - এমন পদার্থকে গুণ বলেছেন। গ্রন্থান্তরে দ্রব্যকর্মভিন্নসত্তাবান্ পদার্থকে গুণ বলা হয়েছে। এটি গুণের প্রসিদ্ধ লক্ষণ। *তর্কভাষা*কার স্বকীয় গুণ-লক্ষণটির দ্বারা সেই বিষয়গুলি প্রতিপাদন করেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে রূপাদি চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকৃত হলেও মহর্ষি কণাদ গুণ-বিভাগসূত্রে গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার - এই সাতটি গুণের কথা বলেননি।[৪৫] তবে আচার্য প্রশস্তপাদ,[৪৬] শঙ্করমিশ্র[৪৭] প্রভৃতি বৈশেষিকাচার্যের মতে, গুরুত্বাদি গুণগুলি মহর্ষি কণাদের কণ্ঠে উক্ত না হলেও সূত্রোক্ত 'চ'- শব্দটির দ্বারা তিনি অবশিষ্ট ঐ সকল গুণের অবধারণের কথা বলেছেন। কারণ, বৈশেষিকসূত্রে অবশিষ্ট গুণসমূহের আলোচনাও দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা গুরুত্বাদির গুণত্ব সিদ্ধ হয়।

উক্ত চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, বেগাখ্য সংস্কার – এই দশটি হল মূর্তগুণ। এরূপ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা নামক সংস্কার ও শব্দ - এই দশটি হল অমূর্তগুণ। আবার সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ – এই পাচটি গুণ মূর্ত ও অমূর্ত উভয় দ্রব্যবৃত্তি গুণ। এরূপ সংযোগ, বিভাগ, দ্বিত্বাদিসংখ্যা এবং দ্বিপৃথকত্ব প্রভৃতি অনেকাশ্রিত গুণ। আবার একত্ব সংখ্যা ও একপৃথকত্ব একাশ্রিত গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, এবং বেগ নামক সংস্কার - এই দশটি হল সামান্যগুণ। আবার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ,

প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম এবং ভাবনা নামক সংস্কার - এই ষোলটি গুণ হল বিশেষগুণ। এরূপ উক্ত গুণগুলির মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ - এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ এবং বেগ - এই নয়টি দ্বীন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ। এখানে 'দ্বীন্দ্রিয়' বলতে, চক্ষু এবং ত্বক্ - এই দুটি ইন্দ্রিয় বোদ্ধব্য। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন - এই ছয়টি অন্তরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ। এরূপ গুরুত্ব, ধর্ম, অধর্ম এবং ভাবনা নামক সংস্কার - এই চারটি অতীন্দ্রিয় গুণ। এরূপ পাকজগুণ, অপাজগুণ ইত্যাদি প্রকারে গুণের বহুবিধ ভেদ বিদ্যমান।

রূপাদি গুণের পরিচয় :–

● **রূপ :** *তর্কভাষা*কার রূপ নামক গুণের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'তত্র রূপং চক্ষুর্মাত্রগ্রাহ্যো বিশেষগুণঃ।'[৪৮] অর্থাৎ উক্ত চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে কেবলমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত গুণ বিশেষই হল, রূপ। এরূপ আচার্য বিশ্বনাথ - 'চক্ষুর্গ্রাহ্যং ভবেদ্ রূপং...'[৪৯] ইত্যাদি কারিকার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন - "চক্ষুর্গাহ্যমিতি। চক্ষুর্গ্রাহ্যবিশেষগুণত্বমিত্যর্থঃ।"[৫০] সুতরাং রূপ হল চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষগুণ। লক্ষণোক্ত 'গ্রাহ্য' পদটির অর্থ হল, প্রত্যক্ষ-যোগ্য। সংখ্যা প্রভৃতি দ্বীন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'মাত্র' এবং 'বিশেষগুণ'- এই দুটি পদ প্রযুক্ত হয়েছে। এই রূপ নামক গুণটি পৃথিবী, জল ও তেজ - এই তিনটি দ্রব্যে থাকে। তার মধ্যে পার্থিব দ্রব্যে বিদ্যমান রূপ অনিত্য এবং পাকজ হয়। এরূপ জলীয় ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য। আবার অনিত্য জলের অভাস্বর শুক্লরূপ এবং অনিত্য তেজের ভাস্বর শুক্লরূপ, অনিত্য এবং অপাকজ হয়।

বৈশেষিক আচার্যগণ শুক্ল, নীল, রক্ত, পীত, হরিত, কপিশ এবং চিত্র ভেদে সাত প্রকার রূপ স্বীকার করেছেন - 'রূপং সিত-লোহিত-পীত-কৃষ্ণ-হরিত-কপিশ-চিত্রভেদাত্ সপ্তবিধম্।'[৫১] কিন্তু প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে চিত্ররূপ বিষয়ে বিতর্ক বিদ্যমান। প্রাচীন মতে, নানা জাতীয় রূপবিশিষ্ট অবয়বীতে একটি বিজাতীয় চিত্ররূপ স্বীকার করতে হবে। যেহেতু, নানা জাতীয় রূপাবয়বের দ্বারা আরব্ধ অবয়বীতে ব্যাপ্যবৃত্তি নানা রূপের উৎপত্তি হয় না। কারণ, নানা রূপাবয়বের দ্বারা আরব্ধ চিত্ররূপ অব্যাপ্যবৃত্তি হয়। অত এব সেই স্থলে বিজাতীয় ব্যাপ্যবৃত্তি চিত্ররূপের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। আর তা না হলে, চিত্ররূপ প্রতীতির জন্য নানা রূপের কল্পনা করলে, গৌরব দোষ হবে। সুতরাং চিত্ররূপ

অনস্বীকার্য। আচার্য বিশ্বনাথ *সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে* প্রাচীন নৈয়ায়িকদের এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে বলেছেন - "...তস্মান্না-নাজাতীযরূপৈরবযবিনি বিজাতীযং চিত্রং রূপমারভ্যতে। অত এবৈকং চিত্ররূপমিত্যনুভবোঽপি, নানারূপকল্পনে গৌরবাত্।"[৫২]

কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকদের মতে, অবয়বনিষ্ঠ নীল, পীতাদি রূপ ব্যাপ্যবৃত্তি হলেও অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি নীলাদি রূপের উৎপত্তি স্বীকারে কোন অসঙ্গতি নেই। এরূপ পীতরূপের উৎপত্তিতে নীলাদি রূপের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করলে, কল্পনার গৌরব হয়। যেমন, নানা রূপ বিশিষ্ট তন্তু দ্বারা নির্মিত পটের ভিন্ন ভিন্ন অংশে, যে ভিন্ন ভিন্ন রূপের উপলব্ধি হয়, তা পটের রূপ নামেই অভিহিত হয়। অত এব এই অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি নানা রূপের কল্পনা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এছাড়া এই বিষয়ে শাস্ত্রবচন দৃষ্ট হয়। *সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে* উক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - "নব্যাস্তু তত্রাব্যাপ্যবৃত্ত্যেব নানারূপং, নীলাদেঃ পীতাদিপ্রতিবন্ধকত্বকল্পনে গৌরবাত্। অত এব -

'লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ।
শ্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে॥'

ইত্যাদি শাস্ত্রমুপপদ্যতে। ন চ ব্যাপ্যাব্যাপ্যবৃত্তিজাতীযযোর্বিরোধঃ মানাভাবাত্। ন চ লাঘবাদেকং রূপম্ অনুভববিরোধাত্। অন্যথা ঘটাদেরপি লাঘবাদৈক্যং স্যাত্। এতেন স্পর্শাদিকমপি ব্যাখ্যাতমিতি বদন্তি।"[৫৩] অর্থাৎ যদি লাঘববশত একটি চিত্ররূপ স্বীকার হয়, তাহলে ঘটাদি পার্থিব বিষয়েরও একত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু একই অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি নানা রূপের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়ায়, সেক্ষেত্রে লাঘবযুক্তিতে একটি চিত্ররূপ স্বীকার অযৌক্তিক। এরূপ স্পর্শাদির ক্ষেত্রেও বুঝতে হবে। ন্যায়শাস্ত্রে, চিত্ররূপ বিষয়ে নব্য ও প্রাচীনদের এরূপ বহুবিধ যুক্তি পাওয়া যায়। *তর্কভাষা*কার শুক্লাদি ভেদে অনেক প্রকার রূপের কথা বলায়, এর দ্বারা তিনি যে চিত্ররূপের কথা বলেছেন, তা বোঝা যায়।

● **রস :** রসনা নামক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিশেষ গুণ হল রস। তাই *তর্কভাষা*কার বলেছেন - 'রসো রসনেন্দ্রিযগ্রাহ্যো বিশেষগুণঃ।'[৫৪] এই রস পৃথিবী ও জলে থাকে। তার মধ্যে পৃথিবীতে মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত ভেদে ছয় প্রকার রস থাকে। পৃথিবীর রসগুলি পাকজ। জলে কেবল মধুর এবং অপাকজ রস থাকে। পরমাণুরূপ জলের রস নিত্য

এবং কার্যরূপ জলের রস অনিত্য। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, আচার্য প্রশস্তপাদের মতে, এই রস মানুষের জীবনধারণ, শরীরের পুষ্টি সম্পাদন, শরীরে শক্তি সঞ্চার ও আরোগ্যের হেতু। নব্য বা প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে চিত্ররস স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থে চিত্ররস সহ সাত প্রকার রস উল্লিখিত হয়েছে। মাধবাচার্য এই বিষয়ে তাঁর *মিতভাষিণী* টীকায় বলছেন যে, রস মূলত ছয় প্রকার হলেও হরীতকিতে চিত্ররসের অনুভব হয়। তবে *প্রশস্তপাদভাষ্য* ও অন্যান্য বৈশেষিক গ্রন্থে মধুরাদি ছয় প্রকার রসেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। অত এব বৈশেষিক শাস্ত্রের একাংশে চিত্ররস স্বীকৃত হয়েছে - এরূপ বলা যায়। কিন্তু নব্য বা প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে চিত্ররস স্বীকৃত না হওয়ায়, *তর্কভাষা*কার সর্বসিদ্ধ মধুরাদি ছয় প্রকার রসের কথাই বলেছেন।

● **গন্ধ :** *তর্কভাষা*কার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের লক্ষণ করেছেন - 'গন্ধঃ ঘ্রাণগ্রাহ্যো বিশেষগুণঃ।'[৫৫] গন্ধ কেবলমাত্র পৃথিবীতে থাকে। তাই পার্থিব গুণ হওয়ায়, এটি অনিত্য হয়। এই গন্ধ সুরভি এবং অসুরভি ভেদে - দুই প্রকার হয়। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, জল প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে যে গন্ধ গুণের প্রতীতি হয়, সেগুলি জলাদির নিজস্ব গুণ নয়। সেখানে সংযুক্ত পার্থিব বস্তুর গন্ধই সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষের দ্বারা আমাদের প্রতীতি হয়।[৫৬] নব্য বা প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে চিত্ররসের মত চিত্রগন্ধও স্বীকৃত হয়নি।

● **স্পর্শ :** ত্বগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষ গুণ হল স্পর্শ। তাই গ্রন্থকার বলেছেন- 'স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিযগ্রাহ্যো বিশেষগুণঃ।'[৫৭] স্পার্শন প্রত্যক্ষের প্রতি এই স্পর্শ সহকারী কারণ হয়। স্পর্শ গুণ শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত ভেদে তিন প্রকার হয়। পৃথিব্যাদি চারটি দ্রব্যবৃত্তি। জলে শীতস্পর্শ, তেজে উষ্ণস্পর্শ এবং পৃথিবী ও বায়ুতে অনুষ্ণশীত স্পর্শ থাকে। পৃথিবীমাত্রে স্পর্শ গুণ অনিত্য। কিন্তু পরমাণুরূপ জল, তেজ ও বায়ুতে নিত্য স্পর্শ গুণ থাকে। আর কার্যরূপ জল, তেজ ও বায়ুতে অনিত্য স্পর্শ থাকে। পূর্বোক্ত রূপাদি চারটি গুণই যদি মহৎপরিমাণ বিশিষ্ট হয়, তাহলে এদের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

এখানে জ্ঞাতব্য যে, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ - এই চারটি গুণ, চক্ষুরাদি চারটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বিশেষ গুণ হওয়ায়, *তর্কভাষা*কার তত্তদ্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে উক্ত চারটি গুণের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, রূপের লক্ষণে গ্রন্থকার 'মাত্র' পদের প্রয়োগ করলেও রসাদি গুণের ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হয়নি। *তর্কভাষা*কারের এরূপ বিশেষ

কথনের কারণ হল, রসনা, ঘ্রাণ ও ত্বক্ - এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল রস, গন্ধ ও স্পর্শ গুণেরই গ্রহণ হয়। সেজন্য এই তিনটি গুণের লক্ষণে 'মাত্র' শব্দ প্রযুক্ত হয়নি।

● **সংখ্যা :** সংখ্যা হল একত্ব, দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি ব্যবহারের হেতু হয় এবং সামান্যগুণ। এই সংখ্যা একত্ব হতে আরাম্ভ করে, পরার্ধ পর্যন্ত বিদ্যমান। 'পরার্ধ' বলতে, বোঝায় চরমতম সংখ্যাবিশেষ। আকাশাদি নিত্য পদার্থগত একত্ব-সংখ্যা নিত্য এবং ঘটাদিগত একত্ব-সংখ্যা অনিত্য। ঘটাদি বস্তুগত একত্ব-সংখ্যা নিজের আশ্রয়ভূত সমবায়িকারণে বিদ্যমান্ একত্ব-সংখ্যা হতে উৎপন্ন হয়।

দ্বিত্ব সংখ্যা সর্বদা অনিত্য হয়। যেহেতু সেটি 'এটি একটি ঘট', 'এটি একটি ঘট' - এই উভয় মিলে দুইটি ঘট - এরূপ অপেক্ষাবুদ্ধি হতে উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন দ্বিত্ব সংখ্যায় দুইটি ঘটরূপ দ্রব্য হল সমবায়িকারণ, আবার ঐ দুটি ঘটে বিদ্যমান একত্ব-সংখ্যা হল অসমবায়িকারণ। দুটি একত্বের অপেক্ষাবুদ্ধি হল নিমিত্তকারণ। দ্বিত্ব সংখ্যা হতে পরার্ধ পর্যন্ত বিদ্যমান সংখ্যাগুলি অপেক্ষাবুদ্ধি হতে উপন্ন হওয়ায়, সেগুলি সর্বদা অনিত্য হয়। এভাবে ত্রিত্বাদি সংখ্যার ক্ষেত্রেও বুঝতে হবে।

অপেক্ষাবুদ্ধি যেমন দ্বিত্বাদি সংখ্যা উৎপত্তির কারণ, তেমনই আবার সেই অপেক্ষাবুদ্ধির বিনাশে দ্বিত্বাদিরও বিনাশ হয়। প্রশস্তপাদভাষ্যে এই দ্বিত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রসঙ্গে ক্রমে সাত ও নয় ক্ষণের কথা বলা হয়েছে। তবে উক্ত সকল ক্ষণভেদের মূল হল অপেক্ষাবুদ্ধি। সেজন্য *তর্কভাষা*কার অপেক্ষাবুদ্ধিকে দ্বিত্বের উৎপত্তি-বিনাশের কারণরূপে উল্লেখ করেছেন।

● **পরিমাণ :** পরি-পূর্বক মা-ধাতুর উত্তর ল্যুট্-প্রত্যয় করে 'পরিমাণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। *তর্কভাষা*কার পরিমাণের লক্ষণ-প্রসঙ্গে বলেছেন - 'পরিমাণং মানব্যবহারাসাধারণং কারণম্।'[৫৮] অর্থাৎ মান বা পরিমাপ ব্যবহারের প্রতি যে অসাধারণ কারণ, তাই হল পরিমাণ। এরূপ আচার্য প্রশস্তপাদ বলেছেন - 'পরিমাণং মানব্যবহারকারণম্।'[৫৯] তবে 'কারণ' বলতে, অসাধারণকারণকে বুঝতে হবে। কেননা, তা না হলে, কালাদি সাধারণকারণে পরিমাণের লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হবে। আর সেজন্য আচার্য বিশ্বনাথ কারিকায় মানব্যবহারের কারণকে পরিমাণ বললেও তার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'অসাধারণ' পদটি যোগ করে বলেছেন - 'পরিমিতিব্যবহারাসাধারণং কারণং পরিমাণমিত্যর্থঃ।'[৬০] সুতরাং *তর্কভাষা*কার পূর্বোক্ত দোষ পরিহার করতে, লক্ষণে 'অসাধারণ' পদটি যোগ করেছেন।

এই পরিমাণ অণু, মহৎ, দীর্ঘ এবং হ্রস্ব ভেদে চার প্রকার হয়। কার্যদ্রব্যে স্থিত এই চতুর্বিধ পরিমাণ আবার সংখ্যাযোনি, পরিমাণযোনি এবং প্রচয়যোনি ভেদে তিন প্রকার হয়। 'সংখ্যাযোনি', যেমন - দ্ব্যণুকের অণুপরিমাণ ঈশ্বরের অপেক্ষাবুদ্ধি জন্য পরমাণুগত দ্বিত্ব-সংখ্যা হতে উৎপন্ন হয়। এরূপ ত্র্যসরেণুর পরিমাণও স্বাশ্রয়সমবায়িকারণস্থিত তিনটি দ্ব্যণুকগত বহুত্ব-সংখ্যা হতে উৎপন্ন হয়। এখানে দ্বিত্ব বা বহুত্ব-সংখ্যা কারণ হওয়ায়, এগুলি সংখ্যাযোনির উদাহরণ। 'পরিমাণযোনি', যেমন - চতুরণুকের পরিমাণ, স্বাশ্রয়সমবায়িকারণ-স্থিত ত্র্যসরেণুকগত মহৎপরিমাণ হতে উৎপন্ন হয়। অবয়বের পরিমাণ হতে উৎপন্ন হওয়ায়, এটি হল পরিমাণযোনির উদাহরণ। আবার 'প্রচয়যোনি' বলতে বোঝায়, অবয়বসমূহের শিথিল সংযোগরূপ কারণ বিশেষ। যেমন - তুলারাশির পরিমাণ। এটি স্বাশ্রয়ভূত সমবায়িকারণস্থিত তুলারাশির শিথিলাখ্য অবয়ব সমূহের সংযোগ হতে উৎপন্ন হওয়ায়, প্রচয়যোনির উদাহরণ। সংখ্যার মত পরিমাণও সর্বদ্রব্যবৃত্তি হওয়ায়, সামান্যগুণ।

● **পৃথকত্ব :** 'এই বস্তুটি, ঐ বস্তু হতে পৃথক্' - এরূপ পৃথক্-ব্যবহারের প্রতি যে পদার্থটি অসাধারণকারণ, তাকে পৃথকত্ব বলা হয়।[৬১] এই পৃথকত্ব দুই প্রকার। যথা - একপৃথকত্ব এবং দ্বিপৃথকত্ব প্রভৃতি। একপৃথকত্ব আবার নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার হয়। পরমাণ্বাদি নিত্য দ্রব্যগত একপৃথকত্ব নিত্য এবং ঘটাদি অনিত্য দ্রব্যগত একপৃথকত্ব অনিত্য। দ্বিপৃথকত্বাদি গুণ সর্বদা অনিত্য হয়।

আপত্তি হতে পারে, অন্যোন্যাভাবের দ্বারাই এই পৃথক্-ব্যবহার সম্পন্ন হয়। যেমন - 'ঘটো ন পটঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ ঘট, পট নয়। পট হতে ঘট পৃথক্। সুতরাং পৃথকত্ব নামক অতিরিক্ত গুণ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। এরূপ বিপ্রতিপত্তি বিষয়ে বক্তব্য হল, অন্যোন্যাভাব এবং পৃথকত্ব স্বরূপত ভিন্ন। যেমন - 'ঘটো ন পটঃ' এবং 'ঘটাৎ পটঃ পৃথকঃ' - এই দুটি বাক্যের মধ্যে 'ঘট' পদে প্রথমান্ত এবং পঞ্চম্যন্ত বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে। দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থগত বৈষম্য না থাকলেও গঠনগত বৈষম্য বিদ্যমান। এছাড়া অন্যোন্যাভাব নিষেধ প্রত্যয়ের বিষয়। কিন্তু পৃথকত্ব বিধি প্রত্যয়ের বিষয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত ভেদবশত ঐ দুটিকে ভিন্ন স্বীকার করতে হবে। এভাবে উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা স্বীকৃত হলে, পৃথকত্বের গুণত্বও সিদ্ধ হবে। আচার্য বিশ্বনাথ উক্ত বিষয়টি উপপাদন করতে বলেছেন -

"অন্যোন্যাভাবতো নাস্য চরিতার্থত্বমুচ্যতে।
অস্মাৎ পৃথগিদং নেতি প্রতীতির্হি বিলক্ষণা॥"[৬২]

সুতরাং অন্যোন্যভাবের দ্বারা পৃথকত্ব ব্যবহার উপপন্ন হয় না। এই পৃথকত্ব সর্বদ্রব্যবৃত্তি হওয়ায়, এটিও একটি সামান্যগুণ।

● **সংযোগ :** সংযুক্ত ব্যবহারের হেতু যে গুণ, তাকে সংযোগ বলা হয়। তাই *তর্কভাষা*কার বলেছেন - 'সংযোগঃ সংযুক্তব্যবহারহেতুর্গুণঃ।'[৬৩] এই সংযোগ দুটি অসম্বন্ধিত বিষয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সেজন্য আচার্য প্রশস্তপাদ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে সংযোগ বলেছেন।[৬৪] একই ভাবে আচার্য বিশ্বনাথও অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে সংযোগ বলেছেন।[৬৫] এতদ্ স্থলে 'প্রাপ্তি' শব্দটি 'সম্বন্ধ' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ অসম্বন্ধরূপে বিদ্যমান দুটি দ্রব্যের যে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাই সংযোগ।

এই সংযোগ দুইটি দ্রব্যে অবস্থান করায়, এটি স্বরূপত দ্ব্যাশ্রয় এবং অব্যাপ্যবৃত্তি। এই সংযোগ এটি তিন প্রকার হয়, যথা- অন্যতরকর্মজ, উভয়কর্মজ এবং সংযোগজ। উক্ত ত্রিবিধ সংযোগের মধ্যে অন্যতরকর্মজ সংযোগ, যেমন - ক্রিয়াবান বাজপাখির সঙ্গে নিষ্ক্রিয় স্থাণুর সংযোগ। বাজপাখি তার উড্ডয়ন কর্ম দ্বারা স্থাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হল। তাই বাজপাখির উড়ে আসা ক্রিয়া হল অন্যতর সংযোগের প্রতি অসাধারণকারণ। এরূপ দুটি ক্রিয়মাণ ব্যক্তির যে সংযোগ ঘটে সেটি হল উভয়কর্মজ সংযোগ। যেমন - দুই মল্লযোদ্ধার মধ্যে যে সংযোগ। অবার যখন কোন স্থলে সংযোগের দ্বারা সংযোগ হয়, তখন সেটিকে বলে সংযোগজ-সংযোগ। যেমন - হস্তের সঙ্গে বৃক্ষের সংযোগ হলে, তার দ্বারা শরীরের সঙ্গেও বৃক্ষের সংযোগ হয়। সংযোগও সর্বদ্রব্যবৃত্তি সামান্যগুণ।

● **বিভাগ :** বিভাগ নামক গুণটি হল সংযোগের বিপরীত। এখানে পূর্বে সংযুক্ত বিষয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। সংযোগ যেমন সংযুক্ত ব্যবহারের হেতু, বিভাগ সেরূপ বিভক্ত প্রত্যয়ের হেতু। তাই *তর্কভাষা*কার বিভাগের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'বিভাগোঽপি বিভক্তপ্রত্যয়হেতুঃ।'[৬৬] এরূপ সংযোগের মত, বিভাগও তিন প্রকার হয়। যথা - অন্যতরকর্মজ, উভয়কর্মজ এবং বিভাগজবিভাগ। তবে, *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থে উক্ত সংযোগ ও বিভাগ নামক গুণদ্বয়ের দুই প্রকার ভেদের কথা বলা হয়েছে। যথা - কর্মজ-সংযোগ ও সংযোগজ-সংযোগ এবং কর্মজ-বিভাগ ও বিভাগজ-বিভাগ।[৬৭] আবার আচার্য প্রশস্তপাদ[৬৮] এবং বিশ্বনাথ[৬৯] উক্ত সংযোগ ও বিভাগের

তিন প্রকার ভেদ স্বীকার করে, বিভাগজ-বিভাগের দুই প্রকার অবান্তরভেদের কথা বলেছেন। যথা - একটি হল কারণমাত্রের বিভাগজন্য এবং অন্যটি কারণ ও অকারণ উভয়েরই বিভাগজন্য। কিন্তু *তর্কভাষা*কার সংযোগ ও বিভাগের তিন প্রকার ভেদ স্বীকার করলেও আচার্য প্রশস্তপাদ বা বিশ্বনাথের মত, বিভাগজবিভাগের ঐরূপ অবান্তরভেদের কথা বলেননি। সংযোগের মত, বিভাগও সর্বদ্রব্যবৃত্তি সামান্যগুণ।

● **পরত্ব ও অপরত্ব :** পর এবং অপর ব্যবহারের দ্বারা উভয়েরই প্রসিদ্ধি হওয়ায়, গ্রন্থকার এই দুটি গুণের লক্ষণ একত্রে প্রতিপাদন করেছেন - 'পরত্বাঽপরত্বে পরাঽপরব্যবহারা-সাধারণকারণে।'[৭০] অর্থাৎ পর এবং অপর ব্যবহারের অসাধারণকারণ হল 'পরত্ব' এবং 'অপরত্ব' নামক গুণ। পৃথিবী, জল, তেজ, ও বায়ু - এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু এবং মনে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব বিদ্যমান। আবার পৃথিব্যাদি চারটি অনিত্য দ্রব্যে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব বিদ্যমান।

ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত পর এবং অপর (ব্যবহার) দুই ভাবে সম্পন্ন হয়। যথা - দিক্কৃত এবং কালকৃত। দূরবর্তী বস্তুতে দিক্কৃত-পরত্ব এবং নিকটবর্তী বস্তুতে দিক্কৃত-অপরত্বের ব্যবহার হয়। আবার জ্যেষ্ঠ বা বৃদ্ধ ব্যক্তিতে কালকৃত-পরত্ব এবং কনিষ্ঠ বা যুবাপুরুষে কালকৃত-অপরত্বের ব্যবহার হয়।

● **গুরুত্ব :** কোন পদার্থের আদ্য বা প্রথম পতনের অসমবায়িকারণ হল গুরুত্ব। তাই *তর্কভাষা*কার বলেছেন - 'গুরুত্বমাদ্যপতনাসমবায়িকারণম্।'[৭১] বেগাখ্য সংস্কারে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'আদ্য' পদটির সন্নিবেশ করা হয়েছে। কারণ, দ্বিতীয়াদি ক্ষণে বস্তুর যে পতন হয়, তার কারণ হল বেগ। এই গুরুত্ব পৃথিবী ও জলে থাকে। সংযোগ, বেগ ও প্রযত্নের অভাবে বস্তুর পতন হয়। এই গুরুত্ব প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট না হলেও পতন ক্রিয়া দ্বারা অনুমিত হয়।

● **দ্রবত্ব :** কোন পদার্থের আদ্য-স্যন্দনের অসমবায়িকারণ হল দ্রবত্ব গুণ। তাই *তর্কভাষা*কার বলেছেন - 'দ্রব্যত্বমাদ্যস্যন্দনাসমবায়িকারণম্।'[৭২] লক্ষণোক্ত 'স্যন্দন' শব্দের অর্থ হল প্রবাহ। অর্থাৎ আদ্য বা প্রথম প্রবাহের অসমবায়িকারণ হল দ্রবত্ব। এই দ্রবত্ব পৃথিবী, জল এবং তেজে থাকে। পার্থিব ঘৃতাদি ও সুবর্ণে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বিদ্যমান। আবার জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব বিদ্যমান। তাই গ্রন্থকার বলেছেন - "ভূতেজসোর্ঘৃতাদিসুবর্ণযোরগ্নিসংযোগেন দ্রবত্বং

নৈমিত্তিকম্। জলে নৈসর্গিকং দ্রবত্বম্।"[৭৩] তীব্র অগ্নিসংযোগেও জলের রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই জলের দ্রবত্ব সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক। কিন্তু সুবর্ণ বা ঘি পোড়ালে, তরলে পরিণত হয়ে সেখানে তার দ্রবত্ব উৎপন্ন হয়। সেজন্য এগুলির দ্রবত্ব হল নৈমিত্তিক।

● **স্নেহ :** *তর্কভাষা*কার স্নেহ পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - "স্নেহশ্চিক্কণতা। জলমাত্রবৃত্তিঃ। কারণগুণপূর্বকো গুরুত্বাদিবদ্ যাবদ্দ্রব্যভাবী।"[৭৪] অর্থাৎ চিক্কণতা বা মসৃণতাবিশিষ্ট পদার্থ হল স্নেহ। এই স্নেহ জলের বিশেষ গুণ। পরমাণুরূপ জলে নিত্য স্নেহ এবং কার্যরূপ জলে অনিত্য স্নেহ থাকে। অনিত্য স্নেহ স্বাশ্রয়সমবায়িকারণগত স্নেহ হতে উৎপন্ন হয়। তাই অনিত্যস্নেহ কারণগুণপূর্বক হয়। গুরুত্বাদির মত এটিও দ্রব্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে।

এই স্নেহ নামক গুণটি আটা প্রভৃতি চুর্ণ জাতীয় পদার্থের পিণ্ডীভাবের হেতু হয়।[৭৫] সেজন্য অন্নংভট্ট বলেছেন - 'চূর্ণাদিপিণ্ডীভাবহেতুর্গুণঃ স্নেহঃ।'[৭৬] কিন্তু চূর্ণ পদার্থের পিণ্ডীভাবের প্রতি স্নেহ গুণ যেমন নিমিত্ত কারণ, সেরূপ সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বও নিমিত্তকারণ হয়। তাই অন্নংভট্টের এই লক্ষণটি সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বে অতিব্যাপ্ত হয়। তাই বলতে হবে - 'সাংসিদ্ধিকদ্রবত্বভিন্নত্বে সতি চূর্ণাদিপিণ্ডীভাবহেতুর্গুণঃ স্নেহঃ।' তবে এরূপ লক্ষণ করলেও লক্ষণটি কার্যমাত্রের প্রতি সাধারণকারণ কালে অতিব্যাপ্তি হবে। তাই 'হেতু' পদের অর্থ বুঝতে হবে - অসাধারণকারণ। সেজন্য আচার্য শিবাদিত্য স্নেহ নামক গুণের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'স্নেহত্বসামান্যবান্ দ্রবত্বত্বশূন্যঃ সংগ্রহাসাধারণকারণং স্নেহঃ।'[৭৭] দ্রবত্বে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'দ্রবত্বত্বশূন্য' পদ, রূপাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'সংগ্রহ' পদ এবং কালাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অসাধারণ' পদ প্রযুক্ত হয়েছে। তবে *তর্কভাষা*কার স্নেহ-লক্ষণের উক্ত দোষ পরিহারের জন্য, চিক্কণতাদি পর্যায় শব্দের দ্বারা লক্ষণ করেছেন।

● **শব্দ :** শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই শব্দ নামক গুণটি গৃহীত হয়। এটি আকাশের বিশেষগুণ।[৭৮] এই শব্দ দুই প্রকার হয়। যথা- ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র হতে নির্গত হয়। আর বর্ণাত্মক শব্দ কণ্ঠতাল্বাদির অভিঘাতে উৎপন্ন হয়। এখন প্রশ্ন হল, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজলে, তা কীভাবে আমাদের কর্ণগোচর হয়? এই প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যদের বক্তব্য হল, ভেরী প্রদেশে উৎপন্ন শব্দ দুই ভাবে আমাদের কর্ণগোচর হয়। যথা - বীচীতরঙ্গন্যায় এবং কদম্বমুকুলন্যায়। 'বীচী' শব্দের অর্থ হল, জল এবং 'তরঙ্গ'

শব্দের অর্থ হল, ঢেউ। অত এব 'বীচীতরঙ্গ' বলতে বোঝায়, জলের ঢেউ। কোন পুষ্করিণী বা ঐ জাতীয় কোন জলাশয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করলে, দেখা যায় যে, সেখানে প্রথম ঢেউ, দ্বিতীয় ঢেউকে উৎপন্ন করে, এরূপ দ্বিতীয় ঢেউ তৃতীয়কে আবার তৃতীয় চতুর্থকে এভাবে ক্রমে উৎপন্ন অন্তিম ঢেউ বীচীতরঙ্গন্যায়ে তীরে পৌছায়।

একই ভাবে ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র হতে নির্গত শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দকে উৎপন্ন করে, দ্বিতীয়টি তৃতীয়কে উৎপন্ন করে, এভাবে উৎপন্ন হতে হতে অন্তিম শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হয়। যেমন - প্রত্যক্ষ যোগ্য দূরে কেউ কুঠার দিয়ে বাঁশ প্রভৃতি বস্তু চেরাই করলে, তার যে চট্ চট্ শব্দ এবং কুঠারের উত্থান-পতন ক্রিয়া উভয়ই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা সেই স্থলে যে সময়ে কুঠারাঘাত করতে দেখি, তার ক্ষণভেদে সেই অভিঘাতের শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হয়। কারণ, ঐ শব্দ বীচীতরঙ্গন্যায়ে আমাদের কর্ণশষ্কুলীতে পৌছায় বলে, শব্দ উৎপত্তির অব্যবহিত পরে তা গৃহীত হয়।

আবার বর্ষা ঋতুতে কদম্বমুকুল বিকশিত হওয়ার সময় প্রথমে একদল পঙ্‌ক্তি উৎপন্ন হয়। তারপর আবার এই পঙ্‌ক্তির চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তি উৎপন্ন হয়। এভাবে ক্রমে বৃত্তাকারে সজ্জিত হয়ে কদম্বমুকুলটি সম্পূর্ণ বিকশিত হয়। একই ভাবে ভেরী ও দণ্ডের সংযোগে আকাশে শব্দ উৎপন্ন হলে, ক্রমে সেই শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পরে অনেক শব্দ উৎপন্ন করে। এভাবে কদম্বমুকুলের মত ঐ উৎপন্ন শব্দের অন্তিম শব্দ আমাদের কর্ণগহ্বরে পৌছায়। তাই গ্রন্থকার বলেছেন - "ভেরীদেশে জাতঃ শব্দো বীচীতরঙ্গন্যাযেন কদম্বমুকুলন্যাযেন বা সন্নিহিতং শব্দান্তরমারভ্যতে স চ শব্দঃ শব্দান্তরমিতি ক্রমেণ শ্রোত্রদেশে জাতোঽন্ত্যঃ শব্দঃ শব্দান্তরারম্ভক্রমেণ শ্রোত্রদেশেঽন্ত্যং শব্দং জনযতি। সোঽন্ত্যঃ শব্দঃ শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে নাদ্যো ন মধ্যমঃ। 'ভেরীশব্দো মযা শ্রুতঃ' ইতি মতিস্তু ভ্রান্তৈব।"[৭৯] অর্থাৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমাদের 'ভেরী-শব্দ শুনতে পেলাম' এরূপ প্রতীতি হলেও বস্তুত সেই স্থলে আমরা বীচীতরঙ্গন্যায় বা কদম্বমুকুলন্যায় অনুসারে অন্তিম শব্দই শুনতে পাই।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, মীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকার করেছেন। তাই গ্রন্থকার শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করতে বলেছেন - "বিনাশিত্বং চ শব্দস্যানুমানাত্। তথা হি অনিত্যঃ শব্দঃ, সামান্যবত্ত্বে

সত্যস্মদাদিবাহ্যেন্দ্রিযগ্রাহ্যত্বাদ্ ঘটবদিদি।"[৮০] অর্থাৎ শব্দের বিনাশিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সেই অনুমান বাক্যের আকার বলা হয়েছে, শব্দ নিত্য, যেহেতু তা সামান্যের আশ্রয় হয়ে, আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। যেমন - ঘট, ঘটত্ব-সামান্যের আশ্রয় হয়ে, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয়। শব্দও সেরূপ শব্দত্ব সামান্যের আশ্রয় হয়ে গৃহীত হয়।

● **বুদ্ধি :** 'বুদ্ধি' নামক গুণের নিরূপণপ্রসঙ্গে *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "অর্থপ্রকাশ বুদ্ধিঃ। নিত্যা অনিত্যা চ। ঐশী বুদ্ধির্নিত্যা, অন্যদিযা ত্বনিত্যা।"[৮১] অর্থাৎ অর্থের প্রকাশ বা জ্ঞান হল বুদ্ধি। এই বুদ্ধি নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। তার মধ্যে ঈশ্বরীয় বুদ্ধি নিত্য এবং তদ্ভিন্ন বুদ্ধি অনিত্য।

● **সুখ :** 'সুখ' নামক গুণের নিরূপণ প্রসঙ্গে *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "প্রীতিঃ সুখম্। তচ্চ সর্বানুকূলবেদনীযম্।"[৮২] অর্থাৎ সুখ হল আন্দদায়ক বস্তু এবং এটি সকলের কাছে অনুকূল বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়।

● **দুঃখ :** 'দুঃখ' নামক গুণের নিরূপণ প্রসঙ্গে *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "পীড়া দুঃখম্। তচ্চ সর্বাত্মনাং প্রতিকূলবেদনীয়ম্।"[৮৩] অর্থাৎ দুঃখ হল পীড়া বা সন্তাপযুক্ত বিষয়। এটি সকলের কাছে প্রতিকূল বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। অত এব এটি সুখের বিপরীত।

● **ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন :** ইচ্ছা হল কামনা-বাসনাদি অনুরাগযুক্ত বিষয়। তবে ইচ্ছামাত্রই কামনা-বাসনা নয়, কারণ ঈশ্বররূপ পরমাত্মাতেও এই ইচ্ছা গুণটি বিদ্যমান। তাই ইচ্ছা নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার হয়। শরীর এবং ইন্দ্রিয়-বিকৃত-কারণজন্য প্রাণীকুলের যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তাই দ্বেষ। এই দ্বেষ ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার হয়। এরূপ চেষ্টা বা ক্রিয়া হল প্রযত্নের বিষয়। কৃতি, উৎসাহ, উদ্যোগ প্রভৃতি হল এই প্রযত্নের নামান্তর। এটি সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতে উৎপন্ন হয়। এই গুণটিও নিত্যানিত্য ভেদে দুই প্রকার হয়। জীবাত্মাতে অনিত্য প্রযত্ন থাকে আর পরমাত্মাতে নিত্য-প্রযত্ন থাকে। পূর্বোক্ত বুদ্ধাদি ছয়টি গুণ মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়।

● **ধর্ম ও অধর্ম :** এই 'ধর্ম' ও 'অধর্ম' নামক গুণ দুটি হল সুখ বা দুঃখের অসাধারণকারণ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, শাস্ত্রবিহিত শুভ এবং অশুভ কর্ম হল, ধর্ম ও অধর্মের দ্যোতক। শুভকর্মজন্য আত্মায় সুখের উৎপত্তি হয়। আবার অশুভকর্মজন্য দুঃখের উৎপত্তি হয়। এই ধর্ম বা অধর্ম অতীন্দ্রিয় হওয়ায়, গ্রন্থকার অনুমান প্রমাণ দ্বারা এগুলির সিদ্ধ করতে বলেছেন -

'দেবদত্তস্য শরীরাদিকং দেবদত্তবিশেষগুণজন্যং, কার্যত্বে সতি দেবদত্তস্য ভোগহেতুত্বাত্, দেবদত্তপ্রযত্নজন্যবস্তুবত্।'[৮৪] এই অনুমান বাক্যে 'দেবদত্তের শরীরাদি' হল - পক্ষ, 'দেবদত্তবিশেষগুণজন্যত্ব' হল - সাধ্য এবং 'কার্যত্বে সতি দেবদত্তস্য ভোগসাধন' হল - হেতু। অর্থাৎ দেবদত্তের শরীরাদি, দেবদত্তের বিশেষগুণ হতে উৎপন্ন হয়, যেহেতু উক্ত শরীরাদি কার্যস্বরূপ হয়ে, দেবদত্তের ভোগের বিষয় হয়। যেমন - দেবদত্তের প্রযত্ন হতে উৎপন্ন গৃহাদি দেবদত্তের ভোগের বিষয় হয়। সেরূপ বুদ্ধি ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণগুলি হল দেবদত্তের আত্মার বিশেষগুণ। কিন্তু এই গুণগুলির কোনটিতে দেবদত্তের শরীরাদির কারণতা থাকতে পারে না। কেননা, এগুলি শরীর সৃষ্টির পূর্বে অবিদ্যমান। তাই শেষে ধর্মাধর্মরূপ বিশেষগুণই শরীরাদির কারণরূপে সিদ্ধ হয়।

● **সংস্কার :** *তর্কভাষা*কার সংস্কার নামক গুণের নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'সংস্কার-ব্যবহারাঽসাধারণং কারণং সংস্কারঃ।'[৮৫] এই সংস্কার তিন প্রকার হয়। যথা - বেগ, ভাবনা এবং স্থিতিস্থাপক। তারমধ্যে বেগাখ্য সংস্কার পৃথিব্যাদি চারটি এবং মনে থাকে। এটি ক্রিয়ার হেতু বা কারণ। এরূপ ভাবনাখ্য সংস্কার কেবল আত্মাতে থাকে। এটি উদ্বুদ্ধ হয়ে, স্মৃতির জনক হয়। আবার স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কার স্পর্শযুক্ত দ্রব্যে থাকে। যেমন - ধনুকের ছিলা। বুদ্ধি হতে অধর্ম ভাবনা নামক সংস্কার পর্যন্ত গুণগুলি আত্মার বিশেষগুণ। এভাবে গ্রন্থকার রূপাদি চব্বিশ প্রকার গুণের বর্ণনা করেছেন।

* **কর্ম :** কর্ম হল চলনাত্মক ক্রিয়া। গুণের মত এটিও কেবলমাত্র দ্রব্যবৃত্তি হয়। তবে নব দ্রব্যের মধ্যে এটি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন - এই পাঁচটি মূর্ত দ্রব্যে থাকে। কারণ, এই পাঁচটি দ্রব্য ক্রিয়াবান্। এই কর্ম পূর্বদেশের সংযোগনাশপূর্বক উত্তরদেশসংযোগের হেতু হয়। *তর্কভাষা*কার কর্ম পদার্থের স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "চলনাত্মক কর্ম। গুণ এব দ্রব্যমাত্রবৃত্তিঃ। অবিভুদ্রব্যপরিমাণেন মূর্তত্বাপরনাম্না সহৈকার্থসমবেতং বিভাগদ্বারা পূর্বসংযোগনাশে সত্যুত্তরদেশসংযোগহেতুশ্চ।"[৮৬]

*তর্কভাষা*কারও কর্মের ভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন - "তচ্চ উৎক্ষেপণ-অপক্ষেপণ-আকুঞ্চন-প্রসারণ-গমনভেদাত্ পঞ্চবিধম্। ভ্রমণাদযস্তু গমনগ্রহণেনৈব গৃহ্যন্তে।"[৮৭] অর্থাৎ উৎক্ষেপণাদি ভেদে এই কর্ম পাঁচ প্রকার হয়। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্ধ্বজ্বলন ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি উক্ত 'গমন' নামক পঞ্চম কর্মের অন্তর্গত।

* **সামান্য :** 'সমানানাং ভাবঃ' - এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'সমান' শব্দের উত্তর ষ্যঞ্-প্রত্যয় যোগ করে 'সামান্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল, সাধারণধর্ম। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্যগণ 'সামান্য' শব্দটি, 'জাতি' - এরূপ পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। *তর্কভাষা*কার সামান্যের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'অনুবৃত্তিপ্রত্যয়হেতুঃ সামান্যম্।'[৮৮] এরূপ আচার্যপ্রশস্তপাদও পর এবং অপর ভেদে দুই প্রকার সামান্যের কথা বলে, তাকে অনুবৃত্তি প্রত্যয়ের কারণ বলেছেন - 'সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরং চানুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণম্।'[৮৯] এই সামান্য সমবায়সম্বন্ধে অনেক অধিকরণবৃত্তি হয়। সেই বিষয়টি বোঝানোর জন্য লক্ষণে 'অনুবৃত্তি' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন - সকল গরুতে বর্তমান 'গোত্ব' সামান্য ইত্যাদি। প্রলয়কালে সকল 'গোব্যক্তি' নষ্ট হয়ে গেলেও জাতি নষ্ট হয় না। ফলে পুনঃসৃষ্টিতে তা আবার গরুতে সম্বন্ধিত হয়। তাই সামান্য বা জাতি নিত্য। সেজন্য নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ সামান্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন - 'নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বং সামান্যম্।'[৯০] এখানে 'প্রলয়' বলতে, খণ্ডপ্রলয় বুঝতে হবে। কারণ, ন্যায় মতে, বস্তুর খণ্ডপ্রলয় স্বীকার করা হয়। তাঁদের মতে, মহাপ্রলয়ের পর আর পুনরাগমন হয় না।

এই সামান্য দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি পদার্থে থাকে। এর বিভাগ বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্যদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন - *তর্কভাষা*কার পর এবং অপররূপে সামান্যের দুই প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। এরূপ আচার্য প্রশস্তপাদও সামান্যের এই দুই প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন। কিন্তু শিবাদিত্যের *সপ্তপদার্থী*, জগদীশতর্কালঙ্কারের *তর্কামৃত* প্রভৃতি গ্রন্থে 'পরাপর' নামে সামান্যের আরও একটি ভেদের কথা বলা হয়েছে।[৯১] এরূপ বিশ্বনাথও প্রথমে সামান্যকে দ্বিবিধ বলে, শেষে সামান্যের তিন প্রকার ভেদের কথা বলেছেন-

"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।
দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতযোচ্যতে॥
পরাভিন্না চ যা জাতি সৈবাপরতযোচ্যতে।
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাপরতযোচ্যতে॥"[৯২]

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় সামান্য বা জাতি স্বীকার করেন না। *তর্কভাষা*কার উক্ত বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'অত্র কশ্চিদাহ ব্যক্তিব্যতিরিক্তং সামান্যং নাস্তি ইতি। তত্র বযং ব্রুমঃ কিমালম্বনা তর্হি ভিন্নেষু বিলক্ষণেষু পিণ্ডেষ্বেকাকারা বুদ্ধির্বিনা

সর্বানুগতমেকম্। যচ্চ তদালম্বনং তদেব সামান্যমিতি।"[৯৩] আবার বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সামান্যের পরিবর্তে 'অপোহ' বা 'অতদ্-ব্যাবৃত্তি' স্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, সকল গোব্যক্তি গুলিতে গোভিন্ন ব্যক্তির ভেদরূপ অতদ্-ব্যাবৃত্তির দ্বারা উক্ত অনুগত প্রতীতি হয়। যেমন - গরুতে 'গোত্ব' আছে কিন্তু 'অশ্বত্ব' নেই। সুতরাং এভাবে অতদ্-ব্যাবৃত্তির দ্বারা উক্ত একাকার প্রতীতির নিয়ামকরূপে ভাবরূপ 'গোত্ব' জাতি স্বীকার অযৌক্তিক। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যের বক্তব্য হল, অনুগতাকার প্রতীতি যদি অভাবরূপ অতদ্-ব্যাবৃত্তিকে বিষয় করে, তাহলে সেটি নিষেধমুখে সম্পন্ন হবে। কিন্তু বিধিমুখে উক্ত অনুগতাকার প্রতীতি সর্বানুভবসিদ্ধ। অত এব জগতের সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অনুগত প্রতীতির নিয়ামকরূপে অবশ্যই সামান্য স্বীকার করতে হবে। প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, পূর্বোক্ত গরুতে গোত্ব, অশ্বে অশ্বত্ব ইত্যাদি সামান্য বা জাতি যেহেতু গরু বা অশ্বের মধ্যে ভেদক হয়। এরূপ ভেদবুদ্ধির জনক হলে 'সামান্য' নামক পদার্থটি বিশেষ আখ্যা লাভ করে।

*** বিশেষ :** বৈশেষিকসূত্রে নিত্যদ্রব্য সমূহের পরস্পর ব্যাবৃত্তি বা ভেদ-জ্ঞানের জন্য 'বিশেষ' নামক পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। আর এই 'বিশেষ' পদার্থ স্বীকার করায়, মহর্ষি কণাদ প্রণীত সূত্র গ্রন্থটি বৈশেষিকসূত্র নামে অভিহিত হয়। *তর্কভাষা*কার উক্ত বিশেষ পদার্থের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - "বিশেষো নিত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ। ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিমাত্রহেতুঃ।"[৯৪] অর্থাৎ বিশেষ পদার্থটি নিত্য। আর সেজন্য এটি আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন এবং পৃথিব্যাদি চারটির পরমাণুরূপ নিত্য দ্রব্যবৃত্তি হয়। এই বিশেষ ভেদজ্ঞানমাত্রের হেতু। সাধারণত বিবিধ বস্তুর মধ্যে ভেদ জ্ঞাপন হয়, সেই বস্তুসমূহের ভেদক ধর্মের দ্বারা। গুণ, ক্রিয়া, জাতি, সংখ্যা, পরিমাণ, বিন্যাস ইত্যাদির দ্বারা। কিন্তু আকাশ ব্যতিরিক্ত নিত্যদ্রব্যে ভেদকধর্ম না থাকায়, পরস্পরের ভেদকরূপে বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হয়। কারণ, বিশেষ হল অন্তিম ভেদক। আর এই বিশেষের দ্বারাই ঘট বা পটে স্থিত নিত্যপরমাণুর ভিন্নতা সিদ্ধ হয়। ঘট বা পটনিষ্ঠ নিত্য পরমাণুর মধ্যে বিশেষ স্বীকারের দ্বারা ঘটদ্বয় বা পটদ্বয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়। নিত্য দ্রব্যে স্থিত বিশেষগুলি অত্যন্তভেদের কারণ হওয়ায়, সেগুলিকে বিশেষ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রশস্তপাদ বলেছেন - "নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োঽন্ত্যা বিশেষাঃ। তে খল্বত্যন্তব্যাবৃত্তিহেতুত্বাদ্বিশেষা এব।"[৯৫] সুতরাং বিশেষ হল অন্তিম ভেদক।

পরমাণু নিত্য এবং অনন্ত হওয়ায়, পরমাণুরূপ নিত্যদ্রব্যে স্থিত বিশেষ পদার্থও নিত্য এবং অনন্ত হয়। আবার এই বিশেষ স্বতঃব্যাবৃত্ত পদার্থ। এটি নিজেই নিজের ব্যাবর্তক। তাই আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন - "ঘটাদীনাং দ্ব্যণুকপর্যন্তানাং তত্তদবযবভেদাৎ পরস্পরং ভেদঃ, পরমাণুনাং পরস্পরং ভেদকো বিশেষ এব। স তু স্বত এব ব্যাবৃত্তঃ। তেন তত্র বিশেষান্তরাপেক্ষা নাস্তীত্যর্থঃ।"[৯৬]

* **সমবায় :** *তর্কভাষা*কার 'সমবায়' নামক ষষ্ঠ পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন - 'অযুতসিদ্ধযোঃ সম্বন্ধঃ সমবাযঃ, স চোক্ত এব।'[৯৭] অর্থাৎ অযুতসিদ্ধসম্বন্ধকে সমবায় বলা হয় এবং সেটি বলা হয়ে গেছে। গ্রন্থকারের এরূপ কথনের তাৎপর্য হল, তিনি প্রমাণ অংশে তন্তু, পট ইত্যাদির সম্বন্ধ নিরূপণাবসরে সমবায়সম্বন্ধ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'স চ...' ইত্যাদি গ্রন্থাংশের দ্বারা গ্রন্থকার সেই বিষয়টিই বোঝাতে চেয়েছেন।

সেখানে বলা হয়েছে, যে দুটি পদার্থ বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত একটি অপরটিকে আশ্রয় করে অবস্থান করে, তাদের অযুতসিদ্ধ বলে। যেমন, শরীর বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত হস্তাদি অবয়বগুলি শরীরকে আশ্রয় করে থাকে। অত এব হস্তাদি অবয়ব এবং শরীরের সম্বন্ধ হল সমবায়। এরূপ ঘট বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সেই ঘটে নীলাদি গুণ থাকে। অত এব নীলরূপ গুণ এবং ঘটরূপ গুণীর মধ্যে সম্বন্ধ হল, সমবায়। *তর্কভাষাতে* বলা হয়েছে - "যযোর্মধ্যে একমবিনশ্যদ্ অপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে তাবযুতসিদ্ধৌ। তদুক্তম্ - তাবেবাযুতসিদ্ধৌ দ্বৌ বিজ্ঞাতব্যৌ যযোর্দ্বযোঃ। অনশ্যদেকমপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে॥ যথা অবযবাবযবিনৌ, গুণগুণিণৌ, ক্রিযাক্রিযাবন্তৌ, জাতিব্যক্তী, বিশেষনিত্যদ্রব্যে চেতি।"[৯৮] অর্থাৎ অবয়ব ও অবয়বী, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্, জাতি ও ব্যাক্তি এবং বিশেষ ও নিত্যদ্রব্যের মধ্যে সমবায় নামক সম্বন্ধটি বিদ্যমান। এই সমবায় নিত্য পদার্থ। সেজন্য আচার্য বিশ্বনাথ সমবায়ের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'সমবাযত্বং নিত্যসম্বন্ধত্বম্।'[৯৯] এরূপ শিবাদিত্য, অন্নংভট্ট প্রভৃতি আচার্যগণও সমবায়ের পূর্বরূপ লক্ষণ করেছেন।

* **অভাব :** মহর্ষি কণাদ দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের সাধর্ম ও বৈধর্মরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভের কথা বলেছেন। অর্থাৎ সেখানে অভাব পদার্থ কথিত হয়নি। সেই অনুসারে অনেকে বৈশেষিক দার্শনিকদের ষট্-পদার্থবাদী নামে অভিহিত করেছেন। এরূপ আচার্য প্রশস্তপাদও তাঁর গ্রন্থে দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থেরই প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু শিবাদিত্যের *সপ্তপদার্থী*,

কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা,* বিশ্বনাথের *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* অন্নংভট্টের *তর্কসংগ্রহ* প্রভৃতি ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রে দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থই প্রতিপাদিত হয়েছে। সর্বোপরি বৈশেষিকসূত্রের নবম অধ্যায়েও অভাব পদার্থের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ সূত্রকার প্রথমে প্রতিযোগিরূপে ভাবপদার্থের কথা বলে, পরে নবম অধ্যায়ে অভাব পদার্থের কথা বলেছেন। কেননা, অভাব পদার্থের নিরূপণ প্রতিযোগিভূত পদার্থের নিরূপণাধীন।[১০০] আর তাই প্রতিযোগিভূত পদার্থের নিরূপণের পরে নিরূপিত হয়েছে।

এই অভাব মূলত দুই প্রকার - সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। উক্ত সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার - প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব।

(ক). **প্রাগভাবঃ**– 'প্রাক্' শব্দের অর্থ হল পূর্ব। অর্থাৎ কার্য উৎপত্তির পূর্বে, কারণে কার্যের যে অভাব লক্ষিত হয়, তাই প্রাগভাব। যেমন - তন্তুতে পটের অভাব। তন্তুবায় গৃহে তন্তু সজ্জিত দেখলে, আমাদের এরূপ প্রতীতি হয় যে, এখানে পট উৎপন্ন হবে। অত এব সেখানে পট নেই, কিন্তু পটের অভাব আছে। আর সেই অভাব হল পটের প্রাগভাব। কারণ, পট উৎপত্তির পূর্বে সেখানে তার অভাব উৎপন্ন হচ্ছে। এই প্রাগভাব উৎপত্তির পূর্বে থাকে না। কিন্তু উৎপত্তির পর বিনাশ হয়। তাই প্রাগভাব অনাদি এবং সান্ত।

(খ). **প্রধ্বংসাভাবঃ**– ঘট-কার্য উৎপন্ন হওয়ার পর, মুদগর্ প্রভৃতির দ্বারা প্রহারের ফলে, ঘটের কারণ কপালাদিতে ঘটের যে অভাব লক্ষিত হয়, তার নাম প্রধ্বংসাভাব। ঘট ধ্বংসের কারণে প্রধ্বংসাভাব উৎপন্ন হওয়ায়, এর উৎপত্তি আছে, কিন্তু বিনাশ নেই। কারণ, ধ্বংসের আর ধ্বংস হয় না। অত এব প্রধ্বংসাভাব সাদি-অনন্ত-বিশিষ্ট।

(গ). **অত্যন্তাভাব :**– যে অভাব ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান - এই তিনটি কালে বিদ্যমান, সেই অভাবকে অত্যন্তাভাব বলা হয়। যেমন - বায়ুতে রূপের অভাব। কেননা, বায়ুতে 'রূপ' নামক গুণের অবস্থান কোন কালেই সম্ভব নয়। এই অত্যন্তাভাব নিত্য। 'নাস্তি' শব্দের দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয়। যেমন - ভূতলে ঘটো নাস্তি। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ কোন পদার্থ যে স্থলে বিদ্যমান হয় না, সেই স্থলে সেই পদার্থের যে অভাব প্রতীত হয়, তা হল সেই পদার্থের অত্যন্তাভাব। ভূতলে ঘটের অভাব সেই প্রকারে হয়। তবে যে বস্তু সর্বথা অপ্রসিদ্ধ তার অভাবও অপ্রসিদ্ধ হয়। যেমন - 'বন্ধ্যাপুত্রঃ নাস্তি' - এই বাক্যে কথিত 'বন্ধ্যাপুত্র' নামক

বস্তুটি জগতে প্রসিদ্ধ নয়, অত এব তার অত্যন্তাভাব প্রসিদ্ধ নয়। কারণ, বন্ধ্যার কখনও সন্তান হতে পারে না।

(ঘ). **অন্যোন্যাভাব :–** যার অভাব কল্পনা করা হয়, তাকে প্রতিযোগী বলা হয়। আর যে পদার্থ সেই প্রতিযোগিভূত পদার্থের তাদাত্মের বিরোধী, সেই পদার্থকে প্রতিযোগিভূত পদার্থের অন্যোন্যাভাব বলা হয়। যেমন - ঘটো পটঃ ন। অর্থাৎ ঘট কখনো পট হতে পারে না। কারণ, উভয়ের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। অত এব, ঘটে বা পটে তাদাত্মসম্বন্ধে ঘট বা পট ভিন্ন কিছু থাকতে পারে না। এখানে 'ঘটঃ পটো ন' এর অর্থ হল- 'ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটঃ' বা 'ঘটভেদবান্ পটঃ' অথবা 'ঘটভিন্নো পটঃ'।

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, *তর্কভাষা*কার দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থ নিরূপণের পর সেগুলির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে, বিজ্ঞানবাদী ও ব্রহ্মবাদীদের খণ্ডন করেছেন। যেহেতু বৌদ্ধগণ চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা - সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক। সেখানে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক হল, বাহ্যার্থবাদী। এঁরা বাহ্যবিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। আবার যোগাচার এবং মাধ্যমিক সম্প্রদায় বাহ্যবিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্যমিক সম্প্রদায় সর্বশূন্যত্ববাদী এবং যোগাচার সম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদী। এই বিজ্ঞানবাদীদের মতে, একমাত্র জ্ঞানই প্রমাণ সিদ্ধ বিষয়। এই জ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বাহ্যবিষয় তাঁরা স্বীকার করেন না। এরূপ শাঙ্করদর্শনেও ব্রহ্ম-ব্যতীত সকল বস্তুই মিথ্যারূপে কল্পিত হয়েছে। তাই *তর্কভাষা*কার উক্ত বিজ্ঞানবাদী ও ব্রহ্মবাদীদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে পূর্বপক্ষ উপস্থাপনপূর্বক বলেছেন - "ননু জ্ঞানাদ্ ব্রহ্মণো বা অর্থা ব্যতিরিক্তা ন সন্তি। মৈবম্। অর্থানামপি প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধত্বেনাশক্যাপলাপত্বাত্।"[১০১] অর্থাৎ দ্রব্যাদি বিষয়ের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায়, সেই সকল পদার্থের অপলাপ বা নিষেধ করা যায় না।

৩.৩. প্রমেয়পদার্থ বিষয়ে কেশবমিশ্রের স্বাভিমতের সামান্য পর্যালোচনা :

মহর্ষি গৌতমোক্ত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে 'আত্মা' ও 'অর্থ' ব্যতীত, অন্যান্য প্রমেয় পদার্থগুলিকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শরীরাদি পদার্থগুলি ক্রমে ব্যাখ্যাত হল -

● **শরীর :** *তর্কভাষা*কার শরীর নামক প্রমেয়পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'তস্য ভোগাযতনমন্ত্যাবযবি শরীরম্।'[১০২] লক্ষণস্থিত 'তস্য' পদটি পূর্ববর্ণিত আত্মার বিশেষণ। অর্থাৎ

যে পদার্থটি আত্মার ভোগের আশ্রয় এবং অন্ত্যাবয়বী তাই শরীর। প্রসঙ্গত বক্তব্য হল প্রাচীন আচার্যগণ আত্মার ভোগের আশ্রয়কে শরীর বলেছেন। এখন প্রশ্ন হল, গ্রন্থকার শরীর লক্ষণে 'অন্ত্যাবযবী' পদটি যোগ করলেন কেন? এরূপ জিজ্ঞাসার নিরিখে বলতে হবে, শাস্ত্রে সুখদুঃখাদির অনুভবকে ভোগ বলা হয়। আর শরীরের প্রতিটি অবয়ব দ্বারা সেই ভোগ সম্পন্ন হয়। কাজেই 'ভোগায়তনং শরীরম্' এরূপ শরীর-লক্ষণ করলে, সেই লক্ষণটি হস্ত, চরণ প্রভৃতি শরীরাবয়বে অতিব্যাপ্ত হবে। সেই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য *তর্কভাষা*কার লক্ষণে 'অন্ত্যাবয়বী' পদটি যোগ করেছেন। কারণ, হস্ত প্রভৃতি অবয়বগুলি অঙ্গুলী প্রভৃতির অবয়বী হলেও অন্ত্য-অবয়বী নয়।

তবে শরীর পূর্বোক্ত লক্ষণটিও নির্দুষ্ট নয়। কারণ, এই লক্ষণটি পরমাণু-শরীরে অব্যাপ্ত হয়। শাস্ত্রে পরমাত্মারূপ ঈশ্বরের শরীরকে পরমাণুশরীররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক পরমাণুসমূহকে ঈশ্বরের শরীররূপে ব্যাখ্যা করেছেন - "...তথা হি সাক্ষাদধিষ্ঠাতরি সাধ্যে পরমাণ্বাদীনাং শরীরত্বপ্রসঙ্গ ইতি কিমিদং শরীরত্বং যত্ প্রসজ্যতে? যদি সাক্ষাৎপ্রযত্নবদধিষ্ঠেযত্বং তদিষ্যত এব। ন চ ততোঽন্যত্ প্রসঞ্জকমপি...ইত্যাদি।"[১০৩] এরূপ শ্রুত্যাদিতেও পরমাণু-শরীরকে ঈশ্বরশরীর বলা হয়েছে। অত এব 'ভোগাধিষ্ঠানমন্ত্যাবযবী' এই লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। কেননা, ঈশ্বর কোন কর্মের অধীন না হওয়ায়, তাতে কোন প্রকার ভোগের উপপত্তি হয় না। আবার পরমাণু-শরীরে কোন অবয়ব থাকে না। সেজন্য গ্রন্থকার উক্ত দোষ পরিহার করার জন্য শরীরের বৈকল্পিক লক্ষণ প্রদান করেছেন - 'চেষ্টাশ্রয বা শরীরম্।'[১০৪] অর্থাৎ চেষ্টার আশ্রয় হল শরীর। আর সেই চেষ্টা হল হিত বস্তুর প্রাপ্তি এবং অহিত বস্তুর পরিহাররূপ ক্রিয়া।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মহর্ষি গৌতম চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয়কে শরীর বলেছেন। সেখানে অন্যান্য প্রাচীন আচার্যগণও সেই অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু *তর্কভাষা*কার প্রথমে জীবাত্মার ভোগের অধিষ্ঠানরূপ অন্ত্যাবয়বীকে এবং শেষে চেষ্টাশ্রয়ত্বকে শরীর বলেছেন। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, গ্রন্থকার শরীরের যে দুটি লক্ষণ প্রদান করেছেন, সেই দুটি লক্ষণই সূত্রকারোক্ত শরীর-লক্ষণান্বিত। কারণ, লক্ষণস্থিত 'অর্থ' শব্দটির দ্বারা সুখদুঃখাদি ভোগ্য বিষয়রূপে গৃহীত হয়। আর সেই সুখ বা দুঃখ প্রভৃতি চেষ্টারূপ শুভাশুভ প্রযত্নদ্বারা উৎপন্ন হয়। আবার সুখাদি বিষয়ের সাধন হল হল ইন্দ্রিয়।

সুতরাং *তর্কভাষা*কার সুখাদি ভোগের অধিষ্ঠান, অন্ত্যাবয়বী এবং চেষ্টার আশ্রয়কে যে শরীর বলেছেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি অর্থাশ্রয়ত্ব ও ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব উভয়ের প্রকাশ করেছেন।

● **ইন্দ্রিয় :** *তর্কভাষা*কার ইন্দ্রিয়ের সামান্যলক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'শরীরসংযুক্তং জ্ঞানকরণমতীন্দ্রিম্ ইন্দ্রিযম্।'[১০৫] অর্থাৎ যা শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত, জ্ঞানের করণ এবং অতীন্দ্রিয়, তাই ইন্দ্রিয়। কেবলমাত্র 'অতীন্দ্রিযমিন্দ্রিযম্' বললে, কালাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থে লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হয়। সেজন্য 'জ্ঞানকরণম্' পদটি যুক্ত করা হয়েছে। আবার যদি 'জ্ঞানকরণমতীন্দ্রিযমিন্দ্রিযম্' - এরূপ ইন্দ্রিয় বলা হয়, তাহলে লক্ষণটি ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্ত হয়। কারণ, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ নির্বিকল্পক-জ্ঞানরূপ ব্যাপারের দ্বারা সবিকল্পক জ্ঞানের করণ হয়। আবার ইন্দ্রিয়গুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থ হওয়ায়, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষও অতীন্দ্রিয় হয়। তাই 'শরীরসংযুক্তম্' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু 'শরীরসংযুক্তং জ্ঞানকরণমিন্দ্রিযম্' এরূপ ইন্দ্রিয় লক্ষণ করলে, সেই লক্ষণটি আলোকাদিতে অতিব্যাপ্ত হবে। কারণ, আত্মমনঃসংযোগের মত আলোকও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের করণ হয়। আবার ঐ আলোক শরীরের দ্বারা সংযুক্তও হয়। সেজন্য লক্ষণে 'অতীন্দ্রিযম্' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। এভাবে গ্রন্থকার নিজেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ ঘটক প্রতিটি পদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

*তর্কভাষা*কার ইন্দ্রিয় নামক প্রমেয়পদার্থের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ঘ্রাণাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন - "তানি চেন্দ্রিযানি ষট্। ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্-শ্রোত্রমনাংসি।"[১০৬] অর্থাৎ ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র এবং মন - এই ছয়টি ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গুলির বিশেষলক্ষণ প্রতিপাদনে গ্রন্থকার বলেছেন যে, রূপাদি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণের মধ্যে যে ইন্দ্রিয় যে বিশেষ গুণের গ্রাহক হয়, সেই ইন্দ্রিয় সেই গুণগ্রাহক নামেই অভিহিত হয়। যেমন - গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ, রস গ্রাহক ইন্দ্রিয় রসনা, রূপগ্রাহক ইন্দ্রিয় চক্ষু ইত্যাদি । তাই বলা হয়েছে - "যদিন্দ্রিয়ং রূপাদিষু পঞ্চসু মধ্যে যং গুণং গৃহ্লাতি তদিন্দ্রিয়ং তদ্-গুণসংযুক্তং যথা চক্ষুঃ রূপগ্রাহকং রূপবত্।"[১০৭]

উক্ত ষট্ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু, ত্বক্ এবং মন - এই তিনটি ইন্দ্রিয় দ্রব্যস্থিত গুণ প্রভৃতির সঙ্গে দ্রব্যেরও প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু ঘ্রাণ, রসনা এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা গুণ, গুণগত জাতি ও তার অভাবের প্রত্যক্ষ হলেও এই তিনটির দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। আবার এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়দেশে গমন করে। যেমন - দূর হতে

কুঠারের উত্থান-পতন দ্বারা কোন বস্তুর ছেদন ক্রিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু তা হতে উৎপন্ন শব্দ যতক্ষন পর্যন্ত আমাদের কর্ণশষ্কুলিতে পৌছায়, ততক্ষন পর্যন্ত সেই শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না। এরূপ কোন পচনশীল দ্রব্যের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে সেই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু তার সংস্পর্শে না পৌছলেও বাতাসে আমারা তার গন্ধ উপলব্ধি করতে পারি। অত এব চক্ষুরিন্দ্রিয় ব্যাতীত অন্য সকল ইন্দ্রিয় বিষয়দেশে গমন করে না।

উক্ত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে ঘ্রাণ নামক ইন্দ্রিয়টি নাসিকার অগ্রভাগে অবস্থান করে। এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব, যেহেতু তাতে গন্ধবত্ব আছে। এরূপ রসনা নামক ইন্দ্রিয়টি জিহ্বার অগ্রভাগে থাকে। রসবত্ত্বের জন্য এটি জলীয়। আবার চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়টি অক্ষিগোলকের মধ্যস্থিত কৃষ্ণতারার অগ্রভাগে থাকে এবং প্রদীপের মত তেজসম্পন্ন হওয়ায়, এটি তৈজস। এরূপ ত্বক্ নামক ইন্দ্রয়টি সর্বশরীরবৃত্তি। বায়ু প্রবাহিত হলে, এটি অনুমিত হওয়ায়, ত্বগিন্দ্রিয় বায়বীয়। শব্দ উপলব্ধির সাধন ইন্দ্রিয় শ্রোত্র। এই শ্রোত্র হল, কর্ণশষ্কুল্যাবচ্ছিন্ন আকাশ। শব্দগুণের জন্য অন্য কোন দ্রব্য অপেক্ষিত হয় না, যেহেতু শব্দ আকাশের বিশেষগুণ। কোন প্রদেশে শব্দ উৎপন্ন হলে, তা আকাশেই উৎপন্ন হয়। আবার সুখাদি অন্তর্বিষয়ের উপলব্ধির সাধন হল মন। এই মন অণুপরিমাণ। মন হৃদয়দেশে অবস্থান করে।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, *তর্কভাষা*কার ঘ্রাণাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়ের বর্ণনা করার পর, সেই ইন্দ্রিয়গুলির প্রামাণ্য নিরূপণাবসরে পূর্বপক্ষ উল্লেখপূর্বক বলেছেন - "ননু চক্ষুরাদীন্দ্রিযসদ্ভাবে কিং প্রমাণম্? উচ্যতে। অনুমানমেব। তথাহি রূপাদ্যুপলব্ধযঃ করণসাধ্যাঃ ক্রিযাত্বাত্, ছিদিক্রিযাবত্।"[১০৮] অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। আর সেই অনুমান-বাক্যের প্রয়োগ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, রূপাদি উপলব্ধি করণসাধ্য, যেহেতু তাতে ক্রিয়াত্ব আছে। যেমন - ছেদন ক্রিয়া কুঠাররূপ করণসাধ্য। সুতরাং অনুমান প্রমাণের দ্বারা রূপ প্রভৃতি গুণের উপলব্ধির করণরূপে ইন্দ্রিয় সিদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মহর্ষি গৌতম ইন্দ্রিয় নামক প্রমেয় পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হতে উৎপন্ন ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু, ত্বক্ এবং শ্রোত্র - এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন। বাৎস্যায়ন সেখানে 'জিঘ্রতি অনেন ইতি ঘ্রাণম্', 'রসয়ত্যনেনেতি রসনম্' ইত্যাদি প্রকার ব্যুৎপত্তির দ্বারা উক্ত ইন্দ্রিয়গুলিরর বিশেষলক্ষণ প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু 'মন' নামক ইন্দ্রিয়টি সেখানে পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বাৎস্যায়ণ সেখানে স্বরূপগত ভেদ অনুসারে মনের পৃথক্ উল্লেখের কথা বলেছেন। আবার উদ্দ্যোতকর অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু *তর্কভাষা*কার বাহ্য এবং অন্তরিন্দ্রিয় উভয়েরই একই সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন।

● **বুদ্ধি :** *তর্কভাষা*কার এই 'বুদ্ধি' নামক প্রমেয় পদার্থটির স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - "বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানং প্রত্যয ইত্যাদিভিঃ পর্যাযশব্দৈর্যাঽভিধীযতে সা বুদ্ধিঃ। অর্থপ্রকাশো বা বুদ্ধিঃ।"[১০৯] অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, প্রত্যয় ইত্যাদি পর্যায় শব্দের দ্বারা যা লক্ষিত হয়, তাই বুদ্ধি। আবার এই বুদ্ধি যেহেতু উপলব্ধি, জ্ঞান, বোধ, প্রত্যয়, প্রতীতি, সংবিৎ ইত্যাদি পর্যায় শব্দের অর্থ প্রকাশ করে, তাই এটি অর্থের প্রকাশক। সেজন্য গ্রন্থকার বৈকল্পিকভাবে অর্থের প্রকাশকে বুদ্ধি বলেছেন। এই বুদ্ধি মূলতঃ দুই প্রকার - অনুভব এবং স্মরণ। এই দুটি আবার যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দুই প্রকার। এগুলির আবার অবান্তরভেদও বিদ্যমান।

(ক.) **অনুভব** - এই অনুভব যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দুই প্রকার। তার মধ্যে যথার্থানুভব হল বিষয়ের অবিসংবাদী। অর্থাৎ এই অনুভবের দ্বারা যে বিষয়টি যেরূপ, সেই বিষয়টি সেরূপে প্রতীত হয়। তাই যথার্থ অনুভবের নাম প্রমা। এটি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যেমন - চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘট প্রত্যক্ষ, ধূমাদি হেতুর দ্বারা অগ্নির জ্ঞান ইত্যাদি। অযথার্থানুভব হল - যে অনুভবে, অনুভূত বিষয়টি ব্যভিচার দোষযুক্ত হয়। এই অযথার্থানুভব আবার তিন প্রকার হয়। যথা - সংশয়, তর্ক এবং বিপর্যয়।

i. **সংশয়** - একই পদার্থে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞানকে সংশয় বলা হয়। এই সংশয় তিন প্রকার হয়। যথা - (ক) সাধারণধর্ম হতে উৎপন্ন সংশয়। যেমন - এটি স্থানু অথবা পুরুষ। এই স্থলে স্থানুর বক্রতা, পুরুষের অবয়ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্মের অদর্শনে এরূপ অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়। (খ) বিপ্রতিপত্তি হতে উৎপন্ন সংশয়। যেমন - মীমাংসক বলেছেন, শব্দ নিত্য। কিন্তু নৈয়ায়িক বলেছেন, শব্দ অনিত্য। এরূপ বিপ্রতিপত্তিমূলক বাক্য শ্রোবণে মধ্যস্ত ব্যক্তির সংশয় হয় - শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য। (গ) অসাধারণধর্ম হতে উৎপন্ন সংশয়। যেমন - পৃথিবীর অসাধারণধর্ম হল গন্ধবত্ব। এই অসাধারণধর্মকে দেখে, অন্য কোন বিশেষ ধর্মকে না দেখে, ব্যক্তির সংশয় হয় যে, পৃথিবী নিত্য অথবা অনিত্য।

ii. **তর্ক** - ব্যাপ্তিযুক্ত দুটি ধর্মের মধ্যে ব্যাপ্যকে স্বীকার করলে, অনিষ্ট ব্যাপকেরও প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়া হল তর্ক। তাই গ্রন্থকার বলেছেন তর্ক হল অনিষ্টপ্রসঙ্গ। অর্থাৎ যে বিষয়টি

বাদী বা প্রতিবাদী কারো ইষ্ট নয়। যেমন - বাদী যদি বলেন, এই পর্বত অগ্নিযুক্ত অথবা অগ্নি রহিত। এই স্থলে প্রতিবাদি যদি বলেন, যদি এটি অগ্নি রহিত হত, তাহলে অবশ্যই ধূমরহিত হত। এরূপ ধূমবত্ত্বারূপ অনিষ্টের আপত্তি হল তর্ক।

iii. **বিপর্যয়** - অতদ্ এর বিষয়, তৎরূপে প্রতীত হলে, অর্থাৎ যে বিষয়টি যেরূপ নয়, সেই রূপে প্রতীত হওয়াই হল বিপর্যয়। এটি ভ্রমজ্ঞান। যেমন - শুক্তিতে রজতারোপ।

(খ). **স্মরণ** - স্মরণ বা স্মৃতি হল সংস্কারমাত্র জন্য জ্ঞান। অনুভবের মত এই স্বরণও যথার্থ ও অযাথার্থ ভেদে দুই প্রকার হয়। প্রমাজন্য যথার্থ এবং অপ্রমাজন্য অযথার্থ স্মরণ হয়। তবে উভয় প্রকার স্মরণ পুরুষের জাগ্রত অবস্থায় হয়। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় সকল প্রকার স্মরণাত্মক জ্ঞান অযথার্থ হয়। এখন বক্তব্য হল, স্বপ্নাবস্থায় সকল প্রকার জ্ঞান যদি স্মরণাত্মক হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে 'তত্তার' উল্লেখ হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে, সেখানে 'ইদন্তার' উল্লেখ হয়। কারণ, সেই স্থলে 'স্মৃতিপ্রমোষ' নামক এক প্রকার দোষের উদ্ভব হয়। ঐ দোষের ফলে অনুভূত বিষয়ের কখনও সম্পূর্ণ স্মরণ হয়, আবার কখনও বা হয় না, অথবা কোন কোন বিষয়ের স্মরণ হয়। আর সেই দোষের প্রভাবে সেখানে দোষবশতঃ 'তদ্' এর স্থানে 'ইদম্' এর জ্ঞান হয়। তাই *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "স্মরণমপি যথার্থমযথার্থঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তদুভযং জাগরে। স্বপ্নে তু সর্বং জ্ঞানং স্মরণমযথার্থঞ্চ। দোষবশেন তদিতি স্থানে ইদমিত্যুদযাত্।"[১১০]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, ন্যায়সূত্রে পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপিত হওয়ায়, বাৎস্যায়ন ও অন্যান্য প্রাচীন ন্যায়াচার্যগণ সেখানে এর দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডনের কথা বলেছেন। এরূপ *তর্কভাষা*কারও প্রথমে পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপণ করায়, এর দ্বার সাংখ্যামত খণ্ডিত হয়েছে। তবে *তর্কভাষা*কার বুদ্ধির বৈকল্পিক লক্ষণ এবং প্রকারগুলিও আলোচনা করায়, পাঠকের কাছে বিষয়টি আরও বোধগম্য হয়েছে।

● **মন :** *তর্কভাষা* গ্রন্থে 'মন' নামক প্রমেয়পদার্থটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে, নব-দ্রব্যের মধ্যে নবম-দ্রব্যরূপে এবং আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে ষষ্ঠ প্রমেয়রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। *তর্কভাষা*কার ষষ্ঠ-প্রমেয়-পুরস্কারে মনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "অন্তরিন্দ্রিযং মনঃ। তচ্চোক্তমেব"[১১১] গ্রন্থকার এখানে 'তচ্চ...' ইত্যাদির পূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে বুঝিয়েছেন।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মহর্ষি গৌতম 'মন' নামক প্রমেয়ের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মনের অস্তিত্ব সাধক লিঙ্গের দ্বারা তার লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। সেখানে আচার্য বাৎস্যায়ন স্মৃত্যনুমানাদিকেও মনের লিঙ্গ হিসেবে উপন্যস্ত করেছেন। আবার উদ্দ্যোতকর অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা মনের ইন্দ্রিয় সিদ্ধ করেছেন। কিন্তু *তর্কভাষা*কার মনের অণুত্বাদি স্বরূপগুলি পূর্বে বর্ণনা করায়, এই স্থলে আর বিশেষ কিছু বলেননি।

● **প্রবৃত্তি :** *তর্কভাষা*কার প্রবৃত্তিকে ধর্ম এবং অধর্মমী যাগাদি ক্রিয়া বলেছেন। তাঁর মতে, এই প্রবৃত্তির দ্বারা জগতের সকল ব্যবহার সম্পন্ন হয়। শাস্ত্রে বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্মের উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার এখানে 'যাগাদি' পদের 'আদি' শব্দটির দ্বারা সেই সকল নিষিদ্ধ কর্মকে বুঝিয়েছেন। যাগ প্রভৃতি বিহিত বা শুভকর্মজন্য ধর্মমূলক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। আবার নিষিদ্ধ কর্মজন্য জীবের অধর্মমূলক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মহর্ষি গৌতম ধর্মাধর্মমূলক প্রবৃত্তিকে শারীরিক, মানসিক এব বাচিক - এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। আচার্য বাৎস্যায়ন সেখানে ধর্মজন্য দশ প্রকার এবং অধর্মজন্য দশ প্রকার প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। এরূপ *তাৎপর্যটীকা*কার মূলত প্রবৃত্তির জ্ঞানহেতু ও ক্রিয়াহেতুরূপে দুই প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। আবার নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবনযোনিযত্ন - প্রযত্নের তিন প্রকার ভেদের কথা বলেছেন।[১১২] *তর্কভাষা*কার 'তস্যা জগৎব্যবহার...' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা জীবের সকল প্রকার প্রবৃত্তিকে বুঝিয়েছেন। যেহেতু প্রবৃত্তি সংসারের সকল প্রকার ক্রিয়াকর্মের সাধক।

● **দোষ :** জীবমাত্রে রাগ, দ্বেষ এবং মোহ - এই তিন প্রকার দোষের উদ্ভব হয়। তবে শাস্ত্রান্তরে এতদতিরিক্ত কামাদি দোষের উল্লেখ আছে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে, উক্ত কামাদি দোষগুলি এই তিন প্রকার দোষেরই অন্তর্গত। সেজন্য *তর্কভাষা*কার এই তিন প্রকার দোষের কথা বলেছেন। *তর্কভাষায়* এই বিষয়ে বলা হয়েছে - "দোষাঃ রাগদ্বেষমোহাঃ। রাগ ইচ্ছা। দ্বেষো মন্যুঃ ক্রোধ ইতি যাবত্। মোহ মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্যয ইতি যাবত্।"[১১৩] অর্থাৎ রাগ হল, ইচ্ছা স্বরূপ। দ্বেষ হল মন্যু বা ক্রোধ স্বরূপ। আর মোহ হল মিথ্যাজ্ঞান স্বরূপ। অতদ্ এর বিষয়, তৎরূপে প্রতীত হলে, যে বিপর্যয় বা ভ্রমজ্ঞানের উদ্ভব হয়, সেটি হল মিথ্যাজ্ঞান।

যেমন - শুক্তিতে রজতারোপ। তবে এই তিন প্রকার দোষের মধ্যে মোহই প্রধান। কারণ, মোহশূন্য ব্যক্তির রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয় না।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, আচার্য বাৎস্যায়ন রাগ, দ্বেষ ও মোহ - এই তিন প্রকার দোষের তিনটি পক্ষের কথা বলেছেন। সেখানে কাম, লোভ, তৃষ্ণা প্রভৃতি রাগপক্ষের অন্তর্গত। এরূপ ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ প্রভৃতি দ্বেষপক্ষের অন্তর্গত। আবার মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাদ প্রভৃতি বিষয়গুলি মোহপক্ষের অন্তর্গত। অত এব বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করলে, দেখা যায় যে, *তর্কভাষা*কারের 'রাগ ইচ্ছা। দ্বেষো মন্যুঃ, ক্রোধ ইতি যাবত্' ইত্যাদি গ্রন্থাংশের দ্বারা ব্যাৎস্যায়নোক্ত সেই বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয়েছে।

● **প্রেত্যভাব :** মৃত্যুর পর জীবের পুনরায় উৎপত্তি বা জন্মগ্রহণ করা হল, প্রেত্যভাব। আত্মার পূর্বশরীরের পরিত্যাগ এবং অপূর্বশরীর পরিগ্রহ 'প্রত্যভাব' নামে অভিহিত হয়। গ্রন্থকার প্রাচীন নৈয়ায়িকদের সঙ্গে একই আঙ্গিকে এই প্রেত্যভাবের ব্যাখ্যা করেছেন।

● **ফল :** 'ফল' নামক প্রমেয়পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে *তর্কভাষা*কার জীবাত্মার স্বীয় ক্রিয়া-কর্মের ভোগের কথা বলেছেন। জীব তার কর্ম অনুসারে সুখাদি ফল ভোগ করে। শাস্ত্রে সুখ বা দুঃখের কোন একটির সাক্ষাৎকারকে ভোগ বলা হয়। ফল হল জীবের সেই ভোগ। এরূপ আচার্য বাৎস্যায়নও সুখদুঃখের সংবেদনকে ফল বলেছেন। তবে বাৎস্যায়ন ও অন্যান্য প্রাচীন আচার্যদের মতে, সেই সুখ বা দুখ হল, মুখ্যফল এবং শরীরাদি প্রমেয় পদার্থগুলি গৌণফল। অর্থাৎ সেখানে 'শরীর' হতে 'ফল 'পর্যন্ত সকল পদার্থই ফল নামে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু *তর্কভাষা*কার কেবল মুখ্য ফলের উল্লেখ করলেও যেহেতু শরীরাদি সেই ভোগের আশ্রয়, সাধন। তাই এর দ্বারা উভয়বিধ ফলকেই বুঝতে হবে।

● **দুঃখ :** *তর্কভাষা*কার দুঃখের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, দুঃখ হল 'পীড়া' পদবাচ্য। গ্রন্থকার এই দুঃখ নামক প্রমেয়ের স্বরূপবিষয়ে আর কিছু বলেননি। কারণ, গুণ পদার্থের ব্যাখ্যানাবসরে গ্রন্থকার দুঃখকে জীবাত্মার প্রতিকূলবেদনীয় পদার্থ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মহর্ষি গৌতম বাধনার দ্বারা লক্ষিত পদার্থকে দুঃখ বলেছেন। আচার্য বাৎস্যায়ন সেই 'বাধনা' শব্দের অর্থ বলেছেন, পীড়া। সেই অনুসারে *তর্কভাষা*কারও পীড়াকে দুঃখ বলেছেন। কিন্তু *ভাষ্য*কারকে অনুসরণ করে, দুঃখলক্ষণ নিরূপণ

করলেও *ভাষ্য*কারোক্ত দুঃখপ্রভেদ স্বীকার করেননি। কারণ, *ন্যায়ভাষ্য*কার সেখানে উত্তম, মধ্যম, অধম ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃখ-ভেদের কথা বলেছেন। কিন্তু *তর্কভাষা*কার একুশ প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন। কারণ, অপবর্গের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলেছেন। অত এব এবিষয়ে তিনি অন্যান্য প্রাচীন আচার্যের মত উদ্দ্যোতরকে অনুসরণ করেছেন।

● **অপবর্গ :** *তর্কভাষা*কার মোক্ষকে অপবর্গ বলে, একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির দ্বারা সেই অপবর্গ লাভের কথা বলেছেন - "মোক্ষোঽপবর্গঃ। স চৈকবিশতিদুঃখপ্রভেদভিন্নস্য দুঃখস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তিঃ।"[১১৪] তবে 'মোক্ষ' এবং 'অপবর্গ' এগুলি হল পর্যায়বাচক শব্দ। অর্থাৎ *তর্কভাষা*কার এখানে পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা অপবর্গের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন।

আর সেই অপবর্গ প্রাপ্তির উপায় হিসেবে জিজ্ঞাসাপূর্বক মুমুক্ষুর অবশ্যকর্তব্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা পুরুষ, যিনি সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে, বিষয়সমূহের দোষ দর্শন করে, বিরক্ত হয়েছেন, সেই মুমুক্ষু যোগসমাধির দ্বারা একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করেন।

মহর্ষি গৌতম দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞানের উত্তরোত্তর অপায়ের দ্বারা জীবের অপবর্গের কথা বলেছেন। অত এব আমরা বলতে পারি ন্যায়সূত্রকার অপবর্গের যে ক্রমের কথা বলেছেন, *তর্কভাষা*কার নিজ শৈলী অনুসারে সেই ক্রমের বিশ্লেষণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায় :
*তর্কভাষা*র টীকাকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৪.০. ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশের জন্য *তর্কভাষা* গ্রন্থটির অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটি ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম পাঠার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। এর উপর রচিত বিংশত্যধিক টীকাগুলি গ্রন্থটির সেই জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধতার সাক্ষ্য বহন করে। *তর্কভাষা* গ্রন্থের ওপর প্রণীত টীকাগুলি হল - গোবর্ধনমিশ্রের *তর্কভাষাপ্রকাশ,* চিন্নংভট্টের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা,* গৌরীকান্তসার্বভৌমের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* বা *তর্কভাষাভাবার্থদীপিকা,* বলভদ্রের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা,* বিশ্বকর্মার *ন্যায়প্রদীপ,* কৌণ্ডিন্যদীক্ষিতের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা,* গণেশদীক্ষিতের *তত্ত্বপ্রবোধিনী,* কেশবভট্টের *তর্কদীপিকা,* নাগেশভট্টের *যুক্তিমুক্তাবলী,* ভাস্করভট্টের *পরিভাষাদর্পণ,* মাধবদেবের *সারমঞ্জরী,* রামলিঙ্গের *ন্যায়সংগ্রহ,* দিনকরভট্টের *তর্ককৌমুদী,* বাগীশভট্টের *তর্কভাষাপ্রসাদিনী,* গোপীনাথের *উজ্জ্বলা,* অখণ্ডান্দসরস্বতীর *তর্কভাষাপ্রকাশ,* বিশ্বনাথভট্টের *ন্যায়বিলাশ* ইত্যাদি। এই টীকাগুলির পাশাপাশি কতগুলি টীকা পাওয়া যায় যেগুলির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। যেমন - *তর্কভাষাবার্তিক, তর্কভাষাপদকৃত্য, তর্কভাষা-ওপন্যাস* ইত্যাদি। আবার কিছু টীকাকারের নাম পাওয়া যায়, যাঁদের টীকাগুলি পাওয়া যায় না। যেমন - গুণ্ডভট্ট, মুরারিভট্ট, নারায়ণভট্ট প্রভৃতি।

৪.১. *তর্কভাষার* টীকাকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনীকারগণ তাঁদের নিজ পরিচয় প্রদানে সর্বদা বিমুখ। কেননা, এতে গ্রন্থকর্তার আত্ম-অহংকার প্রকাশ হয়। সেজন্য, তাঁদের যথাযথ স্বরূপ উদ্ঘাটন বাস্তবিকই অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অধ্যাপক Dr. Peterson তাঁর Ulwar M.M.S.-1892-এর সূচিপুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, বর্ধমানের *তর্কভাষাপ্রকাশ* নামে *তর্কভাষার* একটি টীকা এবং এর উপর রুচিদত্তের উপটীকা সহ Alwar-এর মহারাজার গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।[১] যদি আমরা এটিকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি, তাহলে এই অনুসারে *তর্কভাষার* প্রথম টীকাকার হলেন বর্ধমান। কিন্তু এবিষয়ে বিশদ কিছু তথ্য অন্যত্র পাওয়া যায় না, যা থেকে বর্ধমান *তর্কভাষা*র প্রথম টীকাকারূপে সিদ্ধ হন। *তর্কভাষার* যে সকল টীকা ও টীকাকারদের পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নে সংক্ষেপে তার বিবরণ প্রদত্ত হল -

৪.১.১. **গোবর্ধনমিশ্র :** *তর্কভাষা*র প্রাচীন টীকাকারদের মধ্যে একজন হলেন গোবর্ধনমিশ্র। তাঁর রচিত টীকার নাম *তর্কভাষাপ্রকাশ*। তিনি টীকাটির প্রারম্ভে নিজ পরিচয়ে বলেছেন -

"বিজযশ্রীতনূজন্মা গোবর্ধন ইতি শ্রুতঃ।
তর্কানুভাষাযাং তনুতে বিবিচ্য গুরুনির্মিতিম্॥
বিশ্বনাথানুজপদ্মনাভানুজো গরীযান্বলভদ্রজন্মা।
তনোতি তর্কানধিগত্য সর্বান্ শ্রীপদ্মনাভাদ্বিদুষো বিনোদম্॥"[২]

অর্থাৎ গোবর্ধনমিশ্র ছিলেন বিজয়শ্রী ও বলভদ্রের পুত্র এবং বিশ্বনাথ ও পদ্মনাভের অনুজ। তিনি নিজ গুরু (কেশবমিশ্র) কৃত *তর্কভাষা*র বিস্তার ঘটিয়েছেন স্বকৃত টীকাগ্রন্থের (*তর্কভাষাপ্রকাশে*'র) দ্বারা। তিনি পূর্বজ বিদ্বান পদ্মনাভের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে (সুধীগণের) বিনোদনের কারণস্বরূপ *তর্কভাষা*র ব্যাখ্যামূলক *তর্কভাষাপ্রকাশ* নামক টীকা রচনা করেন। কিন্তু কিছু বঙ্গীয় ও হিন্দি সংস্করণে বিশ্বনাথ ও পদ্মনাভকে কেশবমিশ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে পরিচয় দেওয়া হয়। বস্তুত তা ঠিক নয়। কারণ, পদ্মনাভ ছিলেন একজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর *কিরণাবলীভাস্কর* নামে একটি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বলা হয়েছে -

"উপদিষ্টা গুরুচরণৈরস্পৃষ্টা বর্ধমানেন।
কিরণাবল্যাযামর্থাস্তন্যন্তে পদ্মনাভেন॥১॥
বিলসদ্বর্ধমানাপি তিরোহিতদিবাকরা।
সকলার্থপ্রকাশায ন ক্ষমা কিরণাবলী॥২॥
বলভদ্রমুখাম্ভোজবচনাদুদযাচলাত্।
উদিতো ভাস্করস্তস্মাদাদরেণ নিষেব্যতাম্॥৩॥"[৩]

অত এব বর্ধমানের দ্বারা তাঁর *কিরণাবলীপ্রকাশে* গ্রন্থে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়নি, নিজ গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে পদ্মনাভমিশ্র সেই বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করতে উদ্যত হয়েছেন তাঁর *কিরণাবলীভাস্কর* গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। এরূপ সমাপ্তিবাক্যে তিনি নিজ পরিচয়ে বলেছেন - "ইতি শ্রীজগদ্-গুরুমিশ্রশ্রীবলভদ্রাত্মজবিজযশ্রীগর্ভসংভববিশ্বনাথানুজসকলশাস্ত্রারবিন্দপ্রদ্যোতন-

ভট্টাচার্যমিশ্রশ্রীপদ্মনাভকৃতঃ কিরণাবলীভাস্করঃ সংপূর্ণঃ।"[৪] গোবর্ধনমিশ্র *তর্কভাষাপ্রকাশ*-এ নিজেকে বিশ্বনাথ এবং পদ্মনাভের অনুজ বলেছেন। এরূপ পদ্মনাভ আবার এখানে নিজেকে বিশ্বনাথের অনুজ বলে পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ এই অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া যায় যে, গোবর্ধনমিশ্র ছিলেন বলভদ্র ও বিজয়শ্রীর কণিষ্ঠপুত্র। বর্ধমান ও পদ্মনাভ প্রায় সমসাময়িক হওয়ায় গোবর্ধনের সময় ত্রয়দশ শতকের শেষার্ধ বলে নিশ্চিত হয়। গোবর্ধনমিশ্র কৃত টীকাটি ১৮৯৪ সালে এস. এম. পরাঞ্জপে মহোদয় কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। অখণ্ডানন্দন এবং গুণরত্নগণি গোবর্ধনের এই টীকার উপর টীকা রচনা করেন। গোবর্ধনের অন্য একটি রচনা হল *ন্যায়বোধিনী* । এটি অন্নংভট্টের *তর্কসংগ্রহের* প্রসিদ্ধ টীকাসমূহের মধ্যে অন্যতম।

৪.১.২. **চিন্নংভট্ট :** চিন্নংভট্ট *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* নামে *তর্কভাষার* একটি টীকা রচনা করেন। এটি ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে খুবই জনপ্রিয়। চিন্নংভট্ট টীকাটিকে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদের সমাপ্তিবাক্যে তিনি বলেছেন - "শ্রীহরিদত্ত(হর) মহারাজপরিপালিতেন সহজসর্বজ্ঞবিষ্ণুদেবারাধ্যতনূজেন সর্বজ্ঞানুজেন চিন্নংভট্টেন বিরচিতায়াং তর্কভাষাব্যাক্রিযায়াং তর্কভাষাপ্রকাশিকায়াং প্রমেযাদিপরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।"[৫] অর্থাৎ তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞের অনুজ, বিষ্ণুদেবের পুত্র এবং সহজসর্বজ্ঞের প্রপৌত্র। তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা হরিহরের পৃষ্ঠপোষকতায় টীকাটি রচনা করেন। বিষ্ণুদেবকে আরাধ্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ যা থেকে অনুমিত হয় চিন্নংভট্ট একজন লিঙ্গায়ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। এখন বক্তব্য হল যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে দুই জন হরিহরের নাম পাওয়া যায়। প্রথম জন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজত্বকাল ১৩৩৬-১৩৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।[৬] আর দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকাল ১৩৭৭-১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দ।[৭] সম্ভবত চিন্নংভট্ট দ্বিতীয় হরিহরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ঐ সময়ই তিনি টীকাটি রচনা করেন। সেজন্য চিন্নংভট্ট চতুর্দশ শতকের দার্শনিকরূপে পরিচিত। চিন্নংভট্ট চৈতন্যভট্ট বা চেন্নুভট্ট নামেও পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যাসংশোধনের তত্ত্বাবধানে ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি. কে. সাহিত্যভূষণের সম্পাদনায় টীকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪.১.৩. **বিশ্বকর্মা :** বিশ্বকর্মা *ন্যায়প্রদীপ* নামে *তর্কভাষা*র একটি টীকা রচনা করেন। এই টীকাটির প্রারম্ভিক শ্লোকে তিনি নিজের গুরুপরিচয় প্রদান করেছেন -

"প্রণম্য বিঘ্নহন্তারং গুরুং দামোদরম্ তথা।
টীকেযং তর্কভাষাযাস্তন্যতে বিশ্বকর্মণা॥"[৮]

অর্থাৎ তিনি বিঘ্ননাশের জন্য ইষ্ট দেবতা এবং নিজ গুরু দামোদরকে প্রণাম করে *ন্যায়প্রদীপ* নামে *তর্কভাষা*র টীকা রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরূপ টীকাটির সমাপ্তি শ্লোকে তিনি বলেছেন - "ইয়ং ন্যাযপ্রদীপাখ্যা টীকা শ্রীবিশ্বকর্মণা।

নির্মায বিশ্বনাথস্য পাদপদ্মে সমর্পিতা॥১॥

গ্রন্থো ন্যাযপ্রদীপাখ্যো নির্মিতো বিশ্বকর্মণা।

নির্মায খলু সঙ্খ্যাতো বাণাক্ষিরামভূমিভিঃ॥২॥"[৯]

অর্থাৎ বিশ্বকর্মা, স্বীয় টীকাটি সমগ্র জগতের স্বামী, তথা বিশ্বনাথের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছিলেন। এই টীকাটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন **১৩৩৫** শকাব্দে (বাণাক্ষিরামভূমিভিঃ)। অর্থাৎ **১৪১৩** খ্রিষ্টাব্দে। অধ্যাপক সুরেন্দ্র লাল গোস্বামী কর্তৃক **১৯০১** সালে বেনারস মেডিক্যাল হল প্রেশ হতে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪.১.৪. **গৌরিকান্ত ভট্টাচার্য :** গৌরিকান্ত *তর্কভাষাভাবার্থদীপিকা* নামে *তর্কভাষা*র একটি টীকা রচনা করেন। এই টীকাটীর প্রারম্ভিক শ্লোকে তিনি ইষ্ট দেবতার আরাধনা করে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বলেছেন- "ওঁ তৎসদেভিঃ প্রতিপাদিতায নিত্যাখিলেচ্ছাকৃতিধীযুতায।

লীলাঘনশ্যামকলেবরায নমোঽস্তু তস্মৈ জগদীশ্বরায॥

উজ্জ্বলা তর্কভাষাযা ইয়ং ভাবার্থদীপিকা।

ভট্টাচার্যেণ ধীরেণ গৌরীকান্তেন তন্যতে॥২॥

মাতর্ভারতি হে শিরোমণিবচোব্যাখ্যানসৎকৌশলে

সাহঙ্কারতযৈব কেশবকৃতিব্যাখ্যাসু কিং লজ্জসে।

কর্পুরপ্রচুরোল্লসত্ খদিরযুক্তাম্বূলজো বাধরে

রাগো যাবকজোঽথবা যদি তদা কা নাম শোভাক্ষতিঃ॥৩॥"[১০]

অর্থাৎ ভারতী বা স্বরসতী দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করে তিনি স্বীয় অহংকারে কেশবকৃতি (*তর্কভাষা*'র) ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। এরূপ টীকার সমাপ্তিবাক্যে তিনি বলেছেন - 'ইতি শ্রীমহোপাধ্যাযগৌরীকান্তসার্বভৌমভট্টাচার্যবিরচিতা *ভাবার্থদীপিকা* নাম তর্কভাষাটীকা সমাপ্তিমগমত্।'[১১] অর্থাৎ এ থেকে জানা যায় যে গৌরীকান্তভট্টাচার্য 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং তিনি একজন বঙ্গসন্তান ছিলেন। *ভাবার্থদীপিকা* ছাড়াও *আনন্দলহরিতরি, তর্কভূষণটীকা, তর্কসংগ্রহটীকা* নামে গৌরীকান্তের তিনটি রচনা পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতকের শেষার্ধের মধ্যবর্তী কোন সময়ে তিনি আবির্ভূত হন বলে মনে করা হয়।[১২]

৪.১.৫. **বলভদ্র :** বলভদ্র *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* নামে *তর্কভাষা*র একটি টীকা রচনা করেন। নিজ পরিচয়ে তিনি টীকাটির সমাপ্তি বাক্যে বলেছেন - 'ইতি শ্রীমত্-ত্রিপাঠীবিষ্ণুদাসতনুজ-বলভদ্রবিরচিতাযা তর্কভাষাপ্রকাশিকা সমাপ্তা।'[১৩] তিনি ছিলেন বিষ্ণুদাস ত্রিপাঠীর পুত্র। *তর্কভাষা*'র টীকাকার গোবর্ধনের পিতার নাম বলভদ্র। অনেকে এই বলভদ্রকে তাঁর পিতারূপে অনুমান প্রকাশ করে। বিষয়টি প্রমাণসাপেক্ষ।

৪.১.৬. **মাধবদেব :** মাধবদেব *সারমঞ্জরী* নামে *তর্কভাষা*র একটি টীকা প্রণয়ন করেন। নিজ পরিচয়ে টীকাটির সমাপ্তি বাক্যে তিনি বলেছেন - "শ্রীধরাসুরনিবাসিমাধবদেবাত্মজ-লক্ষণদেবসূনুকাশিনিবাসিমাধবেন তর্কপ্রকাশতর্কভাষাসারমঞ্জরী বিশ্বেশ্বরপ্রীতযে চ কৃতা।"[১৪] অর্থাৎ মাধবদেব কাশিতে বসবাস করতেন এবং তিনি ছিলেন লক্ষণদেবের পুত্র ও গোদাবরী তীরের তথা শ্রীধরাসুরের অধিবাসী মাধবদেবের পৌত্র। তাঁর সময় কাল **১৬৮১** খ্রিষ্টাব্দ।[১৫] টীকাটি টী. ডী. (তোতাদ্রি দেবনায়ক) মুরলীধর কর্তৃক **১৯৮৮** সালে তিরুপতি কেন্দ্রিয় বিদ্যাপীঠে পিএইচ্. ডি. গবেষণাকর্মের বিষয়রূপে উপস্থাপিত হয়। তারপর **১৯০৯** সালে রাধাবল্লভত্রিপাঠীর তত্ত্বাবধানে সংস্কৃতবর্ষস্মৃতিগ্রন্থমালার 'অপ্রকাশিতপাণ্ডুলিপিগ্রন্থপ্রকাশনম্-**১৭**'-এ তারই সম্পাদনায় এটি প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়। মাধবদেবের অন্যান্য রচনাগুলি হল - *প্রমাণাদিপ্রকাশিকা, গুণরহস্যপ্রকাশ* প্রভৃতি। প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, মাধবদেব তাঁর *সারমঞ্জরী* টীকাতে গোবর্ধনমিশ্র, গৌরীকান্তসার্বভৌম ও বলভদ্রের মত খণ্ডন করেছেন। অত এব অবশ্যই তিনি তাঁদের পরবর্তী ব্যাখ্যাকার।

৪.১.৭. **গণেশদীক্ষিত :** গণেশদীক্ষিত *তত্ত্বপ্রবোধিনী* নামে *তর্কভাষার* একটি টীকা রচনা করেছেন। এই টীকাটির মঙ্গলাচরণ শ্লোকে তিনি ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করে নিজ মাতাপিতার বন্দনা করেছেন -

"কেশকেশবরূপৈর্যঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ।

তং গণেশমহং বন্দে স্মৃতিমাত্রাঘনাশনম্॥

গোবিন্দদীক্ষিতং তাতমুমাং নত্বা চ মাতরম্।

ক্রিয়তে তর্কভাষাযাষ্টীকা তত্ত্বপ্রবোধিনী॥"[১৬]

অর্থাৎ তিনি ছিলেন গোবিন্দদীক্ষিত ও উমাদেবীর পুত্র। এম্. রঙ্গাচার্য তাঁর *A descriptive catalogue of the Sanskrit Manuscript* গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'টীকাটির দুইটি অংশ পাওয়া যায়। একটি অংশে পঞ্চাবয়ব পর্যন্ত ও অন্য অংশটিতে গুণপরিচ্ছেদ পর্যন্ত পাওয়া যায় এবং গুণপরিচ্ছেদের প্রথম দুটি পৃষ্ঠা পাওয়া য়ায় না'[১৭] এর ওপর বিশ্বনাথ ভট্টের *ন্যায়বিলাস* নামে টীকা পাওয়া।

৪.১.৮. **গোপীনাথ :** গোপীনাথ *তর্কভাষাভাবপ্রকাশিকা* নামে *তর্কভাষার* একটি টীকা রচনা করেন। এই টীকাটির মঙ্গলাচরণ অংশে তিনি বলেছেন -

"গোপীনাথেন বিদুষা নত্বা হরিপদাম্বুজম্।

সংক্ষিপ্য তর্কভাষাভাবঃ কশ্চিৎপ্রকাশ্যতে॥"[১৮]

অর্থাৎ শ্রীহরির পদযুগলে নমস্কার করে বিদ্বান গোপীনাথের দ্বারা *তর্কভাষাভাবপ্রকাশিকা* নামক *তর্কভাষার* ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংক্ষিপ্তাকারে রচিত হচ্ছে। গোপীনাথ গোঘটবংশীয় ঠাক্কুরভাবনাথের পুত্র ছিলেন।[১৯] এছাড়া গোপীনাথের অন্য সকল বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না।

৪.১.৯. **কৌণ্ডিন্যদীক্ষিত :** *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* নামে *তর্কভাষার* একটি টীকা রচনা করেন। এই টীকাটির মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন -

"মুরারিভট্টচরণদ্বন্দ্বং নত্বা প্রতন্যতে।

কৌণ্ডিন্যদীক্ষিতেনৈষা তর্কভাষাপ্রকাশিকা॥"[২০]

অর্থাৎ এ থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন মুরারিভট্টের শিষ্য। তিনি নিজ গুরুকে প্রণাম করে টীকাটির শুভারম্ভ করেছিলেন।

৪.১.১০. **মাধবভট্ট :** মাধবভট্ট *তর্কভাষাবিবরণ* নামে *তর্কভাষা*র একটি টীকা করেন। সেই টীকাটির মঙ্গলচরণ শ্লোকে তিনি বলেছেন -

"প্রণম্য জগদারাধ্যং জগদানন্দদাযিনম্।
তর্ক্কভাষাবিবরণং বিদধে মাধবঃ সুধীঃ॥"[২১]

অর্থাৎ যিনি জগতের আরাধ্য দেবতা এবং যিনি জগতকে সকল প্রকার আনন্দ প্রদান করেন, সেই আরাধ্য দেবতাকে নমস্কার করে মাধবভট্ট *তর্কভাষাবিবরণ* নামে *তর্কভাষা*র একটি টীকা রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরূপ এই টীকাটির সমাপ্তিবাক্যে বলা হয়েছে - 'ইতি শ্রীমদশেষবাদীন্দ্রদ্বিপপঞ্চাননশ্রীপ্রকাশানন্দান্তেবাসিমাধবভট্টবিরচিতং তর্কভাষাবিবরণং সমাপ্তম্।'[২২] অর্থাৎ মাধবভট্ট ছিলেন প্রকাশানন্দের শিষ্য। তিনি অশেষবাদীন্দ্র ও দ্বিপপঞ্চানন এই দুটি বিশেষণে ভূষিত ছিলেন।

৪.১.১১. **অখণ্ডানন্দসরস্বতী :** অখণ্ডানন্দসরস্বতী *তর্কভাষাপ্রকাশ* নামে *তর্কভাষা*র একটি রচনা করেন। টীকাটির মঙ্গলাচরণ অংশে তিনি বলেছেন -

"শ্রীরঙ্গরাজভুবি যস্য তাতঃ শ্রীকালঃ (হস্তিমখিরাণ্নলগন্তুবংশ্যঃ)।
(যজ্ঞাম্বিকা চ জননী স পুরাকৃতেন শ্রী)মানখণ্ডযতিরাট্ সুকৃতেন জাতঃ॥
স বালসুখবোধায প্রণমন্ কৃষ্ণবাগ্গুরুন্।
বিশিষ্য তর্কভাষাযাঃ প্রকাশং তনুতে যতিঃ॥
নিরন্তরং ব্রহ্মনিষ্ঠ (হ্য)খণ্ডযতিরাডযম্।
ব্যাখ্যেযা তর্কভাষেতি শিষ্যৈঃ কৈশ্চিদিহার্থিতঃ॥"[২৩]

অর্থাৎ অখণ্ডানন্দের পিতা হলেন শ্রীকাল এবং মাতা যজ্ঞাম্বিকা। তিনি বালকদের (ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের) *তর্কভাষা*র পাঠ সহজবোধ্য করে তোলার জন্য *তর্কভাষাপ্রকাশ* নামক একটি টীকা রচনা করেন। এই টীকাটির সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদের সমাপ্তি বাক্যে তিনি বলেছেন - "ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য-

শ্রীমৎস্বযংপ্রকাশসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমদখণ্ডানন্দসরস্বতীবিরচিতে তর্কভাষাপ্রকাশে প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদসমাপ্তঃ।"[২৪] টীকাটির এই শেষাংশ থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন স্বয়ংপ্রকাশসরস্বতীর শিষ্য। এখানে বক্তব্য হল যে অখণ্ডানন্দ নামে জনৈক ব্যক্তি গোবর্ধনের *তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকার উপর টীকা রচনা করেন। এই দুই জন একই ব্যক্তি কি না - সেই বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অতএব বিষয়টি অন্বেষণীয়।

৪.১.১২. **নাগেশভট্ট :** নাগেশভট্ট *যুক্তিমুক্তাবলী* নামে *তর্কভাষা*র একট টীকা রচনা করেন। নাগেশভট্ট ভট্টজিদীক্ষিতের পৌত্র হরিদীক্ষিতের সমসাময়িক ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর সময়কাল সপ্তদশ শতক।[২৫]

অত এব *তর্কভাষা*র টীকা বা টাকাকারদের পরিচয় অন্বষণ করে এই কথা বলা যায় যে, *তর্কভাষা*র বেশীরভাগ টীকা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান। ভবিষ্যতে সেই সকল টীকাগুলি প্রকাশিত হলে *তর্কভাষা*র অর্থোদ্ধার করা পাঠকের কাছে আরও সহজ এবং সরল হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য টীকাকারদের যথাযথ পরিচয়ও পাওয়া যেতে পারে।

৪.২. ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনসম্মত প্রকরণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

তর্কভাষা গ্রন্থটি নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট প্রকরণগ্রন্থ হলেও এখানে গ্রন্থকার কর্তৃক বৈশেষিকের দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থও প্রতিপাদিত হয়েছে। সেজন্য এই সমানতন্ত্রীয় দার্শনিক সম্প্রদায় দুটির অন্যান্য প্রকরণ গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ আবশ্যক। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে অবলম্বন করে যে সকল প্রকরণগ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেই সকল গ্রন্থগুলিতে কোথাও এককভাবে ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর আবার কোথাও বা উভয় দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। নব্য ন্যায়ের প্রসারের সাথে সাথে সেই সময়কাল থেকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে দার্শনিক মহলে বিবিধ প্রকরণগ্রন্থ রচিত হয়। এই প্রকরণ গ্রন্থগুলি উভয় দর্শনশাস্ত্রের বিস্তার লাভের অন্যতম কারণস্বরূপ। শাস্ত্রে প্রকরণগ্রন্থের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে -

"শাস্ত্রৈকদেশসম্বন্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্।

আহু প্রকরণং নাম শাস্ত্রভেদবিচক্ষণাঃ(গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ)॥"[২৬]

অর্থাৎ যে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় কোন একটি মূলশাস্ত্রের একদেশের সাথে সম্বন্ধিত, শাস্ত্রের প্রয়োজন অনুসারে যেখানে সম্বন্ধিত শাস্ত্রের অতিরিক্ত কোন বিষয়ও সমাবেশ করা হয়, বিদ্বজ্জন সেই গ্রন্থকে প্রকরণগ্রন্থ বলেন। আর এই সকল প্রকরণ গ্রন্থগুলি পাঠকের কাছে মূলশাস্ত্রে প্রবেশের সোপানরূপে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর *History of Indian Logic* গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উক্ত প্রকরণ গ্রন্থগুলিকে প্রণয়নশৈলী অনুসারে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। ক্রমে সেগুলি বিবৃত হল -

৪.২.১. **প্রথম শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থ :** যেখানে প্রমাণপদার্থ মুখ্যবিষয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অন্যান্য পদার্থগুলিকে সেই প্রমাণপদার্থের মধ্যেই সন্নিবেশ করা হয়েছে। যেমন - ভাসর্বজ্ঞের (৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[২৭] *ন্যায়সার* এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রকরণগ্রন্থ। ভাসর্বজ্ঞ এখানে ন্যায়সম্মত পদার্থতত্ত্ব একটু ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের পদ্ধতিকে তিনি কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রন্থটিকে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। যথা - প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম। এখানে ন্যায়প্রতিপাদিত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ - এই চারটি প্রমাণের মধ্যে গ্রন্থকার কেবল প্রত্যক্ষাদি তিনটি প্রমাণেরই ব্যাখ্যা করেছেন।[২৮] প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ, সংশয় প্রভৃতি পদার্থবিষয়ক আলোচনা করেছেন। অনুমান পরিচ্ছেদে হেত্বাভাস, বাদ, জল্প, বিতণ্ডাদি পদার্থের আলোচনা করেছেন। এরূপ আগম পরিচ্ছেদে আত্মাদি প্রমেয়পদার্থের আলোচনা করেছেন। মূলবক্তব্য হল গ্রন্থকার প্রমেয় পদার্থগুলিকে প্রমাণ পদার্থের মধ্যে সন্নিবেশ করেছেন। এখানে তিনি প্রমেয়ের চারটি ভেদের কথা বলেছেন - দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায়।[২৯] এরূপ মোক্ষকে দুঃখের নিবৃত্তি ও শাশ্বত সুখপ্রাপ্তিরূপে বর্ণনা করেছেন।[৩০] এই গ্রন্থের উপর ভাসর্বজ্ঞের স্বকীয় টীকা হল *ন্যায়ভূষণ*।

ভাসর্বজ্ঞের স্থানকাল বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। তবে কাশ্মীর নিবাসী সর্বজ্ঞমিশ্র, সর্বজ্ঞদেব প্রভৃতি নামসাম্যের কারণে তাঁকে কাশ্মীরের অধিবাসী বলে মনে করা হয়।[৩১] বৌদ্ধ দার্শনিক রত্নকীর্তির *অপোহসিদ্ধি* নামক গ্রন্থে *ন্যায়ভূষণ* এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩২] রত্নকীর্তি দশম শতকের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন।[৩৩] এর নিরিখে ভাসর্বজ্ঞকে নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দার্শনিক বলে মনে করা হয়।

৪.২.২. **দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থ :** যে গ্রন্থগুলি মূলতঃ ন্যায়দর্শনের গ্রন্থরূপে পরিচিত হলেও প্রয়োজন অনুসারে বৈশেষিকসম্মত পদার্থেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন - (ক) বরদরাজ (১১৫০ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[৩৪] *তার্কিকরক্ষা* নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ন্যায়োক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ হলেও গ্রন্থকার এখানে সমানতন্ত্রীয় বৈশেষিক দর্শনের পদার্থগুলিও সন্নিবিষ্ট করেছেন। এখানে তিনি আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বৈশেষিকোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থেরও বর্ণনা করেছেন। তিনি মহর্ষি গৌতমের অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক বলেছেন -

"মোক্ষে সাক্ষাদনঙ্গত্বাদক্ষপাদৈর্ন লক্ষিতম্।

তন্ত্রান্তরানুসারেণ ষট্কং দ্রব্যাদি লক্ষ্যতে॥"[৩৫]

অর্থাৎ মহর্ষি অক্ষপাদ বা গৌতমের মতে, দ্রব্যাদি প্রমেয় পদার্থ হলেও মোক্ষের অঙ্গ নয়। কিন্তু বৈশেষিকনয়ে স্বীকৃত ঐ পদার্থগুলিকে তিনিও স্বীকার করেছেন। সেজন্য বরদরাজ সেই সকল পদার্থগুলির লক্ষণ নিরূপণ করতে উদ্যত হয়েছেন। *তার্কিকরক্ষার* কয়েকটি উল্লেখযোগ্য টীকা হল বরদরাজের *সারসংগ্রহ,* মল্লিনাথসূরির *নিষ্কণ্টকা,* জ্ঞানপূর্ণের *লঘুদীপিকা* প্রভৃতি। বরদরাজকে অন্ধ্রপ্রদেশের অধিবাসী বলে মনে করা হয়। *তার্কিকরক্ষা* গ্রন্থের উপর বরদরাজের স্বকৃত *সারসংগ্রহ* নামক টীকাতে বাচস্পতিমিশ্র এবং উদয়নাচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৬] এরূপ চতুর্দশ শতকে মধবাচার্যের *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থেও বরদরাজের উল্লেখ পাওয়া যায় - "তার্কিকরক্ষাযাঞ্চ -

ধর্মস্য তদতরূপপরিকল্পনানুপপত্তিতঃ।

ধর্মিণস্তদ্বিশিষ্চত্বভঙ্গো নিত্যসমো ভবেদিতি॥"[৩৭]

অতএব তিনি অবশ্যই বাচস্পতিমিশ্র ও উদয়নাচার্যের পরবর্তী এবং মাধবাচার্যের পূর্ববর্তী কোন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেজন্য বিদ্বজ্জন বরদরাজকে প্রায় একাদশ শতকের শেষভাগ এবং দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধের দার্শনিক বলে মনে করেন।

(খ) কেশবমিশ্র (১২৭৫ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[৩৮] *তর্কভাষা* নামে একটি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি ন্যায়দর্শনের প্রবেশদ্বার স্বরূপ একটি অনন্য কীর্তি। গ্রন্থটির দুটি প্রকরণে বিভক্ত - প্রমাণ এবং প্রমেয়। কেশবমিশ্র প্রমাণপ্রকরণে ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষাদি চারটি

প্রমাণের আলোচনা করেছেন এবং পরবর্তী প্রকরণে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের ও সংশয়াদি পদার্থের বিশ্লেষণ করেছেন। ন্যায়প্রতিপাদিত প্রমেয় পদার্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার অভিনব কৌশলে বৈশেষিক দর্শন সম্মত দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থেরও প্রতিপাদন করেছেন। আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের ব্যাখ্যায় বৈশেষিকোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থের সন্নিবেশ হওয়ায় এটিকে উভয় দর্শনের প্রকরণগ্রন্থ বলা হয়। *তর্কভাষা* গ্রন্থটির উপর বিংশত্যধিক টীকা রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী কেশবমিশ্র দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের দার্শনিকরূপে পরিচিত।

৪.২.৩. **তৃতীয় শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থ :** যে গ্রন্থগুলি মূলত বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থরূপে পরিচিত হলেও প্রয়োজন অনুসারে ন্যায়দর্শনের কতিপয় পদার্থেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন - (ক) বল্লভাচার্য (১২০০ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[৩৯] *ন্যায়লীলাবতী* একটি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নামের সঙ্গে 'ন্যায়' কথাটি যুক্ত থাকলেও এটি কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক যথার্থরূপে বৈশেষিক দর্শনের দ্রব্যাদি পদার্থের বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তবে গ্রন্থকার ঐ সকল পদার্থের বর্ণনাবসরে গুণনিরূপণ প্রসঙ্গে বুদ্ধাদির সাধনরূপে ন্যায়সম্মত চতুর্বিধ প্রমাণের উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষাদি চার প্রকার প্রমাণের সাহায্যে গ্রন্থকার পূর্বপক্ষীয় সকল মতামত খণ্ডনপূর্বক নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। *ন্যায়লীলাবতী*র উপর বর্ধমান উপাধ্যায়ের *লীলাবতীপ্রকাশ,* রঘুনাথশিরোমণির *লীলাবতীদীধিতি,* শঙ্করমিশ্রের *লীলাবতীকণ্ঠাভরণ* নামক টীকা এবং মথুরানাথতর্কবাগীশের *ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশবিবেক,* ভগীরথঠক্কুরের *ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশবিবৃত্তি* নামক উপটীকা বিদ্যমান। বল্লভাচার্য দ্বাদশ শতকের দার্শনিকরূপে পরিচিত।

(খ) বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন (১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)[৪০] *ভাষাপরিচ্ছেদ* নামে বৈশেষিক দর্শনের একটি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন। এটি *কারিকাবলী* নামেও প্রসিদ্ধ। বৈশেষিক দর্শন সম্মত দ্রব্যাদি পদার্থের বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও গ্রন্থকার এখানে গুণপদার্থের সাধন হিসেবে ন্যায়োক্ত চতুর্বিধ প্রমাণ পদার্থের আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শনের প্রমেয়তত্ত্ব এবং ন্যায়দর্শনের প্রমাণতত্ত্ব হল এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। সেজন্য এটিকে উভয় দর্শনের প্রকরণগ্রন্থ বলা যায়। এই গ্রন্থের উপর বিশ্বনাথের স্বকৃত টীকার নাম

ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। এছাড়াও দিনকরভট্টের *দিনকরী*, রামরুদ্রের *রামরুদ্রী* টীকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বনাথ একজন বঙ্গসন্তান ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতকে নব্যনায়ের পীঠস্থান নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মহামহোপাধ্যায় বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য।[৪১] ষোড়শ শতকে বৃন্দাবনে ন্যায়সূত্রের উপর *ন্যায়সূত্রবৃত্তি* রচনা করেছেন এবং প্রায় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন বলে মনে করা হয়।[৪২]

(গ) জগদীশতর্কালঙ্কার (১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[৪৩] *তর্কামৃতম্* নামে বৈশেষিক দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রমেয়নিরূপণ অংশে ভাব এবং অভাবরূপে পদার্থের দ্বিবিধ বিন্যাস করে গ্রন্থকার বৈশেষিকোক্ত সপ্তপদার্থের বিশ্লেষণ করেছেন। এরূপ জ্ঞাননিরূপণ অংশে ন্যায়সম্মত চতুর্বিধ প্রমাণের আলোচনা করেছেন। তাই এটিকে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনের প্রকরণগ্রন্থ বলা হয়। মহামহোপাধ্যায় জীবন কৃষ্ণ তর্কতীর্থ এর উপর *বিবৃত্তি* নামক একটি ব্যাখ্যা রচনা করেন। জগদীশ নবদ্বীদের একজন বিশিষ্ট নব্যনৈয়ায়িক এবং মথুরানাথতর্কবাগীশের সমসাময়িক। তাঁর পিতার নাম ছিল যাদব চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের প্রপৌত্র।[৪৪] জগদীশ রঘুনাথশিরোমণির *দীধিতি* টীকার উপর *জাগদীশী* নামক টীকা রচনা করেছেন। এছাড়াও আরও অনেক টীকাগ্রন্থও রচনা করেছেন। তর্কামৃতম্ ছাড়াও জগদীশ *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* ও *ন্যায়াদর্শ* নামে দুটি স্বতন্ত্র প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেছেন।

(ঘ) অন্নংভট্ট (১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ)[৪৫] *তর্কসংগ্রহ* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বৈশেষিক দর্শন সম্মত দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের প্রতিপাদন করেছেন। বৈশেষিকোক্ত পদার্থগুলির ব্যাখ্যানবসরে তিনি ন্যায়সম্মত চতুর্বিধ প্রমাণ পদার্থেরও আলোচনা করেছেন। এরূপ গ্রন্থকার শেষে ঐ সপ্তপদার্থের মধ্যে ন্যায়োক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্ভাবের কথাও বলেছেন - "সর্বেষামপি পদার্থানাং যথাযথমুক্তেষ্বন্তর্ভাবাদ্ সপ্তৈব পদার্থা ইতি সিদ্ধম্।

কণাদন্যায়মতয়োর্বালব্যুৎপত্তিসিদ্ধয়ে।

অন্নংভট্টেন বিদুষা রচিতস্তর্কসংগ্রহঃ॥"[৪৬]

এই গ্রন্থের উপর টীকা ও উপটিকা সমেত প্রায় পঞ্চত্রিংশত্ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়। যেমন - অন্নংভট্টের স্বপ্রণীত *তর্কসংগ্রহদীপিকা*, গোবর্ধনমিশ্রের *ন্যায়বোধিনী*, চন্দরাজসিংহের *পদকৃত্য* গৌরিকান্তের *তর্কসংগ্রহটীকা*, নীলকণ্ঠের *তত্ত্বপ্রকাশ*, পট্টাভিরামের *নিরুক্তি*, অনন্তনারায়ণের *তর্কসংগ্রহটীকা* প্রভৃতি। এটি ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রথম পাঠকের অত্যন্ত উপযোগী ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

অন্নংভট্ট দীপিকাতে কাঞ্চির পল্লববংশের প্রধান রাজা ত্রিভূবনতিলকের উল্লেখ করেছেন।[৪৭] এরূপ ওয়েবারের বার্লিন সূচিপুস্তকে *তর্কসংগ্রহের* একটি হস্তলিপির সন্ধান পাওয়া যায়, যেটি অনুলিপি করা হয়েছিল ১৭৮১ সংবতে অর্থাৎ ১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে।[৪৮] এই সকল তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মহামহোপাধ্যায় এস্. সি. বিদ্যাভূষণ অন্নংভটের সময়কাল সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ বলে নিশ্চয় করেছেন। তিনি বলেছেন - "The prevailing tradition in Southern India is that Annaṁ Bhaṭṭa was an Andhra(Tlugu) of North Arcot(Chittur) district, who settled down in Benares at beginning of the 17th century A.D.।"[৪৯] অর্থাৎ অন্নংভট্ট ছিলেন চিতুর জেলা নিবাসী একজন আন্ধ্রপণ্ডিত। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি বারাণসীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

(ঙ) লোগাক্ষিভাস্কর (১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ) *তর্ককৌমুদী* নামে একটি লঘুকায় প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেছেন। ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসাদর্শনের উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর পিতার নাম মুদগল এবং তিনি ছিলেন কবি রুদ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। লোগাক্ষিভাস্কর বারাণসীতে বসবাস করতেন। তাঁর সময়কাল সপ্তদশ শতক বলে মনে করা হয়।[৫০]

৪.২.৩. **চতুর্থ শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থ :** যে গ্রন্থগুলিতে প্রয়োজন অনুসারে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শন শাস্ত্রের পদার্থের একত্রে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন - শশধর (১১২৫ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি)[৫১] *ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ* নামে এধরণের একটি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি চতুর্থ শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এই গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রতিপাদ্য কিছু প্রমুখবিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শেষানন্ত *ন্যায়সিদ্ধান্তদীপটীকা* নামে এই গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেন। বঙ্গীয় ঐতিহ্যানুসারে শশধর এবং মণিধর ছিলেন এমন দুই নৈয়ায়িক যাঁদের ব্যাপ্তিলক্ষণ ছিল অপরিবর্তিত। এঁদের ব্যাপ্তিলক্ষণকে সিংহব্যাঘ্রলক্ষণ বলা হয়।

এছাড়াও মাধবাচার্যের (১৩৩১-১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়)[৫২] *সর্বদর্শনসংগ্রহ*কে এই শ্রেণীর প্রকরণগ্রন্থ বলে মনে করা হয়। মাধবাচার্য তাঁর এই গ্রন্থে একত্রে ষোলোটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভিমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। সেগুলি হল - চার্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, আর্হত বা জৈনদর্শন, রামানুজ দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞ বা মধ্বদর্শন, নকুলিশপাশুপত দর্শন, শৈবদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, রসেশ্বর দর্শন, বৈশেষিক বা ঔলুক্য দর্শন, অক্ষপাদ বা ন্যায়দর্শন, জৈমিনিদর্শন, পাণিনি দর্শন, সাংখ্যদর্শন, যোগ বা পাতঞ্জল দর্শন এবং শাঙ্কর দর্শন। প্রতিটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়কে গ্রন্থকার নিজ বুদ্ধিমত্তায় সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা করেছেন। পাঠকসমাজে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। মাধবাচার্যের অন্যান্য রচনাগুলি হল - *মাধবীয়ধাতুবৃত্তি, জৈমিনীয় ন্যায়মালা, জীবন্মুক্তিবিবেক, শঙ্করবিজয়, পরাশরমাধব* প্রভৃতি। তিনি নিজ পরিচয়ে পরাশরমাধবের প্রারম্ভে বলেছেন -

"শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্তির্মাযনঃ পিতা।
সাযনো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধীসহোদরৌ॥
বৌধাযনং যস্য সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী।
ভারদ্বাজং যস্য গোত্রং সর্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ॥"[৫৩]

অর্থাৎ মাধবাচার্য ছিলেন মায়ন এবং সুকীর্তির পুত্র। তাঁর দুই সহোদর হলেন - সায়ন ও ভোগনাথ। এরূপ তিনি ছিলেন বৌধায়নসূত্র, ভরদ্বাজ গোত্র এবং যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ। সায়ন ও মাধব উভয়ই ছিলেন অসাধারণ সুপণ্ডিত এবং বিদ্যাবত্তার সাথে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ইতিহাসে মাধবাচার্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ।

পঞ্চম অধ্যায় :

তর্কভাষা গ্রন্থের মর্মার্থজ্ঞাপনে *তর্কভাষাপ্রকাশ, তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের অবদান

৫.০. শ্রীমদ্ কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* গ্রন্থাশ্রয়ে প্রণীত বিংশত্যধিক টীকা ও উপটীকাগুলির মধ্যে গোবর্ধনমিশ্র কৃত *তর্কভাষাপ্রকাশ,* চিন্নংভট্ট কৃত *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও মাধবদেব কৃত *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'তর্কভাষাপ্রকাশ' নামক টীকাটি *তর্কভাষা*বলম্বনে রচিত টীকাগুলির মধ্যে অতি প্রাচীন। এখনও পর্যন্ত এই টীকাটিকে *তর্কভাষার* প্রথম টীকাগ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় সম্পাদিত *তর্কভাষা* গ্রন্থের অনেক টীকা ও টিপ্পনীতে গোবর্ধনমিশ্রকে কেশবমিশ্রের শিষ্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অত এব এই টীকাটি গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

'তর্কভাষাপ্রকাশিকা' নামক টীকাটিও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ টীকা। চিন্নংভট্ট বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় হরিহরের পৃষ্ঠপোষকতায় এই টীকাটি রচনা করেছিলেন। গজাননশাস্ত্রী মুসলগাঁকর সম্পাদিত *তর্কভাষা* গ্রন্থের ভূমিকাতে বলা হয়েছে যে, এই টীকাটি দক্ষিণ-ভারতে খুবই জনপ্রিয়। টীকাটি সেখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। অত এব এই টীকাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'সারমঞ্জরী' নামক নবীন টীকাটিতে নব্য ন্যায়ের ভাষাশৈলী অনুসৃত হয়েছে। টীকাটির ব্যাখ্যাপদ্ধতি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে কেবলমাত্র পূর্বপক্ষরূপে বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের মত খণ্ডিত হয়নি। অধিকন্তু *তর্কভাষার* পূর্ববর্তী কিছু টীকাকারদের অভিমতও খণ্ডিত হয়েছে। মাধবদেব সেখানে গোবর্ধনমিশ্র, গৌরীকান্তসার্বভৌম, বলভদ্র প্রভৃতি টীকাকারদের কতিপয় বিষয় বিশ্লেষণ করে তার খণ্ডন করেছেন। অত এব সেদিক থেকে এই টীকাটিও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

তর্কভাষা গ্রন্থের অর্থোদ্ধারে এই টীকাত্রয়ের অবদান অপরিসীম। *তর্কভাষা* গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি টীকাকারগণ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বোধগম্য করে তোলার উত্তম প্রয়াস করে গেছেন সর্বক্ষণ।

বিশ্লেষণপূর্বক সেবিষয়ক কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল –

৫.১. *তর্কভাষা* গ্রন্থের মঙ্গলাচরণশ্লোকে বলা হয়েছে -

"বালোঽপি যো ন্যাযনযে প্রবেশমল্পেন বাঞ্ছত্যলসঃ শ্রুতেন।

সংক্ষিপ্তযুক্ত্যন্বিততর্কভাষা প্রকাশ্যতে তস্য কৃতে মযৈষা॥"[১]

অর্থাৎ যে অলস বালক স্বল্প শ্রবণ (অধ্যয়ন) করে, ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশে ইচ্ছা করে, তার জন্য আমার দ্বারা সংক্ষিপ্ত অথচ যুক্তি সমন্বিত *তর্কভাষা* প্রকাশিত হচ্ছে। শ্লোকস্থিত 'তস্য কৃতে' পদের 'কৃতে' অব্যয়টি যে 'তাদর্থে' প্রযুক্ত হয়েছে, তা বোঝাতে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার কাব্য ও ব্যাকরণ উভয়ের যুক্তি দিয়েছেন। যেমন - *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে এবিষয়ে জিজ্ঞাসাপূর্বক বলা হয়েছে - "কস্মৈ প্রকাশ্যতে? ইত্যত আহ - তস্য কৃতে ইতি। কৃতে ইত্যব্যয়ং তাদর্থ্যে। কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে, ইত্যত্র সাংধিবিহগ্রহকে কৃতম্ ইত্যেতত্তথা ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা ক্রিযত ইতি কৃচ্ছব্দঃ ক্বিবন্তঃ কর্মণি নিষ্পন্নঃ প্রযোজনবচনঃ। তথা চ তস্য কৃত ইতি তদর্থমিত্যর্থঃ।"[২]

এরূপ 'ন্যাযনয' পদটির অর্থ বোঝাতে, ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। 'নীয়তে জ্ঞাপ্যতে বিবক্ষিতোঽর্থো যেনেতি' - অর্থাৎ যার দ্বারা বাদীর বিবক্ষিত অর্থ জানা যায় - এরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা উৎপন্ন 'ন্যায়' বলতে, পঞ্চাবয়ব বাক্যযুক্ত অনুমানকে বোঝায়। আবার 'নীযতে প্রতিপাদ্যতে অনেন'- এরূপ ব্যুপত্তির দ্বারা উৎপন্ন 'ন্যায়' শব্দ ন্যায়শাস্ত্রকে বোঝায়। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - "কুত্রেত্যপেক্ষাযাং কথযতি - ন্যাযনয ইতি। নীযতে জ্ঞাপ্যতে বিবক্ষিতোঽর্থো যেনেতি করণব্যুৎপত্ত্যা ন্যাযোঽনুমানম্। অত এবোক্তং ভাসর্বজ্ঞেনানুমাননিরূপণাবসানে - 'সোঽযং পরমো ন্যাযঃ' ইতি। নীযতে প্রতিপাদ্যতে অনেন ন্যায ইতি নযশব্দঃ শাস্ত্রবচনঃ। ন্যাযনযো ন্যাযশাস্ত্রম্।"[৩] প্রসঙ্গত বক্তব্য যে টীকাকার এখানে ভাসর্বজ্ঞের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ভাসর্বজ্ঞ পঞ্চাবয়বযুক্ত পরার্থানুমান বাক্যকে 'পরমন্যায়' বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে ভাসর্বজ্ঞ *ন্যায়ভাষ্য*কারকে অনুসরণ করে কথাটি বলেছেন। কারণ, আমরা এর উল্লেখ *ন্যায়ভাষ্যে* প্রথম পাই।[৪] তবে সে যাই হোক, পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা হতে আমরা এই স্থলে প্রযুক্ত 'ন্যাযনয' শব্দের অর্থ বুঝতে পারি।

৫.২. *তর্কভাষা*কার ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রের উল্লেখপূর্বক গ্রন্থের আরম্ভ করেছেন। সেখানে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থতত্ত্বের জ্ঞান হতে নিঃশ্রেয়স লাভের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ ষোড়শ পদার্থতত্ত্বের সম্যগজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান ততক্ষণ পর্যন্ত হয় না, যতক্ষণ না এদের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা করা হয়। তিনি *ন্যায়ভাষ্য*কারকে অনুসরণ করে শাস্ত্রের ত্রিবিধ প্রবৃত্তির কথা বলেছেন - 'যদাহ ভাষ্যকার ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিরুদ্দেশলক্ষণং পরীক্ষা চেতি।'[৫]

তর্কভাষাপ্রকাশকার এই বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "তত্ত্বজ্ঞানমিহেতরভিন্নত্বেন জ্ঞানমনুমিতিরূপম্। তত্র চ পক্ষজ্ঞানার্থমুদ্দেশস্য হেতুজ্ঞানার্থং লক্ষণস্য হেতৌ ব্যভিচারাদিপরিহারার্থং পরীক্ষাযা উপযোগ ইতি ন প্রথমসূত্রমাত্রেণ তত্-সিদ্ধিরিতি ভাবঃ।"[৬] অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ইতর ভিন্ন। অর্থাৎ অন্য সকল জ্ঞান হতে ভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হওয়ায়, এটি অনুমিতিস্বরূপ। এক্ষেত্রে অনুমানের আকার হল 'তত্ত্বজ্ঞানমনুমিতিরূপং স্বেতরভিন্নত্বাত্'। তাই কেবলমাত্র প্রথম ন্যায় সূত্রের দ্বারা তা লাভ করা যায় না। উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারাই লাভ করা যায়। সেখানে পক্ষ জ্ঞানের জন্য উদ্দেশের, হেতু জ্ঞানের জন্য লক্ষণের এবং হেতুর ব্যভিচারাদি দোষ বিচারের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন।

অত এব পক্ষ, সাধ্য ও হেতুর যথাযথ জ্ঞানের দ্বারা যেমন - সদ্ বা অসদনুমানের নিরূপণ করা যায়। সেরূপ লক্ষণরূপে কথিত হেতুর দোষ বিচারের পরই আত্মাদি উদ্দেশে সেই লক্ষণের স্থাপনা করা যায়। শাস্ত্রের ত্রিবিধ প্রবৃত্তি বোঝাতে টীকাকার এখানে যে, পক্ষ, হেতুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়।

৫.৩. ***সারমঞ্জরী***কার *তর্কভাষাপ্রকাশ*কারের কথিত পূর্বোক্ত বিষয়টিকে আর একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন - "অত্রেতরভেদানুমিতৌ উদ্দেশস্য পক্ষজ্ঞানবিধযা লক্ষণস্য হেতুজ্ঞানবিধযা পরীক্ষাযাঃ ব্যাপ্তিগ্রাহকতযোপযোগঃ। লক্ষণবাক্যপ্রবিষ্টলক্ষ্যসমর্পকপদেনৈব পক্ষজ্ঞানসংভবাত্ ন্যুনাধিক সংখ্যাব্যবচ্ছেদস্য পরীক্ষাবাক্যেনৈব, পৃথিব্যাদিলক্ষণাতিব্যাপ্তিনিরাসেন ন্যুনসংখ্যাব্যবচ্ছেদেন অব্যাপ্তিনিরাসেনাধিকসংখ্যাব্যবচ্ছেদেন জাতত্বাত্ পার্থক্যেন উদ্দেশাত্মকশাস্ত্রপ্রযোজনং মৃগ্যম্।"[৭] অর্থাৎ সেখানে পক্ষ জ্ঞানের জন্য উদ্দেশের, হেতু জ্ঞানের জন্য লক্ষণের এবং ব্যাপ্তিগ্রহের জন্য পরীক্ষার উপযোগ হয়। লক্ষণ-বাক্যে প্রবিষ্ট লক্ষণঘটক পদের দ্বারা পক্ষজ্ঞান (লক্ষ্য বস্তুর জ্ঞান) সম্ভব হওয়ায়, ন্যূন ও অধিক সংখ্যা ব্যবচ্ছেদের জন্য পরীক্ষা-বাক্যের প্রয়োজন। পৃথিব্যাদি লক্ষণে ন্যূন সংখ্যা ব্যবচ্ছেদের দ্বারা অব্যাপ্তি

নিরাস হয় এবং অধিক সংখ্যা ব্যবচ্ছেদের দ্বারা অতিব্যাপ্তির নিরাস হয়। তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হওয়ায়, উদ্দেশাত্মক শাস্ত্রের (উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার) প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, *সারমঞ্জরী*তে এরূপ বহুবিধ দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে তিনি কেবল গ্রন্থকারোক্ত বিষয় নয়, তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পূর্ববর্তী টীকাকারের দ্বারা কথিত বিষয়েরও বিশ্লেষণ করেছেন।

৫.৪. 'সাধক' ও 'কারণ' পর্যায়বাচক শব্দ হওয়ায়, *তর্কভাষা*কার 'কারণ' বিষয়ে যথার্থ বোধ উপপত্তির জন্য 'অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্ব'কে কারণ বলেছেন। যেমন - পট কার্যের প্রতি তন্তু, তুরি, বেমা প্রভৃতি। যদিও পটের উৎপত্তি ক্ষণে দৈববশত **রাসভাদি**র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা নিয়ত নয়। আবার তন্তুর প্রতি **তন্তুরূপে**র নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্ব থাকলেও তা অন্যথাসিদ্ধ। যেহেতু পটরূপ উৎপন্ন করার পর তন্তুরূপ বিনষ্ট হয়। তাই পুনরায় তার কারণত্ব স্বীকার করলে কল্পনাগৌরব দোষ হয়। সেজন্য অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্ব হল কারণ এবং পশ্চাৎ বৃত্তিত্ব হল কার্য।

এখন বক্তব্য হল, এই অন্যথাসিদ্ধ কী? এবং এটি কত প্রকার? ইত্যাদি বিষয় সম্যগ্ ভাবে না জানলে, কারণ-বিষয়ে যথার্থ বোধ উৎপন্ন হয় না। তাই *তর্কভাষাপ্রকাশ*কার এই প্রসঙ্গে অন্যথাসিদ্ধ ও তার পাঁচ প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। 'অন্যথা' শব্দের অর্থ হল অন্যভাবে (অন্যেন প্রকারেণ) অর্থাৎ যা নিয়তপূর্ববর্তিভিন্নরূপে সিদ্ধ, তাই অন্যথাসিদ্ধ। গ্রন্থকার কথিত পূর্বোক্ত উদাহরণে রাসভাদি হল পঞ্চম এবং তন্তুরূপ হল দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ। সেখানে অপর অন্যথাসিদ্ধগুলি হল -

প্রথম অন্যথাসিদ্ধ : যে কার্যের প্রতি কারণের পূর্ববর্তিতা যে রূপ বা ধর্মের দ্বারা গৃহীত হয়, সেই কার্যের প্রতি সেই রূপ বা ধর্ম প্রথম অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেমন - ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডত্ব।

দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ : যে কার্যের সঙ্গে যে পদার্থটির অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু নিজ কারণকে অপেক্ষা করে, অন্বয়-ব্যতিরেক জ্ঞান হয়, সেই পদার্থটি হল দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ। যেমন - ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডরূপ।

তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ : অন্য কোন পদার্থের প্রতি পূর্ববর্তিতা সিদ্ধ হলে, যে পদার্থটি কোন কার্যের প্রতি পূর্ববর্তিতা গৃহীত হয়, সেই পদার্থটি তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেমন - ঘটকার্যের প্রতি আকাশ।

চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ : যে পদার্থটি প্রথমে কার্য জনকের পূর্ববর্তিরূপে জ্ঞাত হয়ে, পরে কার্যের পূর্ববর্তিতারূপে জ্ঞাত হয়, সেটি চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেমন - ঘটকার্যের প্রতি কুলালপিতা।

পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ : যে পদার্থটি কার্যোৎপত্তির নিয়ত পূর্ববর্তী, সেই নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ ভিন্ন যাবতীয় পদার্থ পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধরূপে জ্ঞাত হয়। যেমন - ঘটোৎপত্তির প্রতি রাসভাদি।

এভাবে ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার উক্ত পঞ্চ অন্যথাসিদ্ধের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে শেষে কারণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'এতদন্যথাসিদ্ধিপঞ্চকরাহিত্যে সতি নিযতপূর্ববর্ত্তিত্বমেব কারণত্বম্।'[৮]

অত এব গ্রন্থে পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের বর্ণনা না থাকায়, *তর্কভাষাপ্রকাশ*কারের এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা পাঠকের কারণ ও পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হয়। সুতরাং এবিষয়ে টীকাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৫.৫. *তর্কভাষা*কার প্রমার লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - "যথার্থানুভবঃ প্রমা। যথার্থ ইত্যযথার্থানাং সংশযবিপর্যযতর্কজ্ঞানানাং নিরাস। অনুভব ইতি স্মৃতের্নিরাসঃ।"[৯] প্রমা হল যথার্থ অনুভব। সংশয়, বিপর্যয় ও তর্কজ্ঞানের অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'যথার্থ' পদ এবং স্মৃতিজ্ঞানে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'অনুভব' পদ প্রযুক্ত হয়েছে। সংশয়াদি ভিন্ন জ্ঞানকে যথার্থজ্ঞান বলা হয়। কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপ কী? তা বোঝাতে ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার জিজ্ঞাসাপূর্বক বলেছেন - "ননু কিমিদং যথার্থম্। ন তাবদর্থসাদৃশ্যম। যথাকথঞ্চিদর্থসাদৃশ্যস্য ভ্রমেঽপি সত্ত্বাত্। প্রমেযত্বাদীনাং ভ্রমার্থে শুক্ত্যাদৌ ভ্রমে চ সত্ত্বাত্। সমানধর্মস্যৈব সাদৃশ্যশব্দার্থত্বাত্। সকলার্থবৃত্তিধর্মাণাং চ প্রমাযামপ্যভাবেনাসম্ভবাত্। রজতত্বাদীনাং রজতপ্রমাদাবভাবাদিতি চেন্ন। তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বস্য যথার্থত্বস্য প্রকৃতে বিবক্ষিতত্বাত্। তৎপ্রকারকানুভবমাত্রবিবক্ষাযাযং ভ্রমেঽতিব্যাপ্তিঃ। তদ্বারণায তদ্বতীতি। তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বে সতি তৎপ্রকারকত্বং তদর্থঃ। ভ্রমশ্চ রজতত্বাদিপ্রকারকত্বে সত্যপি ন রজতত্বাদিমদ্বিশেষ্যকঃ শুক্ত্যাদীনাং বিশেষ্যত্বাত্...।"[১০] অর্থাৎ 'যথা' শব্দটি সাদৃশ্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হলেও এখানে তদ্বতি তৎ প্রকারককেই বুঝতে হবে। তাই টীকাকার সকল প্রকার যুক্তি দিয়ে বিচার করে শেষে তদ্বতি তৎপ্রকারক বিষয়কে যথার্থ বলেছেন। যথার্থ অনুভবই প্রমা। কেবলমাত্র তৎপ্রকারক অনুভব বললে, ভ্রমজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয়, তদ্বতি পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

৫.৬. *তর্কভাষা*কার প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিরূপণের পর অনুমানের বর্ণনাবসরে 'অনুমান' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন - 'যেন হি অনুমীয়তে তদনুমানম্'। অর্থাৎ 'যার দ্বারা অনুমিতি করা যায়' - এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে করণ-বাচ্যে অনু-পূর্বক মা-ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় যোগ করে 'অনুমান' শব্দটি এখানে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হল অনুমিতির করণ।

আবার যদি ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হয়, তাহলে তার অর্থ হবে অনুমিতি। অর্থাৎ 'অনুমান' শব্দটি যেমন অনুমিতির করণকে বোঝায়, তেমনই আবার অনুমানের ফল অনুমিতিকেও বোঝায়। গ্রন্থকার এখানে অনুমিতির করণকে বুঝিয়েছেন।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার উক্ত বিষয়টি বোঝাতে, পাণিনি সূত্রের উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ করে বলেছেন - "নন্বনুমানশব্দঃ কিং ভাবসাধনঃ কিং কর্তৃসাধনো বা কর্মসাধনো বা করণসাধনো বাধিকরণসাধনো বা। ল্যুট্ চ (৩.৩.১১৪), কৃত্যল্যুটো বহুলম্ (৩.৩.১১৩) করণাধিকরণযোশ্চ (৩.৩.১১৭) ইতি সূত্রৈর্ভাবকর্তৃকর্মকরণাধিকরণেষু ল্যুটো বিহিতত্বাদিত্যা-শঙ্ক্যাভিমতাং ব্যুৎপত্তিং দর্শযতি - যেনেতি।"[১১]

'করণাধিকরণযোশ্চ' এই সূত্রানুসারে করণে, অধিকরণে এবং কারকে ল্যুট্ প্রত্যয় হয়। 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' এই সূত্রানুসারে কৃত্য-প্রত্যয়গুলি করণ, সম্প্রদান প্রভৃতি বহুল অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'ল্যুট্ চ'- এই সূত্রানুসারে নপুংসক অর্থে ল্যুট্ ও ক্ত-প্রত্যয় হয়। অত এব পূর্বোক্ত সূত্র ত্রয়ের দ্বারা ল্যুট্ প্রত্যয় বিহিত হওয়ায়, শঙ্কা হয় 'অনুমান' শব্দটি কীভাবে নিষ্পন্ন হয়? তাই গ্রন্থকার 'যেন হি...' ইত্যাদি ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন। এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'ল্যুট্ চ' সূত্র দ্বারা করণবাচ্যে নপুংসক লিঙ্গে 'অনুমান' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়।

৫.৭. 'লিঙ্গপরামর্শ' বলতে, লিঙ্গের তৃতীয় জ্ঞানকে বোঝায়। লিঙ্গ হল ব্যাপ্তি বলে যা অর্থের গমক হয়। 'লীনম্ অর্থং গময়তীতি লিঙ্গম্'। যা লীন হওয়া বিষয়ের বোধ করায়। ব্যাপ্তি হল সহচার দর্শন এবং স্বাভাবিক সম্বন্ধ। প্রথমে মহানসাদিতে ধূম ও বহ্নির ক্রমশ সহচারদর্শন হতে আমাদের 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ' - এরূপ লিঙ্গ জ্ঞান হয়। এটি হল প্রথম লিঙ্গজ্ঞান। এরূপ মহানসাদিতে ব্যাপ্য ধূমের জ্ঞান হওয়ার পর যদি পর্বতাদিতে অবিচ্ছিন্নমূল ধূমরেখা দর্শন হয়, তাহলে 'পর্বতঃ ধূমবান্' এরূপ দ্বিতীয় লিঙ্গজ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রথমবার ধূমদর্শনের ফলে ধূমে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়েছিল তা আত্মাতে সংস্কাররূপে ছিল। দ্বিতীয় বার ধূম দর্শনের ফলে ঐ ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে, 'ধূম বহ্নির ব্যাপ্য'- এরূপ ব্যাপ্তি স্বরণ হয়। তাই পর্বতাদি

পক্ষে যে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের জ্ঞান হয়, তা তৃতীয় লিঙ্গজ্ঞান। এই জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বলে। যেহেতু একসম্বন্ধির জ্ঞান অপরসম্বন্ধির জ্ঞানের স্মারক হয়।

এভাবে ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** টীকায় লিঙ্গপরামর্শের উক্ত বিষয়গুলি 'একসম্বন্ধিজ্ঞানম্ অপরসম্বন্ধিনং স্মারযতি -' ইত্যাদি 'ন্যায়' প্রয়োগ করে সুব্যাখ্যাত হয়েছে।[১২] যার ফলে গ্রন্থকারোক্ত বিষয়গুলি পাঠকের কাছে সহজেই বোধগম্য হয়।

৫.৮. *তর্কভাষা*কার **পৃথিবী** নামক দ্রব্যের বর্ণনাবসরে, পৃথিবীকে 'ঘ্রাণ-শরীর-মৃৎপিণ্ড-পাষাণ-বৃক্ষাদিরূপা' ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি পার্থিব 'ইন্দ্রিয়' বলতে, ঘ্রাণকে, 'বিষয়' বলতে, মৃৎপিণ্ড, পাষাণ, বৃক্ষ প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু এখানে 'শরীর' বলতে আমরা ঠিক কী বুঝবো? এবিষয়ে সংশয় থেকে যায়। শুধু মনুষ্য শরীরকে বুঝবো? নাকি অন্যান্য শরীরকেও বুঝবো? তা নিশ্চয় করা যায় না।

তাই উক্ত বিষয়টি অবধারণের জন্য ***সারমঞ্জরী***কার মনুষ্য লোকে বিদ্যমান সকল প্রকার শরীরের উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "শরীরং মনুষ্যলোকে। তদ্-দ্বিবিধম্ - যোনিজমযোনিজং চ। জরাযুজং মনুষ্যাণাম্। অণ্ডজং পক্ষাদীনাম্। অযোনিজম্ - স্বেদজোদ্ভিজ্জভেদেন দ্বিবিধম্। উদ্ভিজ্জং বৃক্ষাদীনাম্। স্বেদজং কৃম্যাদীনাম্।"[১৩] অর্থাৎ শরীর মূলত দুই প্রকার, যথা- যোনিজ এবং অযোনিজ। এই দুই প্রকার শরীর আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা - জরায়ুজ এবং অণ্ডজ। মনুষ্যাদি প্রাণীর শরীর জরায়ুজ এবং পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীর শরীর হল অণ্ডজ। এরূপ অযোনিজ শরীর উদ্ভিদজ এবং স্বেদজ। বৃক্ষ, গুল্ম, লতাদির শরীর হল উদ্ভিদজ এবং যুক, কৃমি ইত্যাদির শরীর হল স্বেদজ।

আপত্তি হতে পারে, 'বৃক্ষ' যদি পার্থিব শরীর হয়, তাহলে *তর্কভাষা*কার তাকে বিষয়রূপে উল্লেখ করলেন কেন? এর উত্তর হল - বৃক্ষ পার্থিব বিষয় হলেও মনুষ্যাদি শরীরের মত সকল প্রকার বৈশিষ্ট যুক্ত। আধুনিক বিজ্ঞানেও তা প্রমাণিত। অত এব বৃক্ষের জন্ম-মৃত্যু সবই সম্ভব। সুতরাং জন্ম হলে তো তাকে বিগ্রহ ধারণ করতে, হবে। তাকেও অবয়ব বিশিষ্ট হতে হবে। অত এব তারও শরীর স্বীকার করতে হবে। সুতরাং বৃক্ষ পার্থিব বিষয় হলেও তার শরীরকে পার্থিব শরীরই ধরতে হবে।

৫.৯. *তর্কভাষা*কার প্রাণবায়ুকে বায়বীয় বিষয়রূপে উল্লেখ করেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "প্রাণবায়ুস্তু শরীরাভ্যন্তরসঞ্চারী রসমলরুধিরাদিধাতু-প্রেরণাহেতুরেক এব মুখনাসিকাদিসঞ্চরণক্রিয়াভেদেন প্রাণাদিসংজ্ঞাপঞ্চকং লভতে। আদি শব্দেন বাহ্যবায়ুর্গৃহ্যতে।"[১৪] শরীরের অভ্যন্তরে সঞ্চরণশীল বায়ু হল প্রাণ। এই প্রাণবায়ু রস, মলাদি প্রেরণের হেতু হয়। সংখ্যায় একটি হলেও মুখনাসিকাদির সঞ্চরণ ক্রিয়া ভেদে প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান ভেদে পাঁচ প্রকার হয়। এখানে 'আদি' পদের দ্বারা বাহ্যবায়ুকেও গ্রহণ করতে হবে। টীকাকারে এরূপ বিশ্লেষণ হতে আমরা সহজেই বায়বীয় বিষয় সম্বন্ধে বুঝতে পারি।

৫.১০. প্রথম স্যন্দনের অসমবায়িকারণ হল দ্রবত্ব। কিন্তু স্যন্দন কী? কীভাবে তা সংঘটিত হয়? ইত্যাদি বিষয় বোঝাতে ***সারমঞ্জরী***কার বলেছেন - "স্যন্দনং জলাদেরুচ্চদেশাত্ নীচদেশসংযোগজনকক্রিযাবিশেষঃ। তস্যাসমবাযিকারণম্। ক্রিযাজনকে ইব দ্রব্যেঽতিব্যাপ্তি-বারণায তাদৃশাসমবাযিকারণবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতিমত্বং বোধ্যম্। দ্বিতীযস্যন্দনাসমবাযিকারণে বেগেঽতিব্যাপ্তিবারকমাদ্যপদমিত্যপি কশ্চিত্। দ্রবত্বং চক্ষুস্ত্বগিন্দ্রিযবেদ্যং প্রত্যক্ষসিদ্ধম্।"[১৫] 'স্যন্দন' শব্দের অর্থ হল প্রবাহ। জল প্রভৃতি তরল পদার্থের পর্বতাদি উচ্চ স্থান হতে, নিম্নে প্রবাহিত হওয়ার অসমবায়িকারণ হল 'দ্রবত্ব' নামক গুণ। তবে প্রথম স্যন্দন ব্যতীত দ্বিতীয়াদি স্যন্দনের ক্ষেত্রে বেগ নামক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। তাই দ্বিতীয়াদি স্যন্দনের অসমবায়িকারণ বেগ। চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ হওয়ায়, দ্রবত্ব গুণটি দ্বি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

৫.১১. *তর্কভাষা*কার পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু - এই চারটি দ্রব্যের বর্ণনার পর এদের উৎপত্তি ও বিনাশাদি বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন - 'তত্র পৃথিব্যাদীনাং চতুর্ণাং কার্যদ্রব্যাণামুৎপত্তিবিনাশক্রমঃ কথ্যতে।'[১৬]

এখন বক্তব্য হল যে, 'পৃথিব্যাদীনাম্' অথবা 'কার্যদ্রব্যাণাম্' বললেই তো পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুকে বোঝাত। তাহলে গ্রন্থকার 'চতুর্ণাম্' পদের প্রয়োগ করলেন কেন? এর উত্তর আমরা ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে, কেবল 'কার্যদ্রব্যাণাম্' বললে, আমরা তিনটি কার্য দ্রব্যেরই উপাদান গ্রহণ করতে পারবো। কারণ, 'বসন্তায কপিঞ্জলানালভেত' - এই ন্যায় অনুসারে বহুবচনের প্রয়োগ তিন সংখ্যাতেই পর্যবসান হয়। তাই গ্রন্থকার 'চতুর্ণাম্' পদের প্রয়োগ করেছেন। বিষয়টি *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে এভাবে

বিশ্লেষণ করা হয়েছে - "কার্যাণামিত্যুক্তে ত্রযাণামেবোপাদানং স্যাত্। বসন্তায কপিঞ্জলানালভেতেতি বহুবচনস্য ত্রিত্ব এব পর্যবসানাত্। অত উক্তং চতুর্ণামিতি। তাবত্যুক্তে কেষামিতি ন জ্ঞাযতে তদর্থং পৃথিব্যাদীনামিতি। বাধপরিহারার্থং কার্যাণামিত্যুক্তম্। নিত্যানামুৎপত্তিবিনাশযোরসম্ভবাত্।"[১৭] সুতরাং *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কারের এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রন্থকারের পূর্বোক্ত 'চতুর্ণাম্', 'কার্যদ্রব্যানাম্' ইত্যাদি পদগুলি প্রয়োগের কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

৫.১২. *তর্কভাষা*কার কর্ম পদার্থের বর্ণনাবসরে পাঁচ প্রকার ভেদের উল্লেখ করেছেন। যথা- উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন। তিনি কর্মের সামান্যলক্ষণ নিরূপণ করলেও বিশেষভাবে উৎক্ষেপণাদি পাঁচ প্রকার কর্মের পরিচয় প্রদান করেননি।

কিন্তু উৎক্ষেপণাদির বিশেষলক্ষণ নিরূপণ না হলে, সেই পদার্থগুলির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় না। তাই, ***সারমঞ্জরী***কার সেই বিষয়ক যথার্থ বোধ উপপত্তির জন্য সেগুলির বিশেষলক্ষণ প্রতিপাদন করেছেন - "উর্ধ্বদেশসংযোগাসমবাযিকারণম্ উৎক্ষেপণম্। অধঃসংযোগাসমবাযিকারণম্ অপক্ষেপণম্। অভিমুখদেশসংযোগাসমবাযিকারণম্ আকুঞ্চনম্। তির্যক্ সংযোগাসমবাযিকারণম্ প্রসারণম্। উত্তরদেশসংযোগাসমবাযিকারণং গমনম্।"[১৮] অর্থাৎ উর্ধ্ব, অধ, অভিমুখ, তির্যক্, উত্তর - তত্ তত্ দেশ সংযোগের প্রতি অসমবায়িকারণ উৎক্ষেপণাদি পঞ্চ কর্ম। যেমন - ধূমের ঊর্ধ্ব দেশে গমন দেখে তার অসমবায়িকারণরূপে উৎক্ষেপণ কর্মকে বুঝতে হবে। টীকাকারের এরূপ ব্যাখ্যা হতে, কর্ম পদার্থের উৎক্ষেপণাদি প্রকার বিষয়ে যথাযথভাবে জানা যায়।

৫.১৩. *তর্কভাষা* গ্রন্থটিতে জাতিঘটিত লক্ষণের প্রয়োগ বেশী। *সারমঞ্জরী*কার প্রায় প্রতিটি লক্ষ্যবস্তুতে বিদ্যমান, তত্ তত্ জাতি সিদ্ধির কথা বলেছেন। যেমন - *তর্কভাষা*কার আত্মত্ব জাতির দ্বারা আত্মার লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। কিন্তু ***সারমঞ্জরী***কার, সুখদুঃখাদির সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে উক্ত আত্মত্ব জাতি সিদ্ধির কথা বলেছেন। আত্মা হল সুখাদির সমবায়িকারণ। অত এব তাতে সমবায়িকারণতা বিদ্যমান। উক্ত কারণতা অবশ্যই কোন ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, যেহেতু তাতে কারণতাত্ব আছে। তাই উক্ত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে আত্মত্ব জাতিকেই স্বীকার করতে হবে। এখানে অনুমানের আকারটি এরূপ হবে - 'আত্মনিষ্ঠসমবায়িকারণতা কিঞ্চিৎধর্মাবচ্ছিন্না, কারণতাত্বাৎ, দণ্ডনিষ্ঠকারণতাবৎ'। এরূপ

*সারমঞ্জরী*কার দুঃখত্ব জাতিবিশিষ্ট পদার্থকে দুঃখ বলে, তার সিদ্ধি প্রসঙ্গে বলেছেন - 'দুঃখত্বং জাতিঃ প্রত্যক্ষত্বাদধর্মকার্যতাবচ্ছেদকত্বাচ্চ সিদ্ধা।'[১৯] এভাবে লক্ষ্যতাবচ্ছেদকরূপে তদ্ বস্তুনিষ্ঠ জাতি *সারমঞ্জরী*তে প্রতিপাদিত হয়েছে। গ্রন্থকার জাতিঘটিত লক্ষণ নির্বচন করলেও তার সিদ্ধি বিষয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু *সারমঞ্জরী*কার সেই বিষয়গুলি বিশেষভাবে প্রতিপাদন করেছেন।

৫.১৪. ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়, দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ, পৃথিব্যাদি নব দ্রব্য, রূপাদি চব্বিশ প্রকার গুণ ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট ক্রমে বর্ণনার কথা বলা হয়েছে। যেমন - আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের ক্রম-বিষয়ে বলা হয়েছে - **আত্মা** যেহেতু প্রধান, তাই প্রথমে তার উল্লেখ হয়েছে। কারণ, জীবের বন্ধন-মুক্তি-ভোগ ইত্যাদি বিষয়গুলি আত্মাকে অধিকার করে সম্পন্ন হয়। সেজন্য প্রমেয় পদার্থগুলির মধ্যে আত্মা প্রধান।

আত্মার পরে তার ভোগের আশ্রয় **শরীরের** কথা বলা হয়েছে। তারপর সেই ভোগের সাধন **ইন্দ্রিয়ের** কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের পর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা **অর্থের** কথা বলা হয়েছে। অর্থের পর তদ্বিষয়ক **বুদ্ধির** উল্লেখ হয়েছে। বুদ্ধির পর অন্তরিন্দ্রিয় **মনের** উল্লেখ হয়েছে। মনের পর জীবের শারীরিক, বাচিক ও মানসিক **প্রবৃত্তির** কথা বলা হয়েছে।

তারপর উক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তি হতে উৎপন্ন **দোষের** কথা বলা হয়েছে। প্রবৃত্তি হতে উৎপন্ন দোষের ফলে জীবের জন্মমৃত্যু সম্পন্ন হয়। সেজন্য দোষের পর **প্রেত্যভাবের** কথা বলা হয়েছে। 'শরীর' হতে 'দোষ' পর্যন্ত বিষয়গুলি ফলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই দোষের পর **ফলের** কথা বলা হয়েছে। একই ভাবে 'শরীর' হতে 'ফল' পর্যন্ত বিষয়গুলি দুঃখের সঙ্গে অনুষঙ্গবশত 'দুঃখ' নামে অভিহিত হওয়ায়, ফলের পর **দুঃখের** কথা বলা হয়েছে।দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির ফলে অপবর্গ লাভ হওয়ায়, সব শেষে **অপবর্গের** কথা বলা হয়েছে।

এভাবে পদার্থগুলি ক্রমবদ্ধভাবে আলোচিত হওয়ায়, সেই পদার্থগুলির পারম্পর্য জানা যায়। কিন্তু তর্কভাষা বা অন্য দুটি টীকাতে সেই বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়নি। কাজেই এক্ষেত্রে টীকাকারের গুরুত্ব বা অবদান অনস্বীকার্য।

৫.১৫. *তর্কভাষা*কার ন্যায়-বৈশেষিকের সমানতন্ত্রীয়তা প্রদর্শন করলেও প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থকে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভাবের কথা বলেননি। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ ন্যায়সম্মত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থকে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর তাই নব্য ন্যায়ের গ্রন্থগুলিতে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ ও প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের আলোচনা বেশী দৃষ্ট হয়।

সারমঞ্জরী নামক টীকাতে নব্য ন্যায়ের শৈলী অনুসৃত হওয়ায়, প্রসঙ্গ-ক্রমে সেই বিষয়টিও সুব্যাখ্যাত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে - "প্রত্যক্ষপ্রমাণস্য ইন্দ্রিযস্য দ্রব্যরূপত্বাত্, অনুমানাদীনাং জ্ঞানরূপত্বাত্ গুণত্বম্। প্রমেযস্য আত্মাদেঃ কস্যচিদ্ দ্রব্যত্বম, বুদ্ধ্যাদেঃ গুণত্বম্, অপবর্গস্য অভাবরূপত্বম্, সংশয়স্য গুণত্বম্, প্রযোজনস্য সুখদুঃখাভাবস্য চ গুণত্বমভাবত্বং চ, দৃষ্টান্তস্য মহানসাদেঃ যথাযোগং দ্রব্যগুণাদিরূপতা। সিদ্ধান্তস্যাঙ্গীকৃতপদার্থরূপস্য দ্রব্যাদিরূপতা, নিশ্চযরূপত্বে গুণত্বম্, অবযবানাং শব্দত্বাদ্ গুণত্বম্, তর্কস্য বিপরীতজ্ঞানরূপস্য গুণত্বম্, নির্ণযস্যাপি তথা, বাদাদিত্রযাণাং শব্দাত্মকানা শব্দত্বাত্ গুণত্বম্, এবং চ হেত্বাভাসাদিষু কশ্চিদ্ গুণরূপতা, কশ্চিদ্ অভাবরূপতা, এবং চ ক্রমেণোক্তষোড়শপদার্থানাং সপ্তপদার্থান্যতম-রূপেতিতি।"[২০]

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ - এই চার প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ দ্রব্যের অন্তর্গত। প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয় করণ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থর সংযোগ না হলে প্রত্যক্ষ হয় না। আর সংযোগ দুটি দ্রব্যের মধ্যে হয়। তাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্রব্যের অন্তর্গত। এরূপ অনুমিতির প্রতি 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' করণ, উপমিতির করণ 'সাদৃশ্যজ্ঞান' এবং শাব্দবোধের প্রতি করণ হল 'পদজ্ঞান'। তাই অনুমানাদি তিনটি প্রমাণ গুণের অন্তর্গত।

আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন - দ্রব্যের অন্তর্গত। অর্থ, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, দোষ, ফল, দুঃখাদি গুণের অন্তর্গত। অপবর্গে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা অবসান হওয়ায়, অভাবের অন্তর্গত। সংশয় গুণের অন্তর্গত। প্রয়োজন সুখ ও দুঃখের অবসান হওয়ায়, গুণ ও অভাবের অন্তর্গত।

মহানসাদি দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত দ্রব্যের অন্তর্গত। অবয়যব, তর্ক বাক্যাত্মক হওয়ায়, গুণের অন্তর্গত। এরূপ নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, ছল গুণের অন্তর্গত। পঞ্চ হেত্বাভাসের মধ্যে কিছু দ্রব্যের এবং কিছু গুণের অন্তর্গত।

এভাবে ক্রমে উক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থগুলিও দ্রব্য, গুণ ও অভাবের অন্তর্গত হওয়ায়, নব্য ন্যায়ের গ্রন্থগুলিতে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

*সারমঞ্জরী*কার বিচারপূর্বক সেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু *তর্কভাষা*কার বা অন্য দু-জন টীকাকার তা করেননি। এভাবে *তর্কভাষা* গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জ্ঞাপনের জন্য টীকাত্রয়ে এরূপ বিবিধ প্রয়াস লক্ষিত হয়। যা থেকে আমরা সহজেই টীকাত্রয়ের গুরুত্ব বা অবদান অনুধাবন করতে পারি।

ষষ্ঠ অধ্যায় :

*তর্কভাষা*সম্মত প্রমেয় পদার্থ নিরূপণে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনা

৬.০. আলোচ্য অধ্যায়টিতে গবেষণাকর্মের মুখ্যবিষয়টি পর্যালোচিত হয়েছে। শ্রীমদ্ কেশবমিশ্র তাঁর *তর্কভাষা* গ্রন্থটিতে কীভাবে ন্যায়সম্মত প্রমেয় পদার্থগুলি নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যাখ্যা করে, স্বাভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই বিষয়গুলি গোবর্ধনমিশ্রের *তর্কভাষাপ্রকাশ,* চিন্নংভট্টের *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও মাধবদেবের *সারমঞ্জরী* নামক টীকাত্রয়ের আলোকে তুলনামূলকভাবে এই অধ্যায়ে পর্যালোচিত হয়েছে।

৬.১. আত্মা : *তর্কভাষা*কার 'আত্মত্ব' সামান্যের দ্বারা **আত্মা** নামক প্রমেয়ের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। এই আত্মা স্বরূপত **শরীরেন্দ্রিয়াদি হতে ব্যতিরিক্ত, প্রতি শরীরে ভিন্ন, নিত্য, বিভু** এবং **মানসপ্রত্যক্ষগম্য**। গ্রন্থকার আত্মার লক্ষণ নিরূপণের পর তার এতাদৃশ স্বরূপগুলি প্রতিপাদন করেছেন। আত্মার লক্ষণ-বিচার ও স্বরূপ-নিরূপণ বিষয়ে টীকাত্রয়ে যে বিশেষত্বগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল –

প্রথমত,

আত্মলক্ষণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ***সারমঞ্জরী***কার প্রথমে আত্মত্ব জাতি প্রত্যক্ষের কথা বলেছেন। 'অহম্' 'অহম্' - এরূপ অনুগত প্রতীতির ফলে আত্মার মানসপ্রত্যক্ষ হয়। 'মানসপ্রত্যক্ষ' বলতে, যোগীপুরুষের যোগজ সন্নিকর্ষজন্য আত্মমনঃসাক্ষাৎকারকে বোঝায়। পূর্বোক্ত অনুগত প্রতীতির ফলে আত্মনিষ্ঠ জাতিরও প্রত্যক্ষ হয়। আবার আত্মত্ব জাতি সুখাদির সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপেও সিদ্ধ হয়। পরমাত্মাতে নিত্য সুখ, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণগুলি বিদ্যমান। তাই এই আত্মত্ব জাতি দ্বিবিধ আত্মাতেই সিদ্ধ হয়।[১] তবে অদৃষ্ট প্রভৃতি না থাকায়, পরমাত্মায় সুখাদি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু তা না হলেও সেখানে তাদৃশ যোগ্যতা থাকে। আর তাই পরমাত্মাতেও উক্ত আত্মত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথও সুখাদির সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে আত্মত্ব জাতি সিদ্ধির কথা বলে, উভয় আত্মাতে সেই জাতি বৃত্তিত্বের কথা বলেছেন।

তর্কভাষাপ্রকাশকারের মতে, প্রতিটি শরীরাবচ্ছেদে যদি ভিন্ন ভিন্ন আত্মা স্বীকৃত হয়, তাহলে 'অহম্' 'অহম্' - এরূপই অনুগত প্রতীতির ফলে আত্মত্ব জাতি সিদ্ধ হবে। এবিষয়ে

তিনি বলেছেন - "লক্ষণমত্রাত্মত্বমাত্রম্। তস্য জাতিত্বং বোধযিতুং সামান্যগ্রহণম্। সম্বন্ধবিশেষেণ চাত্মত্বস্য লক্ষণতাং সূচযিতুং মতুপ্... ননু তথাপি নাত্মত্বং জাতিরাত্মন ঐক্যাদত আহ। প্রতিশরীরমিতি।"[২] অর্থাৎ লক্ষণে 'সামান্য' পদটি 'জাতি' অর্থে গৃহীত হয়েছে। মতুপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা সমবায়সম্বন্ধে আত্মতে বিদ্যমান আত্মত্ব জাতি সূচিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আত্মত্ব জাতি সিদ্ধির জন্য গ্রন্থকার প্রতি শরীরে আত্মার ভিন্নতার কথা বলেছেন। কারণ, একব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম জাতির বাধক। আত্মা যদি একটি হয়, তাহলে তার জাতিত্ব সিদ্ধ হবে না। আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার আত্মলক্ষণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আত্মত্ব সামান্যবানের দ্বারা আত্মার লক্ষণ নিরূপণের উপযোগীতার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, এরূপ লক্ষণের দ্বারা সহজেই স্বজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থের ব্যবচ্ছেদ করা যায়।[৩]

দ্বিতীয়ত,

'প্রতিশরীরং ভিন্নঃ' - আত্মার এই স্বরূপটির দ্বারা ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার আত্মত্ব জাতি সিদ্ধির কথা বলেছেন। কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, গ্রন্থকার উক্ত বিশেষণটির দ্বারা একাত্মবাদীদের খণ্ডন করেছেন। কেননা, আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অনুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অন্য সকল জাগতিক বিষয় মিথ্যা। আকাশ এক হয়েও যেমন উপাধিভেদে ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেরূপ ব্রহ্ম এক হলেও অবিদ্যা প্রযুক্ত হলে জীবাত্মারূপে তার ব্যপদেশ হয়। ফলে তার সংসার ভোগ হয়। আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ সম্প্রদায় চেতন পদার্থ এবং অচেতন ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, তা স্বীকৃত হয়নি। তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, গ্রন্থকার পূর্বোক্ত বিশেষণটির দ্বারা একাত্মবাদী বেদান্তীদের অভিমত খণ্ডন করেছেন। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - "ব্রহ্মৈব তাবত্ স্বাবিদ্যযা সংসরতি স্ববিদ্যযা মুচ্যতে অবিদ্যোপহিতং ব্রহ্মৈব জীবরূপং ব্যপদিশ্যতে। ততশ্চ জীবব্রহ্মণোর্ঘটাকাশমঠাকাশবজ্জীবানাং ঘটাকাশমঠাকাশবৎ পরস্পরং ভেদাভাবাদাত্মৈকত্বং বদতামেকমেবাদ্বিতীযং ব্রহ্মেত্যাদিবচননিচযং প্রমাণীকুর্বতাং বেদান্তিনাং মতমপাকর্তুমাহ-প্রতিশরীরমিতি।"[৪] আবার ***সারমঞ্জরী***কারের মতে, আত্মা যদি একত্ববিশিষ্ট হয়, তাহলে আত্মার সুখাদি এবং বন্ধন বা মুক্তি ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। তাই প্রতি শরীরে আত্মার ভিন্নতার

কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "সর্বশরীরবৃত্ত্যাত্মন একত্বে সুখদুঃখাদিব্যবস্থা বদ্ধমুক্তব্যবস্থা ন স্যাত্। অতঃ প্রতিশরীরং ভিন্নঃ।"[৫]

তৃতীয়ত,

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে আত্মার বিভুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সেজন্য ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার অণু ও মধ্যমপরিমাণে দোষ দেখিয়ে, শেষে আত্মার বিভুত্ব প্রতিপাদন করেছেন। কারণ, আত্মাকে যদি আমরা অণুপরিমাণ স্বীকার করি, তাহলে তার অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রসঙ্গ আসবে। কেননা, অণুপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ সর্বদা অতীন্দ্রিয় হয়। এরূপ যদি মধ্যম বা দেহপরিমাণ স্বীকার করি, তাহলে পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু প্রভৃতি কল্পনা-গৌরব দোষ উপস্থিত হবে। আবার মধ্যম বা দেহপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ সাবয়বযুক্ত হওয়ায়, আত্মাতে অনিত্যত্বও প্রসক্ত হবে। কাজেই আত্মাকে পরমমহৎ বা বিভু পরিমাণ পদার্থরূপে স্বীকার করতে হবে। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশে* বলা হয়েছে - 'অণুপরিমাণত্বে চাতীন্দ্রিয়ত্বং মধ্যমপরিমাণত্বে পরমাণ্বাদিকল্পনাযাং গৌরবং স্যাদিতি মহাপরিমাণ ইতি ভাবঃ।'[৬] এভাবে বিভুত্ব প্রতিপাদনের পর টীকাকার আত্মার ঐ বিভুত্ব ধর্মটিকে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি হতে অতিরিক্তত্বের হেতুরূপে উল্লেখ করেছেন - "দেহাদিব্যতিরিক্তত্বে হেতুমাহ। **বিভুরিতি**।"[৭]

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকারের মতে, *তর্কভাষা*কার আত্মার **বিভুত্ব** প্রতিপাদন করায়, অণু ও মধ্যমপরিমাণবাদী রামানুজ ও জৈন সম্প্রদায়ের অভিমত খণ্ডিত হয়েছে। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - "অনুপরিমাণ আত্মেতি রামানুজমতানুসারিণঃ সংগিরন্তে। উপসংহরন্তি চ।

'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চানন্ত্যায কল্পতে॥' ইতি।

প্রদীপপ্রভাবৎসংকোচবিকাশবানাত্মা দেহানুরূপপরিমাণ ইতি ক্ষপনকাঃ সমাচক্ষতে তৎপক্ষদ্বয়ং প্রতিক্ষিপতি - বিভুরিতি।"[৮] অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ও তাঁর অনুগামীরা আত্মাকে অণুপরিমাণ স্বীকার করেছেন। আবার এ বিষয়ে তাঁরা 'বালাগ্রশতভাগ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে জৈনাচার্যগণ, আত্মাকে প্রদীপের প্রভার মত

সংকোচ ও বিকাশবান্ পদার্থরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, গ্রন্থকার এই সম্প্রদায় দুটিকে খণ্ডন করতে, আত্মার বিভুত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

সারমঞ্জরীকারের মতে, যেহেতু যোগজ অদৃষ্টজন্য একই সময়ে প্রত্যেক শরীরাবচ্ছেদে অবস্থানকারী একই আত্মা প্রতিটি শরীরে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হন। তাই একই আত্মার কায়ব্যূহরূপে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শরীরাবচ্ছেদে ভোগ সম্পন্ন হওয়ায়, তাকে **বিভু** বলা হয়েছে। এ বিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "একস্যানেকশরীরাবচ্ছেদেনৈককালে ভোগস্য কাযব্যূহত্বাদাহ - বিভ্বি-তি। তথা চ যোগজাদৃষ্টাত্ জন্যেষু এককালাবস্থাযিশরীরেষু ভিন্ন-ভিন্ন ইত্যর্থঃ...।"[৯]

চতুর্থত,

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার এই আত্মার নিত্য স্বভাবের দ্বারা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদেরও খণ্ডনের কথা বলেছেন - "ক্ষণভঙ্গুরং ক্ষণোদযং সকলযাত্রানির্বাহকং বিজ্ঞানমাত্রমাত্মেতি বৌদ্ধসিদ্ধান্তঃ। তং নিরাকরোতি - নিত্য ইতি।"[১০]

অত এব আত্মার লক্ষণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে টীকাত্রয়ের মধ্যে প্রথম যে বিশেষত্বটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল - *তর্কভাষাপ্রকাশ* ও *সারমঞ্জী*কার উভয়ই আত্মত্ব জাতি সিদ্ধির কথা বলেছেন। যদিও উভয়ের ব্যাখ্যান-পদ্ধতির মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। তবে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার সেই বিষয়ে কোন বিচার করনেনি।

আত্মার প্রতিশরীরে ভিন্নত্ব, বিভুত্ব, নিত্যত্ব - ইত্যাদি স্বরূপের দ্বারা *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার বেদান্তী, জৈন, বৌদ্ধদের খণ্ডনের কথা বললেও *তর্কভাষাপ্রকাশ* ও *সারমঞ্জরী*কার সেই স্বরূপগুলির দ্বারা কোন পূর্বপক্ষের খণ্ডনের কথা বলেননি।

আবার *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার আত্মার বিভুত্বের দ্বারা রামানুজ ও জৈনগণের খণ্ডনের কথা বললেও অণু বা মধ্যমপরিমাণ স্বীকার দোষগুলির উল্লেখ করেনি। তবে *তর্কভাষাপ্রকাশ*কার সেই বিষয়টি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

৬.২. শরীর : *তর্কভাষা*কার আত্মার **ভোগের আশ্রয় অন্ত্যাবয়বী**কে শরীর বলেছেন। কারণ, প্রতিটি শরীরাবচ্ছেদে আত্মার ভোগ সম্পন্ন হয়। তাই **শরীর** হল আত্মার ভোগের আশ্রয়। এর পর গ্রন্থকার ভোগের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - ভোগ হল **সুখদুঃখের অন্যতর অনুভব**।

কিন্তু পরমাত্মাতে উক্ত ভোগাশ্রয়ত্ব প্রসক্ত না হওয়ায়, গ্রন্থকার পরে বৈকল্পিকভাবে **চেষ্টার আশ্রয়কে** শরীর বলেছেন। এই 'শরীর' নামক প্রমেয় পদার্থ ব্যাখ্যানে টীকাত্রয়ে যে, বিশেষত্বগুলি লক্ষিত হয়, তা হল -

প্রথমত,

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার শরীরের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, লৌকিকে সুগন্ধি-চন্দন-মাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত বনিতাদির সেবা প্রভৃতি বিষয়ও ভোগ অর্থে প্রসিদ্ধ। কারণ, উক্ত বিষয়গুলির প্রাপ্তি 'সুখ' এবং অপ্রাপ্তি 'দুঃখ' নামে অভিহিত হয়। তাই ভোগ হল - স্বসমবেত সুখদুখসাক্ষাৎকার। স্ব-পদের দ্বারা আত্মাকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ আত্মাতে যে সুখাদির সাক্ষাৎকার হয়, তাই ভোগ। আর এই ভোগ যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মাতে সম্পন্ন হয়, তাই শরীর। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - "লোকে স্রক্-চন্দনবনিতাদিসেবাযাং ভোগশব্দস্য প্রসিদ্ধের্বিবক্ষিতমর্থমাহ - স্বসমবেতসুখদুঃখেতি। স্বসমবেতসুখদুঃখসাক্ষাৎকারো ভোগ ইত্যর্থঃ ... স ভোগো যৎসংযুক্তে আত্মনি সংজাযতে তদ্ভোগাযতনং শরীরমিত্যর্থঃ।"[১১] আবার ***সারমঞ্জরী***কার শরীরের লক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'অনুভবো লৌকিকঃ তথা চ সুখদুঃখান্যতরলৌকিকানুভবাবচ্ছেদকং শরীরম্।'[১২] অর্থাৎ 'অনুভব' শব্দের অর্থ লৌকিক। সেই লৌকিক অনুভবের বা সুখদুঃখের অন্যতর অনুভবের অবচ্ছেদকই হল শরীর।

তবে ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার শরীরের কোন লক্ষণ নিরূপণ করেননি। তিনি কেবল গ্রন্থকারোক্ত লক্ষণঘটক পদের ব্যাখ্যা করেছেন। *তর্কভাষা*কার সুখ বা দুঃখের অন্যতর সাক্ষাৎকারকে ভোগ বলেছেন। আমরা জানি সুখাদির অনুভবই ভোগপদবাচ্য। এখন প্রশ্ন হল গ্রন্থকার তাহলে সেখানে 'অন্যতর' পদের প্রয়োগ করলেন কেন? এর উত্তর আমরা *তর্কভাষাপ্রকাশে* পাই। সেখানে বলা হয়েছে - "যদ্যপ্যুভযানুভবত্বমসংভবি প্রত্যকানুভবত্বং প্রত্যেকাব্যাপ্তং তথাপি সাক্ষাৎকারসামগ্রীনিবিষ্টতাব্যাপ্যোৎপত্তিব্যাপ্যগুণত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্ত্বেন সুখদুঃখে অনুগম্য তদীযো লৌকিক সাক্ষাৎকারো ভোগ ইতি ভোগলক্ষণম্। লৌকিক পদেন অতীতাদিসুখদুঃখাদ্যনুভববারণম্।"[১৩] অর্থাৎ একই সময়ে একই আত্মাতে সুখ বা দুঃখ উভয় বিষয়ের অনুভব সম্ভব হয় না। তাই যদি কেবলমাত্র সুখদুঃখের অনুভবকে ভোগ বলা হয়, তাহলে যে সময়ে, যে আত্মাতে সুখের উপলব্ধি হয়, সেই সময়ে সেই আত্মাতে দুঃখ অনুভূত না হওয়ায়, সেই স্থলে ভোগের এই লক্ষণটি অব্যাপ্ত হবে। তাই উক্ত অব্যাপ্তি পরিহারের জন্য

গ্রন্থকার 'অন্যতর' পদটির প্রয়োগ করেছেন। টীকাকার 'প্রত্যকানুভবত্বং প্রত্যেকাব্যাপ্তং' এই অংশটির দ্বারা সেই বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। এরূপ 'লৌকিক' পদের দ্বারা অতীতাদি সুখাদি অনুভব বারণের কথা বলেছেন।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, ***সারমঞ্জরী***কারও ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে 'অন্যতর' পদের একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন - 'শরীরবিশেষে সুখস্যৈব দুঃখস্যৈবাধিকরণেঽব্যাপ্তিবারণায - অন্যতরপদম্।'[১৪] কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার এ বিষয়ে নীরব ছিলেন।

দ্বিতীয়ত,

*তর্কভাষা*কারোক্ত শরীরের উভয় লক্ষণে 'অন্ত্যাবয়বী' পদটি প্রযুক্ত হবে। কারণ, শরীরের সকল অবয়বসমূহের দ্বারা যেমন সুখাদি অনুভূত হয়, সেরূপ 'চেষ্টা' নামক ক্রিয়াটিও সংঘটিত হয়। তাই 'চেষ্টাশ্রয়' বলতে, 'চেষ্টাশ্রয় যা অন্ত্য অবয়বী' - এরূপ বুঝতে হবে। ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার পূর্বোক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "শরীরস্য লক্ষণান্তরমাহ - চেষ্টেতি। অত্রাপি চেষ্টাবদ্বৃত্ত্যন্ত্যাবযবিমাত্রবৃত্তিজাতিমত্ত্বং বিবিক্ষিতম্।"[১৫] ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার উক্ত বিষয়টি আর একটু বিস্তৃত করে বলেছেন - 'লক্ষণদ্বযেঽপি করচরণাদাবতিব্যাপ্তি-পরিহারার্থমন্ত্যাবযবীতি পদং প্রক্ষেপ্তব্যম্।'[১৬] অর্থাৎ হস্ত, পাদ প্রভৃতি অবয়বে অতিব্যাপ্তি পরিহারের জন্য *তর্কভাষা*কার যে অন্ত্যাবয়বী পদের প্রয়োগ করেছেন, তার ফলে উভয় লক্ষণেরই অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহার হয়। কিন্তু ***সারমঞ্জরী***কার 'অন্ত্যাবয়বী' শব্দের অর্থ - 'সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যান্তরের অনারম্ভক'[১৭] বললেও এই পদটির দ্বারা তিনি কোন প্রকার দোষ পরিহারের কথা বলেননি।

তৃতীয়ত,

*তর্কভাষা*কার ভোগ ও চেষ্টার আশ্রয়কে শরীর বলেছেন। আপত্তি হতে পারে, মৃত শরীরে তো কোন ভোগের উপপত্তি হয় না। আবার সেখানে চেষ্টাও থাকে না। সুতরাং মৃতশরীরে প্রসক্ত না হওয়ায়, উক্ত লক্ষণ দুটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। এই বিষয়টি তিনটি টীকাতেই পর্যালোচিত হয়েছে। যেমন - ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কারের মতে, প্রযত্নের কারণ আত্মমনঃসংযোগবদ্ ও চেষ্টাবদ্ অন্ত্যাবয়বিমাত্রজাতি যেখানে বৃত্তি হয়, তাদৃশ জাতিমত্ত্বই হল শরীর। আর এরূপ জাতিমত্ত্ব জীবিত বা মৃত উভয় শরীরে বিদ্যমান। তাই বলা হয়েছে - "...অত্রাপি চ চেষ্টাবদ্বৃত্ত্যন্ত্যাবযবিমাত্রবৃত্তিজাতিমত্ত্বং বিবক্ষিতম্। তেন ন মৃতশরীরে

অব্যাপ্তিঃ।"[১৮] কেননা, মৃতশরীরের হস্তাদি অবয়বগুলি কখনও বিলুপ্ত হয় না। অত এব অবয়ব থাকায়, সেখানেও অবয়বীত্ব ধর্মও থাকে। আর তাই সেরূপ 'অন্ত্যাবয়বীত্ব জাতিবিশিষ্ট' পদার্থকে যদি আমরা শরীর বলি, তাহলে সেটি জীবিত বা মৃত উভয় শরীরেই প্রসক্ত হয়।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার একটু অন্যভাবে সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, মৃত-শরীরটিও যেহেতু পূর্বে কোন আত্মার ভোগ বা চেষ্টার আশ্রয় ছিল। সেজন্য বর্তমানেও পূর্বের সেই ব্যবহার অনুসারে তাকে শরীর বলতে হবে। তাই বলা হয়েছে - "ন চ মৃতশরীরেষ্বব্যাপ্তিঃ। কদাচিৎকস্য তদাশ্রযত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।"[১৯] প্রায় একই ভাবে ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে ***সারমঞ্জরী***কারও বলেছেন - 'মৃতশরীরেঽপি পূর্বভোগসত্ত্বাত্ নাব্যাপ্তিঃ।'[২০] মৃতশরীরে চেষ্টাদি ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন না হলেও সেই শরীরে বিষ্ণুমিত্রত্বাদি জাতি বিদ্যমান। কেননা, সেই অবস্থাতেও তাতে 'বিষ্ণুমিত্রোঽযম্' - এরূপ প্রতীতি হয়।

৬.৩. ইন্দ্রিয় : *তর্কভাষা*কার ইন্দ্রিয়ের সামান্যলক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - যা শরীরের সংঙ্গে সংযুক্ত, জ্ঞানের করণ হয় এবং যা অতীন্দ্রিয়, তাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। সেজন্য এগুলি অতীন্দ্রিয়। আবার এগুলি শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রূপাদি জ্ঞানের করণ হয়। লক্ষণে কাল প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'জ্ঞানকরণ' পদ, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'শরীরসংযুক্ত' পদ এবং আলোক প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'অতীন্দ্রিয়' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। এভাবে *তর্কভাষা*কার স্বয়ং লক্ষণঘটক প্রতিটি পদের ব্যাবৃত্তি দেওয়ায়, সেই বিষয়ে টীকাত্রয়ে বিস্তৃত কিছু বলা হয়নি। এতদতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাখ্যায় টীকাত্রয়ে যে বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তা হল -

প্রথমত,

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকারের মতে, যদি করণমাত্রই ইন্দ্রিয় বলা হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি বৃক্ষছেদন প্রভৃতি ক্রিয়ার সাধন কুঠারাদিতে অতিব্যাপ্ত হবে। সেজন্য শুধুমাত্র **করণ** না বলে **জ্ঞানকরণ** বলা হয়েছে। আবার 'জ্ঞানকরণমতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিযম্' - এরূপ বললে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের ন্যায় অনুমিতির করণ ধূমাদিতেও ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি হয়। সেজন্য বলা হয়েছে **শরীরসংযুক্তম্**। এই বিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকায় বলা হয়েছে -

"করণমিন্দ্রিয়মিত্যুক্তে ছিদিক্রিয়াসাধনে কুঠারাদাবতিব্যাপ্তিঃ। তদর্থমুক্তম্ - **জ্ঞানেতি**। তাবত্যুক্তেঽনুমিতিকরণে ধূমাদাবতিব্যাপ্তিস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং **শরীরসংযুক্তমিতি**।"[২১]

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার এবিষয়ে প্রথমে পূর্বপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে, শেষে তার খণ্ডন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, 'শরীরসংযুক্তং জ্ঞানকরণমতীন্দ্রিযম্' ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি কালাদিতে অতিব্যাপ্ত হয়। কেননা, কাল প্রভৃতি পদার্থেও ব্যাপারবৎ জ্ঞানকারণত্ব বিদ্যমান। আবার, সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'সংযুক্ত' পদই যথোপযুক্ত। কারণ, সংযোগ দুটি দ্রব্যের মধ্যে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ দ্রব্যস্বরূপ নয়। অতএব সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'শরীর' পদের প্রয়োজন নেই।

বস্তুত এরূপ কথন যুক্তিসংগত নয়। কারণ, কাল প্রভৃতি পদার্থ কার্যমাত্রের প্রতি সাধারণকারণ হলেও অসাধারণ বা ব্যাপারবৎ কারণ কখনোই হয় না। অত এব লক্ষণে 'জ্ঞানকরণত্ব' পদটি সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, সেটি কালাদিতে অতিব্যাপ্ত হবে না। এরূপ সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তি পরিহারের জন্য 'শরীর' এবং 'সংযুক্ত' উভয় পদেরই প্রয়োজন আছে। যেহেতু ইন্দ্রিয়ে স্মৃতির অজনকত্ব ও জ্ঞানকারণীভূত মনঃসংযোগের আশ্রয়ত্ব বিদ্যমান। পূর্বোক্ত বিষয়টি *তর্কভাষাপ্রকাশে* এভাবে বলা হয়েছে - "শরীরসংযুক্তমিতি। নন্বিদং কালাদাবতিব্যাপকং তস্যাপি ব্যাপারবত্তেন জ্ঞানকরণত্বাত্। সন্নিকর্ষে অতিব্যাপ্তিবারণায চ সংযুক্তপদমেবোচিতং ন তু শরীরপদমপীতি চেন্ন। স্মৃত্যজনকজ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রযত্বস্য তত্ত্বাত্।"[২২]

আবার **সারমঞ্জরী**কার এই বিষয়ে *চিন্তামণি, লীলাবতীপ্রকাশ* ইত্যাদি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে, শেষে বস্তুতস্তু করে বলেছেন - "স্বপ্নবহ্নাঙ্যামতিপ্রসঙ্গবারণায - শরীরসংযুক্তেতি...কালাদাবতিব্যাপ্তিবারণায - জ্ঞানকরণপদম্। তদর্থশ্চ জন্যজ্ঞানত্বব্যাপ্যজাতি-ঘটিতধর্মাবচ্ছিন্নকার্যতাপ্রতিযোগিককারণতাবত্বম্। আলোকাদেরতিব্যাপ্তিবারণায - অতীন্দ্রিয-মিতি দিক্।" এরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এই স্থলে তিনি 'স্মৃত্যজনকজ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রযত্বম্ ইন্দ্রিযত্বম্।'[২৩] ইত্যাদি *লীলাবতীপ্রকাশে*-র ইন্দ্রিয়-লক্ষণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অত এব *সারমঞ্জরী* টীকায় উল্লিখিত এই লক্ষণ দেখে আমরা এরূপ বলতে পারি যে, *তর্কভাষাপ্রকাশ*কার যে, স্মৃতির অজনকত্ব ও জ্ঞানকারণীভূত মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব-কে আধার করে 'শরীরসংযুক্ত' পদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা *লীলাবতীপ্রকাশ* - এর অনুকরণ।

দ্বিতীয়ত,

দর্শনান্তরে ঘ্রাণাদি পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন ব্যতিরিক্ত বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ - এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়রূপে স্বীকৃত হয়েছে।[২৪] আবার কোন কোন সংখ্যাচার্যের মতে, ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বগিন্দ্রিয় সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হওয়ায়, চক্ষুরাদি অন্য সকল ইন্দ্রিয় স্বীকারের প্রয়োজন নেই। যেহেতু ত্বগিন্দ্রিয় শরীরের সর্বত্র থাকে, তাই চক্ষু স্থানগত ত্বগিন্দ্রিয়ই রূপের প্রত্যক্ষ করে। অত এব চক্ষু স্থানগত ত্বগিন্দ্রিয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়।

কিন্তু বিষয়োপলব্ধির সাধন না হওয়ায়, ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকগণ বাগাদিকে ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করেননি। যেমন - জয়ন্তভট্ট *ন্যায়মঞ্জরী*তে বলেছেন - উক্ত বাক্, পাণি, পাদাদিকে যদি কর্মেন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করা হয়, তাহলে কর্মেন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচের অধিক হবে। কেননা, তাহলে অন্ন প্রভৃতি খাদ্যবস্তু নির্গমনের জন্য কণ্ঠকেও কর্মেন্দ্রিয় বলতে হবে। এরূপ স্তন-আলিঙ্গনাদি ভার বহনের জন্য বক্ষকেও কর্মেন্দ্রিয় বলতে হবে। কিন্তু এই সকল ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য শরীরের যাবতীয় অবয়বকে আমরা ইন্দ্রিয় বলতে পারি না।[২৫]

এরূপ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণ-বিশেষের উপলব্ধি হয়, সেই ইন্দ্রিয় সেই গুণ উপলব্ধির সাধন নামে অভিহিত হয়। যেমন - গন্ধোপলব্ধির সাধন ঘ্রাণ, রসোপলব্ধির সাধন রসনা নামক ইন্দ্রিয় ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়গুলি প্রতিনিয়ত উৎকর্ষপ্রযুক্ত হয়ে নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। সকল ইন্দ্রিয়ে ত্বগিন্দ্রিয়ের সত্তা বর্তমান হওয়ায়, ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় হতে পারে না। কেননা, তাহলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়োপলব্ধি হত না। আর তা নাহলে অন্ধব্যক্তিরও স্পার্শন প্রত্যক্ষের দ্বারা রূপের উপলব্ধি হত, বাস্তবে তা হয় না। তাই *তর্কভাষা*কার ইন্দ্রিয়বিভাগপ্রসঙ্গে 'তানি চ...' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা ঘ্রাণাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়ের কথাই বলেছেন।

পূর্বোক্ত বিষয়ে ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** বা ***সারমঞ্জরী***কার কোন মত পোষণ না করেলও ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার সেই বিষয়ে স্বাভিমত ব্যক্ত করেছেন - "ননু ত্বচা সর্বেন্দ্রিযাধিষ্ঠানানি ব্যাপ্তানি। ততশ্চ ত্বগিন্দ্রিযং সর্বোপলম্ভকং ন স্পর্শমাত্রোপলম্ভকং সর্বার্থগ্রহস্য ত্বগিন্দ্রিযান্বযব্যতিরেকানুবিধাযিত্বাত্ তস্মাদেকমেবেন্দ্রিযমিতি পরমতং নিরাকর্তুমিন্দ্রিয-

ভেদমভিধত্তে - তানি চেতি।"[২৬] অত এব তাঁর মতে, পরমত খণ্ডনের জন্য *তর্কভাষা*কার ইন্দ্রিয় ভেদের কথা বলেছেন।

তৃতীয়ত,

সাংখ্যাদি শাস্ত্রে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গুলি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ - এরূপ ক্রম অনুসারে উক্ত হয়েছে।[২৭] কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে উক্ত ঘ্রাণরসনাদি ইন্দ্রিয়গুলি পৃথিব্যাদি পাঁচটি ভূত হতে উৎপন্ন হওয়ায়, সেই প্রকৃতিগত কারণে সেগুলি সেখানে পৃথিব্যাদি ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়েছে। *তর্কভাষা*তেও সেই ক্রম অনুসৃত হয়েছে। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার গ্রন্থকারের উক্ত অভিপ্রায় ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'ঘ্রাণাদেঃ পৃথিব্যাদিপ্রকৃতিকতযা পৃথিব্যাদ্যুদ্দেশক্রমাপেক্ষযা ঘ্রাণাদ্যুদ্দেশক্রমঃ।'[২৮]

আবার ***সারমঞ্জরী***কার সেই বিষয়টিকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, যদিও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রথম উদ্দেশের অন্য কোন কারণ নেই, তথাপি ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত নব দ্রব্যের যে ক্রম, সেই ক্রম এখানে অনুসৃত হয়েছে। কারণ, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গুলি পৃথিবী প্রভৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "যদ্যপি ঘ্রাণস্য প্রথমোদ্দেশে ন বীজম্, তথাপি দ্রব্যেষু পৃথিব্যাদিপঞ্চানাং ক্রমেণ উদ্দেশাত্ তেষু ঘ্রাণাদীনামন্তর্ভাবাত্। তথোদ্দেশ ইতি।"[২৯] কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার সেই বিষয়ক কোন প্রকার মত প্রকাশ করেননি।

৬.৪. অর্থ : কেশবমিশ্র 'অর্থ' নামক চতুর্থ প্রমেয় পদার্থটির স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - "অর্থাঃ ষট্-পদার্থাঃ। তে চ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবাযাঃ।"[৩০] অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় - এই ছয়টি ভাবপদার্থকে *তর্কভাষা*কার 'অর্থ' নামে অভিহিত করেছেন। তবে এই ছয়টি ভাবপদার্থের নিরূপণের পর, তিনি অভাব পদার্থেরও প্রতিপাদন করেছেন। যেহেতু অভাব পদার্থের জ্ঞান প্রতিযোগী পদার্থের জ্ঞানের অধীন।

***সারমঞ্জরী*কার** গ্রন্থকারের উক্ত আশয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন 'অর্থ' বলতে, ভাবপদার্থ এবং তা ছয়টি হওয়ায়, 'অভাব' সপ্তম পদার্থরূপে সূচিত হয়েছে - "অর্থাঃ ভাবাঃ। ষড়িতি কথনাদভাবঃ সপ্তমঃ।"[৩১] অত এব *তর্কভাষা*কার 'অর্থাঃ ষট্ পদার্থাঃ' বললেও দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের প্রতিপাদন যে তার অভিপ্রায় ছিল, তা বোঝা যায়। এই দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ প্রাচীন ন্যায়দর্শনেও স্বীকৃত হয়েছে । আচার্য বাৎস্যায়ন তাঁর *ভাষ্যে* প্রমেয় পদার্থের বর্ণনায় স্পষ্টত

তা উল্লেখ করেছেন। তাই পরবর্তীকালে নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ তাঁর *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন - 'এতে চ পদার্থাঃ বৈশেষিকপ্রসিদ্ধাঃ নৈযাযিকানামপ্যবিরুদ্ধাঃ প্রতিপাদিতশ্চৈবমেব ভাষ্যে।'[৩২] এছাড়া নব্য নৈয়ায়িকগণ গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থকে উক্ত সপ্ত পদার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩৩] সেজন্যে নব্য ন্যায়ের গ্রন্থগুলিতে উক্ত সপ্ত পদার্থ এবং প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়।

এই *তর্কভাষা*কার বলেছেন যে, প্রমাণাদি পদার্থগুলি যদিও দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, তথাপি প্রয়োজনবশত সেগুলির পৃথক্-ভাবে প্রতিপাদন আবশ্যক। স্বভাবতই প্রশ্ন হয়, গ্রন্থকারের এরূপ কথনের তাৎপর্য কী? এর উত্তরে ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার বলেছেন - "প্রযোজনবশাদিতি। তেনাপি রূপেণ তত্ত্বজ্ঞানস্যোপযোগিত্বাদিত্যর্থঃ।"[৩৪] অর্থাৎ সেই পদার্থগুলি সেই রূপে (পৃথক্-ভাবে) তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী হওয়ায়, সেগুলিকে সেই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আবার ***সারমঞ্জরী***কার গ্রন্থকারের উক্ত আশয়টি একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের অন্তর্ভাব দেখিয়ে বলেছেন যে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের অন্যতম রূপ হওয়ায়, যদিও এগুলির পার্থক্য কথন অনুচিত ; তথাপি উক্ত পদার্থগুলি নিজ নিজ স্বরূপ অনুসারে মোক্ষের উপযোগী হয়। সেজন্য প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ সেই পদার্থগুলিকে সেই ভাবে (পৃথক্ ভাবে) ব্যাখ্যা করেছেন। *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "...এবং চ ক্রমেণোক্তষোড়শপদার্থানাং সপ্ত-পদার্থান্যতমরূপতেতি ষোড়শপদার্থানাং পার্থক্যকথনমনুচিতম্, তথাপি তেন তেন রূপেণ জ্ঞানং মোক্ষোপযোগীতি উদ্দেশবশাদ্ জ্ঞাযতে ইতি তথা নিরূপণমিতি প্রাচীনাঃ।"[৩৫]

কিন্তু এই বিষয়ে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা *ন্যায়ভাষ্য*কারের অনুরূপ। প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থের দ্বারা ষোড়শ পদার্থকে বোঝানো গেলেও সংশয়াদি পদার্থ ন্যায়বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান। অত এব সেই পদার্থগুলির পৃথক্ প্রতিপাদিন না হলে, ন্যায়শাস্ত্র উপনিষদ্ প্রভৃতির মত অধ্যাত্মবিদ্যারূপে গণ্য হত। যার ফলে ন্যায়বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যহত হত। সেজন্য সেই পদার্থগুলি পৃথক্-ভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে। সেজন্য গ্রন্থকারও উক্ত পদার্থগুলির পৃথক্ আলোচনা করেছেন।

অত এব দেখা যাচ্ছে যে, আলোচ্য বিষয়টি ব্যাখ্যানে ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার গ্রন্থকারের অভিপ্রায়টি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলেছেন। আবার ***সারমঞ্জরী***কার প্রথমে ষোড়শ পদার্থকে সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভাব দেখিয়েছেন। তারপর উক্ত পদাথগুলি সম্পর্কে প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার *ন্যায়ভাষ্য*কারকে অনুসরণ করে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। টীকাকারদের এই ব্যাখ্যাপদ্ধতি হতে আমরা গ্রন্থকারের প্রমাণাদি পদার্থের পৃথক্ আলোচনা করার অভিপ্রায়টি যথাযথ ভাবে অবগত হতে পারি।

৬.৪.১. দ্রব্য : কেশবমিশ্র দ্রব্য পদার্থের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন -"তত্র সমবায়িকারণং দ্রব্যম্, গুণাশ্রযো বা। তানি চ দ্রব্যাণি পৃথিব্যপ্তেজোবাযুরাকাশকালদিগাত্মমনাংসি নবৈব।"[৩৬] অর্থাৎ তাঁর মতে, দ্রব্যাদি পদার্থগুলির মধ্যে সমবায়িকারণ হল দ্রব্য। অথবা যা গুণের আশ্রয়, তাই দ্রব্য। এখন বক্তব্য হল - 'উৎপন্নং সত্ দ্রব্যং ক্ষণং নির্গুণং তিষ্ঠতি'- এই নিয়ম অনুসারে উৎপত্তিকালীন দ্রব্যের প্রথম ক্ষণে গুণ থাকে না। সুতরাং গুণবিশিষ্ট পদার্থকে 'দ্রব্য' বললে, উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে লক্ষণটি অব্যাপ্ত হয়। বস্তুত তা নয়। কারণ, এক্ষেত্রে 'গুণবিশিষ্ট' শব্দের অর্থ বুঝতে হবে, 'গুণসমানাধিকরণসত্ত্বাভিন্নজাতিবিশিষ্ট'। সত্ত্বা এবং দ্রব্যত্ব - এই দুটি জাতি গুণের সমানাধিকরণে বৃত্তি হয়। অত এব 'সত্ত্বাভিন্নগুণসমানাধিকরণজাতি' বলতে,- দ্রব্যত্বকেই বোঝায়। আর ঐ দ্রব্যত্ব উৎপত্তিকালীন বা উৎপন্নবিনষ্ট উভয় পদার্থে বিদ্যমান। কাজেই দ্রব্যোৎপত্তির প্রথম ক্ষণে গুণাভাব থাকলেও এই অভাব ত্রৈকালিক না হওয়ায়, গুণোৎপত্তির যোগ্যতাবশত তা 'দ্রব্য' পদবাচ্য হয়।

তর্কভাষাপ্রকাশকার দ্রব্য-লক্ষণে 'সমবায়ী' পদের অর্থ করেছেন - 'কার্যসমবায়বত্'। অর্থাৎ কার্য-পদার্থ যেখানে সমবায়সম্বন্ধে থাকে।[৩৭] আপত্তি হতে পারে, 'সমবায়ি'-পদের দ্বারা যদি কার্যসমবায় বিবক্ষিত হয়, তাহলে 'কারণ' পদটি সেখানে ব্যর্থ হয়। বস্তুত তা ঠিক নয়। তাই এই বিষয়ে ***সারমঞ্জরী***কার আর একটু বিস্তৃত করে বলেছেন যে, 'সমবায়ি' পদের দ্বারা কার্যের এবং 'কারণ' পদের দ্বারা আশ্রয়ের বোধ হয়। অত এব সমবায়সম্বন্ধে যা কার্যের আশ্রয়, তাই সমবায়িকারণ। কেননা, নৈয়ায়িক মতে, কারণতা হল ফলোপাধায়ক এবং তা কার্যবিশিষ্ট। কিন্তু যেহেতু উক্ত কারণতা বা কার্যবত্ত্ব নিমিত্তকারণেও বিদ্যমান। সেহেতু 'সমবায়ি' পদের অর্থ করতে হবে, সমবাসম্বন্ধে যা কার্যবিশিষ্ট (কার্যের আশ্রয়) হয়। তাই এবিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "...কারণতা ফলোপহিতা ; সা চ কার্যবত্ত্বম্। তচ্চ

নিমিত্তকারণেঽপ্যস্তীতি অতঃ সমবায়িপদং সমবায়েন কার্যবদিত্যর্থঃ।"[৩৮] তবে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার এই বিষয়ে বিস্তৃত কোন আলোচনা করেননি। 'সমবায়ি' ইত্যাদি পদের দ্বারা গ্রন্থকার যে দ্রব্যের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন, তার উল্লেখ করেছেন মাত্র।

তার্কিক মতে, দ্রব্য সংখ্যা নয়টি। সেগুলি হল - পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। তবে, ভাট্ট মীমাংসকগণ উক্ত নব দ্রব্যের সঙ্গে 'তমঃ' এবং 'শব্দ' যোগ করে, মোট একাদশ প্রকার দ্রব্য স্বীকার করেছেন -

"পৃথিবী সলিলং তেজঃ পবনমানস্তমস্তথা।
ব্যোমকালদিগাত্মানো মনঃ শব্দ ইতি ক্রমাত্॥
একাদশবিধং চৈতত্ কুমারিলমতে মতম্।
যথাশাস্ত্রং বিধাস্যামস্তত্ স্বরূপনিরূপণম্॥"(মা. মে. উ., কা. ৬-৭)

অর্থাৎ সেখানে তমঃ বা অন্ধকারকে তাঁরা দশম দ্রব্যরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, শব্দ সমবায়সম্বন্ধে আকাশে উৎপন্ন হয়। অত এব সেটি আকাশের বিশেষগুণ। এরূপ তমঃ বা অন্ধকার হল আলোকের অভাবস্বরূপ। অত এব তা অভাব পদার্থ। কিন্তু মীমাংসক মতে, তমঃ বা অন্ধকারকে ভাবপদার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে। এই বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য হল -

"গুণকর্মাদিসদ্ভাবাদস্তীতি প্রতিভাসিতঃ।
প্রতিযোগ্যস্মৃতেশ্চৈব ভাবরূপং ধ্রুবং তমঃ॥"(মা. মে. উ., কা. ৯)

অর্থাৎ গুণ ও কর্মের সদ্ভাববশত প্রতিযোগী বস্তুর স্মরণ ছাড়াই অন্ধকার গ্রাহ্য হওয়ায়, তমঃ বা অন্ধকার নিশ্চিতরূপে ভাবপদার্থ। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, তমঃ পরমমহৎপরিমাণ তেজসামান্যের অভাবস্বরূপ। তাই তাঁরা পৃথিব্যাদি নয়টির অধিক দ্রব্য স্বীকার করেননি। সেজন্য *তর্কভাষা*কার উক্ত নব দ্রব্যের সঙ্গে 'এব'-কার যুক্ত করে, অন্ধকার ও শব্দের ব্যবচ্ছেদ করেছেন। তিনটি টীকাতেই সেই বিষয়গুলি প্রায় একই ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

উক্ত নব দ্রব্যের মধ্যে **পৃথিবী, অপ্, তেজ** এবং **বায়ু** - এই চারটি দ্রব্য নিত্য এবং অনিত্য ভেদে দুই প্রকার হয়। আবার চারটি দ্রব্যই শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে ভেদে তিন

প্রকার হয়। সেখানে নিত্য পরমাণুরূপ এবং অনিত্য কার্যরূপ। পৃথিব্যাদি নব দ্রব্য ব্যাখ্যানে টীকাত্রয়ে যে বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তা নিম্নে প্রদত্ত হল –

● **পৃথিবী :-**

*তর্কভাষা*কার 'পৃথিবীত্ব' সামান্যের দ্বারা **পৃথিবীর** লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। লক্ষণে 'সামান্য' পদটি পৃথিবীর স্বরূপকথনের জন্য উক্ত হয়েছে। গন্ধসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে উক্ত পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার এই পৃথিবীর লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'পৃথিবীত্বং নাম সামান্যবিশেষঃ পাকজরূপসমানাধিকরণ-দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ।'[৩৯] অর্থাৎ পৃথিবী হল পৃথিবীত্ব নামক সামান্যবিশেষ, যা পাকজ রূপের সমানাধিকরণবৃত্তি এবং দ্রব্যত্বসাক্ষাৎব্যাপ্য জাতি বিশিষ্ট।

*তর্কভাষা*কার পৃথিবীর স্বরূপপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, এটি কাঠিন্য এবং কোমলত্ব অবয়ব বিশিষ্ট। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, পৃথিবীর কোমলত্বাদি স্বরূপের প্রাভাকর মীমাংসকদিগের মত খণ্ডন হয়েছে। কারণ, তাঁরা স্থূলপৃথিবীর কার্যত্ব স্বীকার করেননি। সেজন্য সাবয়বত্বহেতুর দ্বারা তাঁদের খণ্ডন করতে, গ্রন্থকার পৃথিবীর এরূপ স্বরূপের কথা বলেছেন। এছাড়া কাঠিন্য, স্থৈর্য, নিবিড়ত্ব - এগুলি সমার্থক শব্দ। এরূপ কোমলত্ব, প্রশিথিলত্ব, প্রচয় ইত্যাদিও সমার্থক শব্দ। তাঁর মতে, 'কঠিনকোমলত্বাদি' - এই স্থলে 'আদি'-শব্দের দ্বারা অতিনিবিড়ত্ববিশিষ্ট পদার্থের বোধ হয়। এই স্থলে 'কাঠিন্যকোমলত্বাদিশ্চা-সাবাযবসংযোগবিশেষাশ্চেতি' - এরূপ সমানাধিকরণ সমাস বুঝতে হবে।

তবে ***সারমঞ্জরী***কার এবিষয়ে ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর মতে, অনেকে কাঠিন্যত্ব, কোমলত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট অবয়বগুলির যে সংগ্রহ বিশেষ, সেগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে পৃথিবী উৎপন্ন হয় - এরূপ অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ কঠিনত্ব, কোমলত্ব প্রভৃতি হল স্পর্শনিষ্ঠ গুণ। তাই *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "পৃথিবী কাঠিন্যকোমলত্বাদিরূপা যেঽবযবসংযোগবিশেষাঃ তৈঃ পরম্পরযা যুক্তেতি কশ্চিদাহ - তন্ন। কঠিনত্বকোমলত্বাদীনাং স্পর্শনিষ্ঠত্বাৎ... কিন্তু কঠিনকোমলস্পর্শবদবযবসংযোগবতীত্যর্থঃ।"[৪০] অর্থাৎ তাঁর মতে, পৃথিবী হল কঠিন, কোমলস্পর্শবত্ অবয়বের (সংযোগী) সংযোগবিশিষ্ট দ্রব্য।

এই পৃথিবীতে বিদ্যমান রূপাদি চতুর্দশ গুণের মধ্যে, নিত্যানিত্য - উভয় প্রকার পৃথিবীর রূপাদি চারটি গুণই পাকজ এবং অনিত্য হয়। আপত্তি হতে পারে, নৈয়ায়িকগণ

পিঠর-পাক স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁরা যদি পরমাণুরূপ নিত্যপৃথিবীতে বিদ্যামান রূপাদি গুণগুলির পাকজ স্বরূপের কথা বলেন, তার অর্থ এই যে তাঁরা পীলু-পাক স্বীকার করলেন। কিন্তু বস্তুস্থিতি তা নয়। কেননা, রূপাদি গুণগুলি কারণগুণপূর্বক হওয়ায়, তা কোন দোষের হয় না। তাই এ বিষয়ে নৈয়ায়িকদের নিয়ম বিচার্য বিষয় নয়। ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "যদ্যপি নৈযাযিকানাং পিঠরপাকান্যুপগমাৎসম্ভবত্যেবাবযবিনি পাকজং রূপাদি তথাপি নিযমো ন মন্তব্যঃ। কারণগুণক্রমেণাপি তেষামুৎপত্তেঃ।"[৪১] এই স্থলে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনায় পূর্বোক্ত বিশেষত্বগুলি লক্ষিত হয়।

● **অপ :** কেশবমিশ্র 'অপ্ত্ব–সামান্যের দ্বারা **অপ**-দ্রব্যের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। ***সারমঞ্জরী***কার এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "অপ্ত্ব-সামান্যেতি। জলত্বজাতিরনুগতপ্রত্যক্ষসিদ্ধা। তদবচ্ছিন্নজনকতাবচ্ছেদকতযা জলত্বং সর্বজলসাধারণম্। তত্ জল-লক্ষণম্।"[৪২] অপ্ত্ব বা জলত্ব জাতি দুই ভাবে সিদ্ধ হয়। প্রথমত, স্নেহ যেহেতু জলের বিশেষগুণ, তাই অনিত্য স্নেহের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে অনিত্য জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, অনিত্য জলের কারণতা নিত্য ও অনিত্য উভয় জলে বিদ্যমান হওয়ায়, অনিত্য জলের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপেও জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয়।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার অপ্-দ্রব্যের লক্ষণ করেছেন - 'অপ্ত্বং নাম শীতস্পর্শবদসমবেতত্বরহিতং স্পর্শরহিতসমবেতত্বরহিতম্।'[৪৩] জলের বিশেষগুণ হল শীতস্পর্শ। অর্থাৎ যা শীতস্পর্শ যুক্ত, জল ভিন্ন দ্রব্যত্ব রহিত, স্পর্শ (উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত) ভিন্ন গুণত্ব রহিত জাতি হল অপ্ত্বং বা জলত্ব জাতি। আর এই জাতিবিশিষ্ট পদার্থই হল জল।

এই অপ্-দ্রব্যে গন্ধ ভিন্ন পৃথিবীর সকল গুণই থাকে। অধিকন্তু স্নেহগুণ যোগ হয়। চতুর্দশ গুণের মধ্যে, জলে অভাস্বর শুক্লরূপ, মধুর-রস এবং সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব বিদ্যমান। এই অপ্-দ্রব্যে রূপাদি গুণবৃত্তি বিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার বৈশেষিক সূত্র উপস্থাপনপূর্বক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

তবে ***সারমঞ্জরী***কার সেই বিষয়ে বিস্তৃত কোনো আলোচনা না করলেও জলে বিদ্যমান পার্থিব অংশের জন্য যে জলে কঠিনত্বের প্রতীতি হয় এবং গন্ধগুণের উপলব্ধি হয়, সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন - "জলত্বেঽপি পার্থিবভাগবশাত্ কঠিনত্বপ্রতীতি... জলে গন্ধভানং পৃথিবীগন্ধান্বযানুবিধানাত্ পরম্পরযা গন্ধাশ্রযসংযোগেন দ্রষ্টব্যম্।"[৪৪]

এই স্থলে তুলনামূলক আলোচনায় *তর্কভাষপ্রকাশিকা* ও *সারমঞ্জরী*র মধ্যে পূর্বোক্ত পার্থক্যগুলি দৃষ্ট হলেও মূল যে বিষয়টি লক্ষিত হয়, তা হল - ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** টীকাতে অপ-দ্রব্যের কোনো প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মনে হয়, টীকাকার এবিষয়ে গ্রন্থকারের আলোচনাকেই যথোপযুক্ত বলে মনে করেছেন।

● **তেজ :** কেশবমিশ্র 'তেজস্ত্ব' সামান্যের দ্বারা **তেজের** লক্ষণ নিরূপণ করে, ক্রমে তেজদ্রব্যের স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "তেজস্ত্বসামান্যবত্ তেজঃ। চক্ষুঃ শরীর-সবিতৃ-সুবর্ণ-বহ্নি-বিদ্যুদাদিপ্রভেদম্। দিব্যং ভৌমমুদর্যমাকরজঞ্চেতি।"[৪৫]

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকারও 'তেজস্ত্ব' সামান্যের দ্বারা তেজের লক্ষণ করলেও তাঁর লক্ষণ ভিন্ন প্রকৃতির - 'তেজস্ত্বং নাম উষ্ণস্পর্শবদ-সমবেতত্বরহিতস্পর্শরহিতসমবেতত্বরহিতং জাতিঃ।'[৪৬] উষ্ণস্পর্শযুক্ত, তেজভিন্ন দ্রব্যত্ব রহিত, স্পর্শ (শীত-অনুষ্ণাশীতস্পর্শ) ভিন্ন গুণত্বরহিত জাতি হল তেজস্ত্ব জাতি। আর এই তেজস্ত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হল তেজ।

আবার ***সারমঞ্জরী***কার উষ্ণস্পর্শের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে তেজস্ত্ব জাতি সিদ্ধির কথা বলেছেন - 'তেজস্ত্বম্ উষ্ণস্পর্শসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতযা সিদ্ধা জাতিঃ।'[৪৭]

এই তেজে রূপ, স্পর্শ, সংখ্যাদি এগারোটি গুণ থাকে। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার বৈশেষিকসুত্র উল্লেখপূর্বোক উক্ত একাদশ গুণের পরিচয় দিতে বলেছেন - "তেজো রূপস্পর্শবদিতি সূত্রম্। ত্রপুসীসলৌহরজতসুবর্ণানাং তৈজসামগ্নিসংযোগাত্ দ্রবত্বমড্ডিঃ সামান্যমিতি ...।"[৪৮] কিন্তু ***সারমঞ্জরী***তে তেজের উক্ত একাদশ প্রকার গুণের উল্লেখ থাকলেও সেভাবে বিশ্লেষণপূর্বক বলা হয়নি।

এরূপ ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার *প্রশস্তপাদভাষ্য ন্যায়কন্দলী* ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়ে দিব্য, ভৌম, উদর্য এবং আকরজ - এই চার প্রকার তৈজস বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ***সারমঞ্জরী***তে উক্ত দিব্যাদি তৈজস বিষয়ের উল্লেখ থাকলেও সেরূপ কোন বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় না। আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার সুবর্ণের তৈজসত্ব সিদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন বিষয় ব্যাখ্যা করেননি। মনে হয় অন্যান্য বিষয়ে তিনি গ্রন্থকারের বর্ণনাকে সহজবোধ্য বলে মনে করেছেন।

● **বায়ু :** কেশবমিশ্র বায়ুত্ব অভিসম্বন্ধবান্ পদার্থকে **বায়ু** বলেছেন। 'অভিসম্বন্ধ' শব্দের অর্থ- 'অভিমত সম্বন্ধ'। এই স্থলে উক্ত অভিমত সম্বন্ধটি হল সমবায়। কেননা বায়ুত্ব জাতি সমবায়সম্বন্ধে বায়ুতে থাকে। অত এব লক্ষণোক্ত 'বায়ুত্ব অভিসম্বন্ধবান্' বলতে, 'বায়ুত্বসমবাযবান্' - এরূপ বুঝতে হবে। ***সারমঞ্জরী***কার গ্রন্থকারের উক্ত আশয়টি বোঝাতে বলেছেন - 'বায়ুত্বসমবাযবানিতি লক্ষণম্ অভিসম্বন্ধবাচকেন সমবাযাভিধানম্।'[৪৯]

আপত্তি হতে পারে - 'অভিসম্বন্ধ' পদটির দ্বারা সমবায়ের অভিধান হলেও বায়ুর এই লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ প্রসক্ত হয়। যেহেতু ন্যায় ও বৈশেষিকদের মতে, সমবায় এক। অত এব বায়ুত্বের সমবায় ও সত্ত্বাজাতির সমবায়ও এক। তাহলে 'বায়ুত্ব-সমবায়বিশিষ্ট পদার্থ'কে যদি বায়ু বলা হয়, তাহলে সেই লক্ষণটি সত্ত্বা-জাতির আশ্রয় দ্রব্য, গুণ ও কর্মেও অতিব্যাপ্ত হয়। তাই 'বায়ুত্বসমবায়' এর অর্থ বুঝতে হবে - 'বায়ুত্বপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়'। তাহলে আর কোন বিপ্রতিপত্তির আশঙ্কা থাকবে না। কারণ, বায়ুত্ব-প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায় কেবলমাত্র বায়ুতেই থাকবে।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার বায়ুত্বজাতির দ্বারা বায়ুদ্রব্যের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন - 'বাযুত্বং নাম রূপসমানাধিকরণত্বরহিতস্পর্শবদসমবেতত্বরহিতস্পর্শরহিতসমবেতত্বরহিতম্।'[৫০] রূপের সঙ্গে একই অধিকরণে যা থাকে, তা বায়ুতে থাকে না, বায়ুভিন্ন দ্রব্যে থাকে। কারণ, বায়ু রূপরহিত দ্রব্য। অর্থাৎ 'রূপসমানাধিকরণত্বরহিত' বলতে, বাযুভিন্ন দ্রব্যত্ব রহিত। বায়ুতে রূপের সমানাধিকরণত্ব রহিত থাকে। 'স্পর্শবদসমবেতত্বরহিত' বলতে, স্পর্শযুক্ত (অনুষ্ণাশীত), স্পর্শ ভিন্ন গুণত্বরহিত। 'স্পর্শরহিতসমবেতত্বরহিত' বলতে, উষ্ণ ও শীতস্পর্শগুণ রহিত। অত এব যা বায়ুভিন্ন দ্রব্যত্বরহিত, অনুষ্ণাশীত-স্পর্শযুক্ত এবং উষ্ণ ও শীতস্পর্শগুণ রহিত, তাই বায়ু।

এখন বক্তব্য হল - বায়ুত্ব জাতি যদি সিদ্ধ না হয়, তাহলে সেই জাতির দ্বারা বায়ুর লক্ষণ নিরূপণ যুক্তি সংগত হয় না। তাই এই বিষয়ে বক্তব্য হল, বিজাতীয় নানা স্পর্শের দ্বারা বায়ুর অনুমান হওয়ায়, প্রথমে সেই বিজাতীয় নানা স্পর্শের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে জন্যবায়ুত্বজাতির সিদ্ধি হবে। তারপর সেই জন্যবায়ুত্বের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে বায়ুত্বজাতির সিদ্ধি হবে। আর এই জাতি জন্য ও অজন্য সকল বায়ুতে বিদ্যমান। ***সারমঞ্জরী***কার পূর্বোক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে চার প্রকার জাতি সিদ্ধির কথা

বলেছেন - "বিলক্ষণস্পর্শেন বাযোরনুমানাদ্ বিলক্ষণস্পর্শকারণতাবচ্ছেদকতযা বাযুত্বজাতিসিদ্ধিঃ। জন্যবাযৌ তস্যা কার্যমাত্রবৃত্তিতযা তদবচ্ছিন্নং প্রতি কারণতাবচ্ছেদকতযা, সকলবাযৌ বাযুত্বজাতিসিদ্ধিরপরা। বিলক্ষণস্পর্শে কার্যতাবচ্ছেদকতযা একত্বজাতিসিদ্ধিঃ তদবচ্ছিন্নঃ জনকতাবচ্ছেদকতযা সলকবাযুস্পর্শে জাত্যন্তরসিদ্ধিরিতি জাতিচতুষ্টযসিদ্ধিমাহুঃ।"[৫১]

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, ***তর্কভাষা***কার বায়বীয় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের কথা বললেও শরীরের কথা বলেননি - 'ত্বগিন্দ্রিয-প্রাণ-বাতাদি-প্রভেদঃ।'[৫০] তবে বাযুলোকে প্রসিদ্ধ শরীরকে বায়বীয় শরীর বলা হয়। আর এই শরীর অযোনিজ। এবিষয়ে *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে বলা হয়েছে - 'তত্র শরীরমযোনিজং পিশাচাদীনাম্।'[৫৩]

*তর্কভাষা*কার বায়ুর দ্রব্যত্ব সিদ্ধির জন্য স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ - এই নয়টি গুণবৃত্তিত্বের কথা বলেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার বৈশেষিক সূত্রোল্লেখপূর্বক স্পর্শ ও বেগাদির বায়ুবৃত্তিত্বের কথা বলেছেন - "বাযুঃ স্পর্শবানিতি সূত্রেণ স্পর্শসিদ্ধিঃ অরূপিষ্বচাক্ষুষাণীতি সপ্ত-সংখ্যাদযো গুণাঃ। তৃণে কর্মবাযুসংযোগাদিতি বেগসিদ্ধিরিতি ভাবঃ...।"[৫৪]

নব্য নৈয়ায়িক ও মীমাংসকগণ বায়ুর ত্বাচ-প্রত্যক্ষ স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের মতে, বায়ু রূপরহিত দ্রব্য হওয়ায়, তার প্রত্যক্ষ হয় না। তাঁরা বায়ুকে অনুমেয় পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন। *তর্কভাষা*কার প্রাচীন মতানুসারে স্পর্শাদির দ্বারা অনুমানের কথা বলেছেন। 'আদি' পদের দ্বারা শব্দ, ধৃতি, কম্পন প্রভৃতি বিষয়কেও বুঝতে হবে। এরপর গ্রন্থকার পরিশেষ অনুমানের দ্বারা বায়ুর শব্দগুণত্ব সিদ্ধ করেছেন - "তথাহি যোঽযং বাযৌ বাতি অনুষ্ণশীতস্পর্শ উপলভ্যতে স গুণত্বাদ্ গুণীনমন্তরেণ অনুপপদ্যমানো গুণিনমনুমাপযতি। গুণী চ বাযুরেব। পৃথিব্যাদ্যনুপলব্ধেঃ...।"[৫৫] *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* ও *সামঞ্জরী* উভয় টীকাতেই সেই বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

এই স্থলে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনায় প্রথমে যে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল *তর্কভাষাপ্রকাশ*কার অপ-দ্রব্যের মত, বায়ুরও কোন ব্যাখ্যা দেননি। অর্থাৎ তিনি গ্রন্থকারোক্ত আলোচনাকে যথোপযুক্ত বলে মনে করেছেন।

*তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার বায়ুর একটি স্বতন্ত্র লক্ষণ নিরূপণ করলেও *সারমঞ্জরী*কার সেই বিষয়ে নীরব ছিলেন। আবার *সারমঞ্জরী*কার নানা ভাবে বায়ুত্বজাতি সিদ্ধির কথা বললেও *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার সেই বিষয়ে নীরব থেকেছেন। এরূপ *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার বৈশেষিক সূত্রোল্লেখপূর্বক স্পর্শাদি গুণপ্রসিদ্ধির কথা বলেছেন। কিন্তু *সারমঞ্জরী*কার বায়ুর স্পর্শাদি নবগুণের উল্লেখ করেছেন মাত্র। তিনি সেভাবে সেগুলির প্রসিদ্ধির কথা বলেননি। তবে, উভয় টীকাতে যুক্তিপূর্বক বায়ুর প্রামাণ্য নিরূপিত হয়েছে।

● পৃথিব্যাদি কার্য দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশক্রম :

*তর্কভাষা*কার পৃথিব্যাদি চারটি কার্যদ্রব্যের স্বরূপ আলোচনার পর এদের উৎপত্তি ও বিনাশক্রম, পরমাণুর সিদ্ধি, দ্ব্যণুকাদির অবয়বনিয়ম প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন।

পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশত দুইটি সজাতীয় পরমাণু ক্রিয়াদ্বারা সংযুক্ত হলে, দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। এই দ্ব্যণুকের প্রতি উক্ত পরমাণু দুটি হল সমবায়িকারণ। এরূপ উভয়ের সংযোগ অসমবায়িকারণ এবং অদৃষ্ট প্রভৃতি হল নিমিত্তকারণ।

একই ভাবে তিনটি সজাতীয় দ্ব্যণুক ক্রিয়াদ্বারা সংযুক্ত হলে, ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এই ত্রসরেণু ছয়টি পরমাণুর সমষ্টি হওয়ায়, মহৎপরিমাণবিশিষ্ট হয়। পূর্বোক্ত প্রকারে এখানেও ত্রিবিধ কারণ প্রযুক্ত হয়। তাই গ্রন্থকার বলেছেন - 'শেষং পূর্ববত্'। গ্রন্থকার যেহেতু আর পূর্বোক্ত কারণগুলির কথা বলেননি, তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার সেই বিষয়টি বোঝাতে বলেছেন - "শেষমিতি। সংযোগাদীনামসমবাযিকারণত্বাদিত্যর্থঃ।"[৫৬]

এরপর চারটি ত্রসরেণু ক্রিয়াদ্বারা সংযুক্ত হলে, চতুরণুক উৎপন্ন হয়। এই চতুরণুক থেকে অন্য স্থূলতর পদার্থ উৎপন্ন হয়। আবার সেই স্থূলতর পদার্থ থেকে অন্য স্থূলতম পদার্থ উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন হতে হতে ক্রমে মহদ্-পৃথিবী, মহদ্-জল, মহদ্-অগ্নি, মহদ্-বায়ু উৎপন্ন হয়।

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল - আচার্য প্রশস্তপাদ প্রথমে সংহারের কথা বলে, তারপর সৃষ্টির কথা বলেছেন। কিন্তু *তর্কভাষা*কার প্রথমে সৃষ্টি বা উৎপত্তির কথা বলেছেন। এর স্বপক্ষে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের যুক্তি হল - উৎপন্ন বস্তুরই বিনাশ হয়। অনুৎপন্ন বস্তুর কখনোও বিনাশ হতে পারে না। তাই গ্রন্থকার প্রথমে উৎপত্তির কথা বলে, শেষে বিনাশের কথা

বলেছেন। এবিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - 'জাতস্যৈব নাশো ভবতি অজাতস্য নাশাসম্ভবাদিত্যভিপ্রায়েণ জন্মনঃ প্রথমমুপাদানম্।'[৫৭]

এখন বক্তব্য হল - শ্রুত্যাদিতে আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে তেজ, তেজ হতে জল এবং জল হতে পৃথিবীর উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে - "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বাযুঃ। বাযোরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয, ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাত্ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ...।"[৫৮] সেখানে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। এরূপ বেদান্তীরাও একই ক্রমের কথা বলেছেন। কিন্তু ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনে বায়ু তেজের, তেজ জলের, এবং জল পৃথিবীর উপাদান-কারণরূপে স্বীকৃত হয়নি।

আচার্য **প্রশস্তপাদ** প্রথমে বায়ুর উৎপত্তির কথা বলেছেন। তারপর সেই বায়ুর হতে জলের উৎপত্তি এবং তারপর পৃথিবীর উৎপত্তির কথা বলে, শেষে জল হতে তেজের উৎপত্তির কথা বলেছেন। কিন্তু *তর্কভাষা*কার পৃথিব্যাদি ক্রমে উৎপত্তির কথা বলেছেন। তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার উক্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন - 'যদ্যপ্যনিলজলাবন্যনলানাং ক্রমেণোৎপত্তির্বক্তব্যা ন তু পৃথিব্যাদিক্রমেণ তথাপি ক্রমস্যাত্রাবিবক্ষিতত্বান্ন দোষঃ।'[৫৯] অর্থাৎ তাঁর মতে, এখানে 'ক্রম' *তর্কভাষা*কারের বিবক্ষিত বিষয় না হওয়ায়, তা কোন দোষের নয়।

এই পৃথিব্যাদি চারটি কার্যদ্রব্যে প্রতিভাত রূপাদি গুণগুলি স্বাশ্রয়ভূত সমবায়িকারণস্থিত রূপাদি গুণ হতে উৎপন্ন হয়, যেহেতু কারণগুণই কার্যগুণের আরম্ভক। যার ফলে অবয়বীতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব, একত্বসংখ্যা প্রভৃতি অপাকজ গুণের উৎপত্তি হয়। উক্ত আশয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার বলেছেন - "কার্যগতা ইতি। অবযবিন্যপাকজস্থল এতত্।"[৬০]

আবার ***সারমঞ্জরী***কারের মতে, নব্যগণ ত্র্যণুকের নিত্যত্ব স্বীকার করায়, পরমাণু ও দ্ব্যণুকের প্রামাণ্যের অনুপপত্তি হয়। তাই বলা হয়েছে - 'কার্যগতা রূপাদয' ইত্যাদি। কেননা, পার্থিব পরমাণুর রূপ দ্ব্যণুকের রূপের সমবায়িকারণ আবার দ্ব্যণুকগতরূপ ত্র্যণুকের রূপের সমবায়িকারণ। অত এব দ্ব্যণুক বা ত্র্যণুক সবই কার্যপদার্থ। এবিষয়ে ***সারমঞ্জরী***তে বলা হয়েছে - "নব্যাস্তু ত্র্যণুকস্য নিত্যত্বাঙ্গীকারাত্ পরমাণুদ্ব্যণুকযোঃ মানাভাবমাহুঃ কার্যগতা রূপাদযঃ ইতি। বিলক্ষণনীলং প্রতি স্বাশ্রযসমবেতত্বসম্বন্ধেন নীলং হেতুঃ...।"[৬১]

উৎপন্ন পৃথিব্যাদি চারটি মহাভূতের **সংহারকাল** উপস্থিত হলে, ঈশ্বরের তাদৃশ সংহারেচ্ছাবশত পৃথিব্যাদি কার্যপদার্থের বিনাশ হয়। **প্রাচীন নৈয়ায়িকদের** মতে, এই বিনাশ প্রক্রিয়া দুইটি কারণে হয়। যথা - অসমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ এবং সমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ।

তবে **নব্য নৈয়ায়িকদের** মতে, সর্বত্র অসমবায়িকারণের নাশে কার্য দ্রব্যের বিনাশ হয়।[62] তাঁরা সমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ স্বীকার করেন না। যেহেতু, পরমাণুর ধ্বংস না হওয়ায়, দ্ব্যণুকের ধ্বংস হয় না। তাই তাঁদের মতে, সর্বত্র অসমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ হয়।

তর্কভাষাকার সমবায়ী এবং অসমবায়ী উভয় প্রকার কারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশের কথা বলেছেন। প্রথমে তিনি অসমাবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, ঘটাদি কার্যদ্রব্যে নোদন বা অভিঘাতের ফলে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। সেই ক্রিয়া দ্বারা কপালাদি অবয়বে বিভাগ উৎপন্ন হয়। আর সেই বিভাগের ফলে ঘটাদি দ্রব্যের আরম্ভক কপাল দ্বয়ের সংযোগরূপ অসমবায়িকারণের নাশ হয়। ফলে ঘটাদি কার্যদ্রব্যের নাশ হয়।

এরূপ দ্ব্যণুকের আরম্ভক পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হলে, সেই ক্রিয়ার দ্বারা বিভাগ উৎপন্ন হয়। তার ফলে সেই বিভাগ-দ্বারা পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হয়। এভাবে দ্ব্যণুক বিনষ্ট হওয়ায়, স্বাশ্রয়নাশে ত্রসরেণু প্রভৃতিরও নাশ হয়। আর এভাবে নাশ হতে হতে ক্রমে মহদ্ পৃথিবী অপ, তেজ ও বায়ু প্রভৃতির নাশ হয়। যেমন - তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে পট উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পটের আশ্রয় হল তন্তু, তাই তার নাশে পটেরও নাশ হয়।

তবে অনেক সময় আশ্রয়ের নাশ না হলেও আশ্রিত পদার্থের নাশ হতে দেখা যায়। যেমন - ঘট দ্রব্যের নাশ না হলেও সেখানে পাকজ রক্তরূপের প্রাদুর্ভাবে পূর্বস্থিত শ্যামরূপের নাশ হয়। তবে পৃথিব্যাদি কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ হল - পরমাণুসমূহের সংযোগ বা নোদন এবং অভিঘাত বা বিভাগরূপ ক্রিয়া।

পূর্বোক্ত 'নোদন' ও 'অভিঘাতের' ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার বলেছেন- "স্পর্শবদ্দ্রব্যসংযোগো নোদনা। স্পর্শবেগবদ্বেগবদ্দ্রব্যসংযোগোঽভিঘাতঃ।"[৬৩] অর্থাৎ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের সংযোগ হল নোদন এবং স্পর্শ ও বেগবিশিষ্টদ্রব্যের সংযোগ হল অভিঘাত। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার বিষয়টি আরও বিশ্লেষণ করে বলেছেন - "তত্র নোদনং নাম

গুরুত্বদ্রবত্ববেগপ্রযত্নান্ ব্যাস্তাঙ্গমস্তান্বাপেক্ষ্য পরস্পরবিভাগঃ কৃতঃ একস্য কর্মণঃ কারণং সংযোগবিশেষঃ। অভিঘাতস্তু বেগাপেক্ষঃ পরস্পরবিভাগকৃতঃ। একস্য কর্মণঃ কারণং সংযোগবিশেষঃ তেন সংযোগবিশেষজনিতেন কর্মণা দ্রব্যারম্ভকসংযোগবিরোধী বিভাগো জন্যতে।"[৬৪] আবার ***সারমঞ্জরী***কার *তর্কভাষাপ্রকাশ*কারের অনুকরণে নোদন ও অভিঘাতের কথা বলে, তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "...মনঃ সংযোগবারণায স্পর্শপদম্। বস্তুতঃ দ্বযমপি সংযোগবিশেষোপলক্ষণম্। কশ্চিত্তু - শরীরাদিসংযোগো নোদনা। বাযুপাষাণাদিসংযোগোঽভি-ঘাত ইত্যাহুঃ তন্ন। হস্তেনাপি অভিঘাতসংভবাত্। সংযুক্ত এব সংযোগবিশেষঃ নোদনা, অসংযুক্তে সংযোগোঽভিঘাত ইত্যাহ - তন্ন। তৎসংযুক্তে তৎসংযোগাসম্ভবাত্।"[৬৫]

● পরমাণুর সত্তা সিদ্ধি :

পরমাণু সমূহে যে নোদন বা অভিঘাতের ফলে উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। এখন বক্তব্য হল, সেই পরমাণুর সদ্ভাবে প্রমাণ কী? এর উত্তর হল অন্ধকার ঘরের জানালা দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করলে, সেই অত্যুজ্বল আলোতে যে অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেই পদার্থটি ঘটবৎ একটি কার্যদ্রব্য। যেহেতু কার্যদ্রব্যই মহদ্-দ্রব্যের আরম্ভক, সেহেতু সেই স্বল্প পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যটি অবশ্যই কার্য। আর ঐ স্বল্প পরিমাণবিশষ্ট কার্যদ্রব্যটি হল ত্রসরেণু। এই ত্রসরেণুর আরম্ভক হল দ্ব্যণুক। সেটিও ঘটবৎ কার্যদ্রব্য। আর উক্ত দ্ব্যণুকের আরম্ভকই হল পরমাণু।

সুতরাং ঐ ধূলিকণারূপ ত্রসরেণুর ছয় ভাগের এক ভাগ হল পরমাণু। আর এই পরমাণু অন্য কোনো পদার্থ থেকে উৎপন্ন না হওয়ায়, এটি অনারব্ধ বা নিত্য।

এই পরমাণুকে নিত্য স্বীকার না করলে, অনন্তকার্যপরম্পরা দোষ প্রসক্ত হবে। তার ফলে বিশাল আয়তন মেরু পর্বত এবং সর্ষের আয়তন একই বলতে হবে। কেননা, উভয় তখন অনন্তাবয়ব যুক্তরূপে কল্পিত হবে। তাই পরমাণুকে নিত্য স্বীকার করতে হবে।

আপত্তি হতে পারে, পরমাণুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে গ্রন্থকার প্রথমে ত্রসরেণুর কথা বললেন কেন? দ্ব্যণুক বা পরমাণুর কথা বললেন না কেন? এই বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার বলেছেন - "দ্ব্যণুকসাধনমন্তরেণ পরমাণুসাধনং ন সম্ভবতি দ্ব্যণুকসাধনমপি ত্র্যণুকপক্ষীকারেণ কর্তব্যম্। পক্ষশ্চ প্রমিত এব ভবতি। অন্যথা হেতরাশ্রযসিদ্ধিপ্রসঙ্গাদিত্যভিপ্রাযেণ প্রথমং ত্র্যণুকস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধতামভিধত্তে - যদিদমিতি।"[৬৬]

অর্থাৎ দ্ব্যণুকের সিদ্ধি না হলে পরমাণুর সিদ্ধি হয় না। আবার দ্ব্যণুকের সিদ্ধি ত্র্যণুকের সিদ্ধির অপেক্ষা করে। তাই গ্রন্থকার প্রথমে ত্র্যণুকের প্রামাণ্য নিরূপণ করেছেন।

- **দ্ব্যণুকাদির অবয়ব নিয়ম :**

পূর্বোক্ত দ্ব্যণুক দুইটি পরমাণু হতেই উৎপন্ন হয়। যেহেতু একটি পরমাণু দ্বারা কোন কার্যবস্তু উৎপন্ন হতে পারে না। সংযোগ দুটি দ্রব্যের মধ্যে হয়। আর উপাদানকারণের সংযোগ ব্যতীত কোনো কার্যের উৎপত্তি হয় না। আবার দ্ব্যণুকের আরম্ভক দুই এর অধিক পরমাণু স্বীকার করলে, গৌরব দোষ উপপন্ন হবে। কাজেই দুইটি পরমাণুকেই দ্ব্যণুকের আরম্ভক স্বীকার করতে হবে।

একই ভাবে ত্র্যণুকও তিনটি দ্ব্যণুক দ্বারা উৎপন্ন হয়। কারণ, দুইটি দ্ব্যণুক দ্বারা ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করলে কার্যগত ত্র্যণুকে মহৎপরিমাণ গুণের উৎপত্তি হবে না। কিন্তু যদি তিনটি দ্ব্যণুক দ্বারা ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহলে কারণ মহৎপরিমাণ যুক্ত হওয়ায়, ত্র্যণুকেও মহৎপরিমাণ গুণের সন্নিবেশ হবে। আবার তিনটির অধিক দ্ব্যণুক কল্পনা করলে, তা অপ্রামাণিক হবে। সেজন্য তিনটি দ্ব্যণুককে ত্র্যণুকের কারণরূপে স্বীকার করতে হবে। এই বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে *সারমঞ্জরী*কার বলেছেন - "ত্রযাণাং সংযোগেনোৎপত্তৌ কারণে বহুত্বসত্ত্বাত্ মহত্বাপত্ত্যা দযোরেব সংযোগাদ্ দ্ব্যণুকোপপত্তিরিত্যাহুঃ। তত ইতি। দ্ব্যণুকদ্বযাত্ ত্র্যণুকোৎপত্তৌ মহত্ত্বানুপপত্ত্যা ত্রযাণাং কারণতা। যদ্যপি পরমাণুত্রযেণৈব ত্র্যণুকোৎপত্তৌ কারণবহুত্বসত্ত্বেন ত্র্যণুকে মহত্ত্বোৎপত্তিসংভবঃ। তথাপি মহদারম্ভকস্য সাবযত্বনিযমাত্ দ্ব্যণুকস্বীকার ইতি প্রাঞ্চ।"[৬৭]

এই স্থলে তুলনামূলক আলোচনায় বলা যায় যে, *তর্কভাষাপ্রকাশ*কার কারণগুণ হতে কার্যে যে অপাকজ গুণের উৎপত্তি হয়, সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। যা অন্য দুটি টীকাতে কথিত হয়নি।

আবার *তর্কভাষা*কার প্রথমে যে সৃষ্টি বা উৎপত্তির কথা বলেছেন, *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার সেই বিষয়ে কারণ দেখিয়েছেন এবং সেই সাথে পৃথিব্যাদি ক্রমে উৎপত্তির কথাও বলেছেন। যা *তর্কভাষাপ্রকাশ* বা *সারমঞ্জরী*তে উল্লেখ হয়নি। কিন্তু *সারমঞ্জরী*কার এই উৎপত্তি ও বিনাশ-বিষয়ে প্রাচীন ও নব্য মত উল্লেখপূর্বোক ব্যাখ্যা করেছেন।

● **আকাশ :** আকাশ একটি বিভু দ্রব্য। এখানে 'শব্দ' নামক গুণটি সমবায়সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। 'শব্দ' হল আকাশের বিশেষগুণ। সেজন্য *তর্কভাষা*কার শব্দগুণযুক্ত পদার্থকে আকাশ বলেছেন। তবে শব্দ ব্যতীত সংখ্যাদি পঞ্চ সামান্যগুণও আকাশে বিদ্যমান। ***সারমঞ্জরী***কারের মতে, 'শব্দগুণকম্ আকাশম্' - এই স্থলে 'গুণ' পদটি আকাশে শব্দের বিশেষগুণত্ব সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। বস্তুত সমবায়সম্বন্ধে শব্দবত্বই আকাশের লক্ষণ। এবিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "গুণপদং শব্দগুণেনাকাশসিদ্ধিদ্যোতকম্। লক্ষণং সমবায়েন শব্দবত্বম্।"[৬৮] অর্থাৎ 'গুণ' পদটি শব্দগুণের দ্বারা আকাশের সিদ্ধির দ্যোতক।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার আকাশের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'সংযোগাজন্যজন্যবিশেষগুণসমানাধিকরণবিশেষাধিকরণমাকাশমিতি লক্ষণান্তরং দ্রষ্টব্যম্।'[৬৯] অর্থাৎ যা সংযোগ হতে উৎপন্ন হয় (শব্দ), জন্য বা অনিত্য, বিশেষ গুণের সঙ্গে একই অধিকরণে থাকে, সেই বিশেষ গুণের (শব্দের) অধিকরণই হল আকাশ।

শব্দ আকাশের বিশেষগুণ। *তর্কভাষা*কার শব্দের আকাশবৃত্তিত্ব সিদ্ধ করতে বলেছেন - "তথাহি শব্দাস্তাবত্ বিশেষগুণঃ সামান্যবত্ত্বে সতি অস্মদাদিবাহ্যেকেন্দ্রিযগ্রাহ্যত্বাদ্ রূপাদিবত্।"[৭০] অর্থাৎ 'শব্দ' বিশেষগুণ, যেহেতু তা সামান্যবিশিষ্ট হয়ে আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। যেমন - রূপাদি গুণ।

এই 'শব্দ' গুণকে আকাশের লিঙ্গক বা অনুমাপক বলা হয়। প্রশ্ন হতে পারে, কীভাবে শব্দগুণের দ্বারা আকাশের অনুমান হয়? তাই গ্রন্থকার নিজেই সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন- "শব্দলিঙ্গকত্বমস্য কথম্? পরিশেষাত্। প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাত্ পরিশিষ্যমাণে সম্প্রত্যযঃ পরিশেষঃ।"[৭১]

তর্কভাষাপ্রকাশকার উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "নন্বিতরপ্রতিষেধঃ পরিশেষঃ। তথা চৈতেন পৃথিব্যাদিবৃত্তিত্বাভাবঃ সিদ্ধ্যতু ন তু গগনবৃত্তিত্বম্। অতঃ পরিশেষপদার্থমাহ প্রসক্তেতি। শব্দস্য হি গুণত্বেন পৃথিব্যাদাবেব বৃত্তিঃ প্রসক্তা ন তু গুণাদৌ...।"[৭২] অর্থাৎ 'পরিশেষ' বলতে, ইতর প্রতিষেধ বোঝায়। কিন্তু এর দ্বারা শব্দের আকাশবৃত্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। তাই শব্দ যেহেতু গুণপদার্থ, সেজন্য এর পৃথিব্যাদি দ্রব্য-বৃত্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতি অষ্ট দ্রব্য প্রসক্ত না হওয়ায়, শেষে গগনবৃত্তিত্বই সিদ্ধ হয়।

এই আকাশ স্বরূপত এক, যেহেতু এর ভেদে কোন প্রমাণ নেই। আকাশের একত্ব ব্যাখ্যানে *সারমঞ্জরী*কার বলেছেন - "একমিতি। শব্দনিষ্ঠব্যাসজ্যবৃত্তিধর্মানবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিতাকভেদাপ্রতিযোগীত্যর্থঃ।"[৭৩] এই আকাশ শব্দনিষ্ঠ ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। ভেদের অপ্রতিযোগী হওয়ায়, তার একত্ব সিদ্ধ হয়। আকাশ একব্যক্তিক হওয়ায়, এতে জাতি স্বীকৃত হয় না।

● **কাল :** নৈয়ায়িক মতে, কাল একটি বিভু দ্রব্য। 'দিক' ও 'কাল' উভয়ই পরত্বাপরত্ব গুণের দ্বারা অনুমিত হয়। তাই *তর্কভাষা*কার কালের লক্ষণপ্রসঙ্গে তাকে দিগ্-বিপরীত পরত্ব ও অপরত্ব অনুমেয় পদার্থ বলেছেন।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভিন্ন ভাবে কালের লক্ষণ করেছেন - 'বিভুত্বে সতি দিগসমবেতপরত্বাপরত্বাসমবায়িকারণাধিকরণং কালঃ।'[৭৪] অর্থাৎ যে পদার্থ বিভু হয়েও দিক্-এ সমবেত হয় না, পরত্ব ও অপরত্বের অসমবায়িকারণের অধিকরণ হয়, তাই কাল।

উক্ত পরত্ব ও অপরত্ব ব্যবহারের প্রতি পিণ্ড সমবায়িকারণ। তাই ***সারমঞ্জরী***কার এর লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'পরত্বাপরত্বসমবায়িকারণপিণ্ডপ্রতিযোগিকসংযোগাশ্রযত্বমেব কালত্বম্।'[৭৫] অর্থাৎ পরত্ব ও অপরত্বের সমবায়িকারণ পিণ্ডের প্রতিযোগিকের সংযোগের আশ্রয়ই হল কাল।

কাল অনুমেয় পদার্থ এবং পরত্বাপরত্ব গুণের দ্বারা অনুমিত হয়। এখন প্রশ্ন হল, উক্ত পরত্বাপরত্ব গুণের দ্বারা দিগ্বিপরীত কাল কীভাবে অনুমিত হয়? তাই গ্রন্থকার নিজেই সেই প্রশ্ন উপস্থাপন করে, তার উত্তরে বলেছেন - "সন্নিহিতে বৃদ্ধে সন্নিধানাদপরত্বার্হে তদ্বিপরীতং পরত্বং প্রতীযতে। ব্যবহিতে যুনি ব্যবধানাত্ পরত্বার্হে তদ্বিপরীতমপরত্বম্। তদিদং তত্তদ্বিপরীতং পরত্বমপরত্বং চ কার্যম্। তৎকারণস্য দিগাদেরসংভবাত্ কালমেব কারণমনুমাপযতি।"[৭৬] এখানে 'অপরত্বার্হে' ও 'পরত্বার্হে' - এর দ্বারা দিক-কৃত অপরত্ব ও পরত্ব বুঝতে হবে। সন্নিধানবশত সন্নিহিত বৃদ্ধ ব্যক্তিতে অপরত্বের বিপরীত পরত্বের প্রতীতি হয়। আবার ব্যবধানবশত যুবা ব্যক্তিতে পরত্বের বিপরীত অপরত্বের প্রতীতি হয়। সুতরাং সন্নিধান ও ব্যবধানবশত বৃদ্ধ ও যুবা ব্যক্তিতে প্রতীয়মান তত্ তত্ অপরত্ব ও পরত্বের বিপরীত পরত্ব ও অপরত্ব কার্য। সেই কার্যের কারণ দিক্ প্রভৃতি সম্ভব না হওয়ায়, পরিশেষ অনুমানের দ্বারা তার কারণরূপে কালই অনুমিত হয়। পূর্বোক্ত পরিশেষ অনুমানের বিষয়টি

তর্কভাষাপ্রকাশ ও *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে একই ভাবে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

কাল সংখ্যায় এক হলেও ক্রিয়ারূপ উপাধিবশত একই পুরুষ যেমন পাঠক, পাচক প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, সেরূপ কালেও অতীতাদি ব্যবহার সম্পন্ন হয়। কাল সকল জন্যপদার্থের জনক, জগতের আশ্রয়রূপে কল্পিত হয়। সর্বত্র কালের কার্য উপলব্ধ হওয়ায়, আকাশের মত কালও বিভু এবং নিত্য।

● **দিক :** *তর্কভাষা*কার যেমন কালকে দিকের বিপরীত বলেছেন। তেমনই দিকের লক্ষণপ্রসঙ্গে দিক্-কে কালের বিপরীত, পরত্ব অপরত্ব অনুমেয় পদার্থ বলেছেন। কালের মত দিকও একত্ব, নিত্যত্ব ও বিভুত্ব যুক্ত। এখানেও সংখ্যাদি পঞ্চ গুণ থাকে।

গ্রন্থকার লক্ষণে পরত্ব ও অপরত্ব গুণের দ্বারা দিকের অনুমেয়তার কথা বলে, পরে আবার পূর্বাদি প্রত্যয়ের দ্বারাও দিকের অনুমেয়তার কথা বলেছেন। যেহেতু সেগুলি প্রত্যয়ের অন্য কোন নিমিত্ত নেই।

আপত্তি হতে পারে, পূর্বাদি দিকগুলিকে এটি পূর্ব দিক এটি পশ্চিম দিক - এরূপ সাক্ষাৎভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। তাহলে, গ্রন্থকার অনুমানের কথা বললেন কেন? বস্তুত তা ঠিক নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দিকের সিদ্ধি হতে পারে না। কেননা, দিকে কোন প্রকার উদ্ভূতরূপ বা স্পর্শ গুণ নেই। তাই এটিকে অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধি করতে হবে।

আমি যে দিক্-টিকে পূর্ব বলে প্রত্যয় করছি, অন্য কেউ সেটিকে পশ্চিমরূপে উপলব্ধি করে। যেহেতু তা অবস্থান অনুসারে হয়। অর্থাৎ সূর্যের তত্তৎ দেশের সঙ্গে সংযোগরূপ উপাধিবশত দিক 'প্রাচ্যাদি' নামে অভিহিত হয়।

*তর্কভাষাপ্রকাশ*কার পূর্বাদি প্রত্যয়ের অসাধারণ নিমিত্তের দ্বারা দিক্-সিদ্ধির কথা বলে, সূর্যাভিমুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তির সেই দিক হবে পূর্বদিক, তার দক্ষিণভাগ হবে দক্ষিণদিক্, বামভাগ হবে উত্তরদিক্, উৎক্ষেপণ ক্রিয়া জন্য সংযোগের আশ্রয় হবে ঊর্ধ্বদিক্, অপক্ষেপণ ক্রিয়া জন্য সংযোগের আশ্রয় হবে অধোদিক - এভাবে ভিন্ন ভিন্ন দিকের কথা বলেছেন।[৭৭]

আবার পূর্বোক্ত প্রকার অভিপ্রায়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার দিকের লক্ষণ করেছেন - 'তপনপরিস্পন্দোন্নায়কত্বান্ন(দ)ধিকরণপরত্বাপরত্বাসমবায়িকারণাধিকরণাসমবেতা দিগিতি লক্ষণমবধেয়ম্।'[৭৮] এর পর তিনি দিকের একত্ব, নিত্যত্ব ও বিভুত্ব সাধনপ্রসঙ্গে বলেছেন যে,

দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য-জাতির অভাবে দিক এক। সমান ও অসমানজাতীয় কারণের অভাবে দিক নিত্য এবং সর্বত্র দিকের পূর্বপশ্চিমাদি কার্য উপলব্ধ হওয়ায় বিভু। এভাবে শেষে মূর্তবস্তুকে অবধি করে, এই বস্তুটি এই বস্তু হতে পূর্বে অথবা এই বস্তুটি এই বস্তু হতে দক্ষিণে বা উত্তরে - এরূপ ব্যবহারের দ্বারা দিক্-সিদ্ধির কথা বলেছেন।[৭৯]

কিন্তু ***সারমঞ্জরী***কার প্রথমে দিকের বিভুত্বের কথা বলেছেন। তারপর দিকের সিদ্ধি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পূর্বদেশে ঘট - এরূপ প্রতীতি সূর্য সংযোগর কারণবশত হয়। কিন্তু যদি সেই সংযোগ না হয়, তাহলে সেরূপ বিশিষ্টবুদ্ধির উপপত্তি হয় না। তাই সেরূপ সম্বন্ধঘটকের দ্বারা দিক সিদ্ধ হয়। আবার পরত্ব ও অপরত্ব গুণের অসমবায়িকারণের সংযোগের আশ্রয়ের দ্বারাও দিক সিদ্ধি হয়।[৮০]

অত এব এখানে দেখা যায় যে, টীকাত্রয়ের মধ্যে কেবলমাত্র ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে দিকের একটি লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে, অন্য দুটি টীকাতে তা প্রদত্ত হয়নি। তবে তিনটি টীকাতেই টীকাকারগণ নিজ বুদ্ধিমত্তা অনুসারে দিকের অস্তিত্ব সাধন করেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার দিকের একত্ব, নিত্যত্ব, বিভুত্ব - প্রভৃতি স্বরূপগুলি যথাযথ ভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ***সারমঞ্জরী***কার বিভুত্ব প্রতিপাদের কথা বললেও নিত্যত্ব বা একত্বের বিষয় এড়িয়ে গেছেন। আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, দৈশিক পরত্বাপরত্বের দ্বারা দিক্ এবং কালিক পরত্বাপরত্বের দ্বারা কাল অনুমিত হলেও ঐ দুটি গুণ কিন্তু দিক্ বা কাল - কোনোটিরই গুণ নয়।

এরূপ আকাশ, কাল এবং দিক্ - এই তিনটি দ্রব্যই একটি করে হওয়ায়, *তর্কভাষা*কার এগুলির জাতিঘটিত লক্ষণ নিরূপণ করেননি। কারণ, একব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম জাতি হতে পারে না। তিনটি টীকাতে সেই বিষয়গুলি পর্যালোচিত হয়েছে।

● **আত্মা :** কেশবমিশ্র বায়ুর মত আত্মদ্রব্যের লক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গেও আত্মত্ব ধর্মের দ্বারা যা সম্পর্কযুক্ত তাকে আত্মা বলেছেন। 'আত্মত্ব' নামক যে সামান্য, তার দ্বারা 'অভিমত সম্বন্ধ' হল আত্মাভিসম্বন্ধ। এই আত্মাভিসম্বন্ধটি হল সমবায়। অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে যা আত্মত্বজাতিবিশিষ্ট তাই আত্মা। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার 'অভিসম্বন্ধ' পদের এরূপ ব্যাখ্যা করে আত্মদ্রব্যের লক্ষণ নির্বচন প্রসঙ্গে বলেছেন - "আত্মত্বং নাম ক্রিযাসমানাধিকরণত্বরহিত-গগনসমবেতব্যাপ্যজাতিঃ, পরমমহত্ত্বসমানাধিকরণদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতির্বা...।"[৮১] অর্থাৎ আত্মা

যেহেতু অমূর্ত দ্রব্য, তাই আত্মত্ব হল - ক্রিয়াসমানাধিকরণরহিত, গগনসমবেতব্যাপ্যজাতি। আবার এই আত্মা পরমমহত্ত্ব পরিমাণ ও দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিবিশিষ্ট পদার্থও। এভাবে লক্ষণ নিরূপণের পর টীকাকার আত্মার চৌদ্দটি গুণ এবং নিত্যত্ব ও বিভুত্বের কথা বলেছেন।

*তর্কভাষা*কার আত্মার দ্রব্যত্ব সিদ্ধ করতে, সংখ্যাদি পঞ্চ সামান্যগুণ এবং বুদ্ধ্যাদি নব বিশেষগুণের কথা বলেছেন। 'আত্মা' নামক প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যাবসরে নিত্যত্বাদি স্বরূপগুলি প্রতিপাদন করায় গ্রন্থকার এই স্থলে সেবিষয়ে বিশেষ কিছু বলেননি।

একই ভাবে ***সারমঞ্জরী***কারও পূর্বে আত্মত্ব জাতির প্রামাণ্য নিরূপণ করায়, এই স্থলে তার উল্লেখ করেছেন মাত্র। তারপর আত্মার সংখ্যাদি চতুর্দশ গুণের কথা বলেছেন। একই কারণবশত ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার আত্মদ্রব্যের কোন প্রকার ব্যাখ্যা করেননি।

● **মন :** *তর্কভাষা*কার মনস্ত্ব ধর্মের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত পদার্থকে মন বলেছেন। মনস্ত্ব অভিসম্বন্ধবান্ পদার্থকে মন বলেছেন। পূর্ববৎ 'অভিসম্বন্ধ' শব্দের 'অভিমত সম্বন্ধ' - এরূপ অর্থ করে, এর দ্বারা 'সমবায়সম্বন্ধ'কে বুঝতে হবে। সমবায়সম্বন্ধে যা মনস্ত্ব জাতিবিশিষ্ট, তাই মন। এই মনস্ত্ব জাতিপ্রসঙ্গে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার বলেছেন - 'অসমবেতসমবেতত্বরহিত-ক্রিযাসমানাধিকরণাজাতির্মনস্ত্বমিতি।'[৮২] অর্থাৎ যা ক্রিয়াবদ্ দ্রব্যের অসমানাধিকরণ ভিন্ন দ্রব্যত্বরহিত, ক্রিয়াবত্ দ্রব্যের সমানাধিকরণবৃত্তি হয়, সেটিই হল মনস্ত্ব জাতি। এই মনস্ত্ব জাতিবিশিষ্ট পদার্থ হল মন।

এখন বক্তব্য হল, মনস্ত্ব জাতি যদি সিদ্ধ না হয়, তাহলে সেই জাতির দ্বারা মনের লক্ষণনিরূপণ অসংগত হয়। তাই ***সারমঞ্জরী***কার উক্ত মনস্ত্ব জাতি সিদ্ধির কথা বলেছেন - 'তথা চ কারণতাবচ্ছেদকঘটকতযা মনসত্বসিদ্ধিঃ।'[৮৩] অর্থাৎ সুখাদি উপলব্ধির অসাধারণকারণ মন। অত এব মনে উক্ত সুখাদি উপলব্ধির কারণতা বিদ্যমান। সেই কারণতার অবচ্ছেদকরূপে মনস্ত্বজাতি সিদ্ধ হয়।

স্বরূপত মন নিত্য ও অণুপরিমাণ বিশিষ্ট। ন্যায় দর্শনে জ্ঞানের অযৌগপদ্য হেতুর দ্বারা মনের একত্ব ও অণুত্ব সিদ্ধ করা হয়েছে - 'যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু।'[৮৪] পূর্বসূত্রে জ্ঞানের অযৌগপদ্যবশত মনকে একত্ব বিশিষ্ট বলা হয়েছে। এই সূত্রে যথোক্ত পদটির দ্বারা সেই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। *ন্যায়ভাষ্য*কার উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "অণু মন একঞ্চেতি ধর্মসমুচ্চযো জ্ঞানাযৌগপদ্যাদ্। মহত্ত্বে মনসঃ সর্বেন্দ্রিযসংযোগাদযুগপদ্বিষযগ্রহণং

স্যাদিতি।"[৮৫] প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, এরূপ বৈশেষিকসূত্রেও সর্বমূর্তসংযোগিত্বের অভাববশতঃ মনকে অণু পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ বলা হয়েছে।

আত্মার মত প্রতিটি শরীরাবচ্ছেদে একটি করে মন থাকে। এই মন যেরূপ সুখদুঃখাদি উপলব্ধির সাধন হয়, সেরূপ আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকল বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধিরও সাধন হয়। তাই মনকে সর্বোপলব্ধির সাধন বলা হয়। মনে সংখ্যাদি পঞ্চ, দৈশিক পরত্বাপরত্ব ও বেগাখ্য সংস্কার - এই আটটি গুণ বিদ্যমান।

আপত্তি হতে পারে, আত্মা ও মন উভয়ই এক ও নিত্য স্বরূপ। প্রতিটি শরীরে একটি করে উভয়েরই সত্তা স্বীকার করা হয়েছে। তাহলে, মনকে কেন অণুপরিমাণ স্বীকার করা হয়েছে? কেন তার বিভুত্ব স্বীকৃত হল না? এর উত্তরে ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্যদের যুক্তি হল - মনকে যদি বিভু স্বীকার করা হয়, তাহলে, একই ক্ষণে যুগপদ্ ভিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তাই মন অণুপরিমাণ।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার মনে উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে, একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন - মনকে বিভু স্বীকার করলে, দীর্ঘ রস-গন্ধাদি যুক্ত শষ্কুল (এক ধরনের মাছ অথবা পিষ্টক) ভক্ষণকারী পুরুষের একই সময়ে রসাদি বিবিধ বিষয়ের যুগপত্ উপলব্ধি প্রসক্ত হবে। তাই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুগপত্ অনেক বিষয়ের সম্বন্ধ হলেও যার সন্নিধানবশত ক্রমে জ্ঞান উৎপন্ন হবে, তাদৃশ সহকারিকারণকে অণুপরিমাণ স্বীকার করতে হবে। যেমন - ন্যায়সূত্রকার যুগপত্ জ্ঞানের অনুৎপত্তিকে মনের লিঙ্গ বলেছেন।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার এ বিষয়ে বলেছেন - মধ্যম পরিমাণ স্বীকার করলে, তার অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হবে। কেননা, মধ্যম বা দেহপরিমাণ বস্তু সংকোচ ও বিকাশশালী হয়। কিন্তু মন নিরবয়ব হওয়ায় লাঘববশত নিত্য স্বীকার করতে হবে, অনিত্য স্বীকার করলে, গৌরবদোষ উপস্থিত হবে। নিজ স্বভাব অনুসারে মনের দ্বারা সমূহালম্বন জ্ঞান হলেও একই সময়ে নানা জাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না, সেজন্য মন অণুপরিমাণ।[৮৬]

আবার ***সারমঞ্জরী***কারের মতে, চক্ষুরাদির সঙ্গে মনের সংযোগবশত চাক্ষুষাদি জ্ঞানে মনের কারণত্ব স্বীকার করতে হবে, অন্যথায় চাক্ষুষ জ্ঞানের সময় স্পার্শন প্রত্যক্ষের আপত্তি উপস্থিত হবে। ফলে দর্শন ও স্পার্শনের জন্য একই ক্ষণে একই বিষয়ের জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার

করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। কাজেই মনকে অণুপরিমাণ স্বীকার করতে হবে। অত এব দেখা যাচ্ছে যে, টীকাকারগণ নিজ নিজ অভিমত অনুসারে মনের অণুত্ব সাধন করেছেন।

তর্কভাষাকার মনদ্রব্যের পূর্বোক্ত স্বরূপ নিরূপণের পর অনুমান প্রমাণের দ্বারা মনের অস্তিত্ব সাধনপ্রসঙ্গে বলেছেন - সুখাদির উপলব্ধি চক্ষু প্রভৃতি হতে অতিরিক্ত করণসাধ্য, যেহেতু চক্ষু প্রভৃতি বর্তমান না থাকলেও সুখাদির উপলব্ধি হয়। যে বস্তু যাকে ছাড়াই উৎপন্ন হয়, সেই বস্তু সেই করণ হতে ভিন্ন কোন করণসাধ্য। যেমন - কুঠার বিনা উৎপন্ন পাচনক্রিয়া কুঠার হতে ভিন্ন বহ্ন্যাদি করণসাধ্য। তাই সুখাদি উপলব্ধির যা করণ, তাই হল মন এবং তা চক্ষু প্রভৃতি হতে অতিরিক্ত।

পূর্বোক্ত অনুমান বাক্যটি বোঝাতে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার অন্ধব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এ বিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে বলা হয়েছে - 'যস্মিন্নসতি যজ্জাযতে তদতিরিক্তকারণসাধ্যং যথান্ধস্য জাযমানং দ্রব্যজ্ঞানং চক্ষুর্ব্যতিরিক্তস্পর্শনসাধ্যং তদ্বদত্রাপীত্যর্থঃ।'[৮৭] অর্থাৎ যেমন, অন্ধ ব্যক্তির দ্রব্যের জ্ঞান চক্ষুভিন্ন স্পর্শেন্দ্রিয়সাধ্য, সেরূপ সুখাদির উপলব্ধি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হতে অতিরিক্ত মনেন্দ্রিয়সাধ্য। যেহেতু চক্ষু প্রভৃতি না থাকলেও তা উৎপন্ন হয়।

অত এব মন দ্রব্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে টীকাত্রয়ে যে বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তা হল- ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার মনস্ত্বজাতির ব্যাখ্যা দিলেও তিনি সেই মনস্ত্বজাতির সিদ্ধি বিষয়ে কিছু বলেননি। তবে ***সারমঞ্জরী***কার সেবিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন।

এরূপ তিনটি টীকাতেই মনের অণুত্ব সাধন করা হলেও সেবিষয়ে তিন জন টীকাকারই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন - ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার নিজ সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করতে *ন্যায়সূত্র* উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এরূপ ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার মধ্যমপরিমাণ স্বীকারে অনিত্য দোষের কথা বলে, মনের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেছেন। আবার ***সারমঞ্জরী***কার এক একটি বাহ্যেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনসংযোগের ক্ষণভেদের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। পৃথিব্যাদি দ্রব্যে বিদ্যমান রূপাদি গুণগুলি একটি সারণীর সাহায্যে প্রদত্ত হল -

দ্রব্য	**গুণ**	**গুণ-সংখ্যা**
পৃথিবী	রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগাখ্য সংস্কার।	১৪

জল	রূপ, রস, স্নেহ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগাখ্য সংস্কার।	১৪
তেজ	রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগাখ্য সংস্কার।	১১
বায়ু	স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব এবং বেগাখ্য সংস্কার।	৯
আকাশ	শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ।	৬
কাল	সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ।	৫
দিক্	সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ।	৫
আত্মা	সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম এবং ভাবনাখ্য সংস্কার।	১৪
মন	সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব এবং বেগাখ্য সংস্কার।	৮

প্রসঙ্গত এখানে বক্তব্য যে, পূর্বোক্ত নব দ্রব্যের গুণসংখ্যা বিষয়ে *দিনকরী*টীকায় প্রাচীন নৈয়ায়িকদের একটি প্রসিদ্ধ কারিকা উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে -

"বাযোর্নবৈকাদশ তেজসো গুণাঃ জলক্ষিতিপ্রাণভৃতাং চতুর্দশঃ।
দিক্-কালযোঃ পঞ্চ ষড়েব চাম্বরে মহেশ্বরেঽষ্টৌ মনসস্তথৈব চ॥"[৮৮]

৬.৪.২. গুণ : *তর্কভাষা*কার গুণ-পদার্থের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'সামান্যবান্ অসমবায়িকারণমস্পন্দাত্মা গুণঃ।'[৮৯] অর্থাৎ যা সামান্যবিশিষ্ট, অসমবায়িকারণ এবং কর্ম হতে ভিন্ন, তাই গুণ। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি পদার্থ সামান্যবান্। অসমবায়িকারণ সর্বদা গুণ ও কর্ম হয়। আবার 'অস্পন্দাত্মা' শব্দের দ্বারা কর্ম-ভিন্নের গ্রহণ হয়। অত এব 'অসমবায়িকারণ' বলতে, দ্রব্যের এবং 'অস্পন্দাত্মা' বলতে, কর্মের ব্যবচ্ছেদ হওয়ায়, 'দ্রব্যকর্মভিন্ন সামান্যবান্' পদার্থ বলতে গুণের অভিধান হয়। এভাবে গ্রন্থকারোক্ত লক্ষণটি গুণে সমন্বিত হয়।

তর্কভাষাপ্রকাশকার গ্রন্থকারোক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'কর্মদ্রব্যভিন্নত্বে সতি জাতিমত্ত্বমিত্যর্থঃ।'[৯০] সামান্যত অধিকাংশ গ্রন্থে 'দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সত্ত্বাবান্ বা দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি জাতিমত্ত্বং গুণত্বম্' - এরূপ গুণের লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। তাই টীকাকার এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

আবার ***সারমঞ্জরী***কার *তর্কভাষা*কারের উক্ত গুণলক্ষণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "সামান্যেনেতি। ঘটত্বঘটকর্মস্বতিব্যাপ্তিবারকাণি সামান্যেত্যাদিপদানি। অসমবাযিকারণ-দ্রব্যভিন্নম্। অস্পন্দাত্মা কর্মভিন্নঃ।"[৯১] সামান্যবান্ বললে, ঘটত্বাদি জাতি ও ঘটক্রিয়ারূপ কর্মে অতিব্যাপ্ত হয়, তাই গ্রন্থকার পরে অসমবায়িকারণ ও অস্পন্দাত্মা বলে, দ্রব্য ও কর্মভিন্ন সামান্যের বোধ করিয়েছেন।

কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার এ বিষয়ে একটু ভিন্ন কথা বলেছেন - "গুণস্য লক্ষণমাচষ্টে - সামান্যবানিত্যাদিনা। যথাক্রমং পদত্রযেণ সামান্যাদিত্রিতযদ্রব্যকর্মব্যবচ্ছেদঃ ক্রিযতে।"[৯২] তিনি সামান্যাদি তিনটি পদের দ্বারাই দ্রব্য ও কর্মের ব্যবচ্ছেদের কথা বলেছেন। বস্তুত এই কার্যটি সম্পন্ন হয়, অসমবায়িকারণ ও অস্পন্দাত্মা - এই দুটি পদের দ্বারাই। টীকাকারেই এরূপ অনবধানতা চিন্তনীয়।

● রূপ :–

এই 'রূপ' নামক গুণটি কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় এবং এটি একটি বিশেষগুণ। তাই *তর্কভাষা*কার চক্ষুরিন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্য বিশেষগুণকে রূপ বলেছেন। আপত্তি হতে পারে, রূপের এই লক্ষণটি পরমাণুরূপে অব্যাপ্ত হবে। কেননা, পরমাণু অতীন্দ্রিয় হওয়ায়, তার রূপ চক্ষুগ্রাহ্য হতে পারে না। বস্তুত তা নয়। কারণ, এই স্থলে 'গ্রাহ্য' পদের অর্থ -

‘প্রত্যক্ষযোগ্য’। মহত্ত্ব-পরিমাণের অভাবে পরমাণুগত রূপের প্রত্যক্ষ না হলেও তাতে প্রত্যক্ষযোগ্যতা থাকে। আর তাই পার্থিবপরমাণুর সমন্বয়ে সৃষ্ট ঘটাদির প্রত্যক্ষ হয়।

তর্কভাষাপ্রকাশকার লক্ষণঘটক প্রতিটি পদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে, শেষে পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি নিরসনের করতে বলেছেন - ‘চক্ষুরিন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্যে’র বিবক্ষিত অর্থ হল ‘চক্ষুরিন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্যজাতিমত্ত্ব’। আর এরূপ জাতিমত্ত্ব পরমাণুরূপেও বর্তমান হওয়ায়, পূর্বোক্তরূপ আপত্তির নিরসন হয়। [৯৩]

আবার ***সারমঞ্জরী***কারের মতে, উক্ত গুণত্বব্যাপ্য জাতির দ্বারা কেবল পরমাণুগত রূপে লক্ষণের অব্যাপ্তি নিরসন হয় না, উপরন্তু প্রভাগত পরিমাণেও অতিব্যাপ্তির নিরসন হয়। এবিষয়ে ***সারমঞ্জরী***তে বলা হয়েছে - “চক্ষুর্মাত্রগ্রাহ্যা গুণবৃত্তিজাতিঃ তদ্বান্। নাতঃ পরমাণুরূপাব্যাপ্তিঃ। ন বা প্রভাত্বস্য চক্ষুর্মাত্রগ্রাহ্যত্বেন প্রভাযামতিব্যাপ্তিঃ, তস্য গুণাবৃত্তিত্বাত্।”[৯৪]

তবে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার, এরূপ লক্ষণঘটক প্রতিটি পদের ব্যাখ্যা করেননি। তবে তিনিও জাতিঘটিত লক্ষণেরই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তাই তিনি রূপাদি গুণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - “তেষু গুণেষু চক্ষুষৈব যো গৃহ্যতে তদ্রূপম্। গুণত্বে সতি চক্ষুর্মাত্রগ্রাহ্যং রূপমিত্যর্থঃ। রূপত্বাদিজাতযো রূপাদিনাং লক্ষণানি জ্ঞেযানি।”[৯৫] অর্থাৎ যা গুণ হয়েও কেবলমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাই রূপ। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সংখ্যাদি গুণেরও গ্রহণ হয়। সেজন্য তিনি পরে রূপত্বাদি জাতির দ্বারা রূপাদির লক্ষণের কথা বলেছেন। যেহেতু রূপাদিগত জাতি রূপাদি হতে অন্য কোথাও বৃত্তি হয় না। সেজন্য টীকাকার তত্ তত্ জাতির দ্বারা রূপাদি গুণের লক্ষণ নির্বচনের কথা বলেছেন।

এই ‘রূপ’ নামক গুণটি পৃথিবী, জল ও তেজ - এই তিনটি দ্রব্যে থাকে। সেখানে পৃথিবীমাত্রে বিদ্যমান রূপ অনিত্য ও পাকজ। এরূপ পরমাণুরূপ জল ও তেজের রূপ নিত্য এবং কার্যরূপ জলের অভাস্বর শুক্লরূপ ও তেজের ভাস্বর শুক্লরূপ অনিত্য এবং পাকজ হয়। ‘ভাস্বর’ বলতে, প্রকৃষ্ট-প্রকাশকে বোঝায়।

বৈশেষিক দার্শনিকগণ শুক্ল, নীল, রক্ত, পীত, হরিত, কপিশ এবং চিত্র ভেদে রূপের সাত প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন। তবে চিত্ররূপ বিষয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে

মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন - প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ, নানা জাতীয় রূপবিশিষ্ট অবয়বীতে একটি বিজাতীয় চিত্ররূপ স্বীকার করেছেন।

আবার নব্য মতে, বিজাতীয় নানা রূপবিশিষ্ট তন্তুর দ্বারা নির্মিত পটে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপের উপলব্ধি হয়, তা ঐ পটের রূপ নামেই অভিহিত হয়। অত এব একই অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি নানা রূপের উপলব্ধি প্রত্যক্ষত সিদ্ধ হওয়ায়, লাঘব যুক্তিতে একটি চিত্ররূপ স্বীকার অযৌক্তিক।

তবে *তর্কভাষা*কার শুক্লাদি অনেক প্রকার রূপের কথা বলেছেন। সুতরাং তিনি যে প্রাচীন ন্যায়কে আশ্রয় করে, চিত্ররূপ স্বীকারের কথা বলেছেন, তা বোঝা যায়।

সারমঞ্জরীকার পূর্বোক্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ করে, শেষে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অনুসারে চিত্ররূপ স্বীকারে যুক্তি দেখিয়েছেন - "ননু সমানাধিকরণসমানকালীনবিজাতীয়রূপজ্ঞানাত্ চিত্রব্যবহারোপপত্তো ন চিত্ররূপে মানমিতি চেত্; ন নীলপীতাদ্যারব্ধে ঘটাদৌ প্রত্যক্ষান্যথানপপত্ত্যা রূপমাবশ্যকম্। তত্র নানারূপস্বীকারে গৌরবাত্। লাঘবাদেকমেব চিত্রং স্বীক্রিযতে...।"[৯৬] কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার শুক্লাদি সাত প্রকার রূপের কথা বললেও সে বিষয়ে কোন বিতর্কমূলক আলোচনা করেননি। আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন।

● রস :–

'রসনা' নামক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিশেষগুণ হল **রস**। ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার এই রসের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "রসনেন্দ্রিযগ্রাহ্যজাতিমানিত্যর্থঃ। গুণপদবৈযর্থ্যাত্।"[৯৭] এই রসে বিদ্যমান জাতি হল রসত্ব, এতাদৃশ রসত্বজাতিমান্ পদার্থ বলতে, রসেরই অভিধান হয়। তাই এরূপ জাতিঘটিত লক্ষণ নিরূপণ করলে, সেখানে বিশেষ বা সামান্য গুণ - এরূপ বলার প্রয়োজন পড়ে না। অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির সম্ভবনা থাকে না।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার বলেছেন - 'রসত্বং নাম তেজঃসমবেতসমবেতত্বরহিত-গন্ধেতরপৃথিবীবিশেষগুণসমবেতগুণত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ।'[৯৮] অর্থাৎ তিনি একটু ক্লিষ্টভাবে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। তবে ***সারমঞ্জরী***কারও এরূপ গুণত্বব্যাপ্যজাতির দ্বারা রসের লক্ষণ

নিরূপণ করলেও তাঁর লক্ষণে ততোখানি শব্দচাতুর্য নেই - 'রসনেন্দ্রিযজন্যলৌকিক-বিষযতাবদ্বৃত্তিঃ তাদৃশবিষযতাবতী যা গুণত্বব্যাপ্যজাতিস্তদ্বানিত্যর্থঃ।'[৯৯]

এই 'রস' নামক গুণটি পৃথিবী ও জলে থাকে। তারমধ্যে পৃথিবীতে মধুরাদি ছয় প্রকার রস থাকে। পৃথিবীতে বর্তমান এই রসগুলি পাকজ। জলে কেবল মধুর ও অপাকজ রস থাকে এবং পরমাণুরূপ জলে নিত্য এবং কার্যরূপ জলে অনিত্য রস থাকে।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে, এই রস মানুষের জীবনধারণ, শরীরের পুষ্টি সম্পাদন, শরীরে শক্তি সঞ্চার ও আরোগ্যের হেতু। ভাষ্যে বলা হয়েছে - 'জীবনপুষ্টিবলারোগ্যনিমিত্তম্।'[১০০]

রসের ভেদবিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্যদের মধ্যে মতপার্থক্য না থাকলেও *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থে চিত্ররস সহ মোট সাত প্রকার রস উল্লিখিত হয়েছে - 'রসোঽপি মধুর-তিক্ত-কটু-কষায়াম্ল-লবণ-চিত্রভেদাত্ সপ্তবিধঃ।'[১০১] *সপ্তপদার্থীর* টীকাকার মাধবদেব তাঁর *মিতভাষিণী* টীকায় বলেছেন যে, রস মূলত ছয় প্রকার হলেও হরীতকিতে চিত্ররসের অনুভব হয়। সেজন্য গ্রন্থকার চিত্ররসের উল্লেখ করেছেন - 'ষড়্-রসা হরীতকীতি চিত্ররসানুভবমবলম্ব্যাহ - চিত্রভেদাদিতি।'[১০২] তবে নব্য বা প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে যেহেতু চিত্ররস স্বীকৃত হয়নি, তাই *তর্কভাষা*কার সর্বসিদ্ধ মধুরাদি ছয় প্রকার রসের কথাই বলেছেন।

● **গন্ধ :–**

'ঘ্রাণ' নামক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিশেষগুণ হল **গন্ধ**। এই গন্ধ গুণ কেবলমাত্র পৃথিবীতে থাকে। এই গন্ধ সুরভি ও অসুরভি ভেদে দুই প্রকার। আপত্তি হতে পারে, গন্ধ যদি পৃথিবীমাত্রবৃত্তি হয়, তাহলে জলাদি পদার্থে গন্ধ গুণের প্রতীতি কীভাবে হয়? এর উত্তরে *তর্কভাষা*কার বলেছেন - "জলাদৌ গন্ধপ্রতিভানং তু সংযুক্তসমবাযেন দ্রষ্টব্যম্।"[১০৩] অর্থাৎ জল প্রভৃতি পদার্থে যে গন্ধ গুণের প্রতীতি হয়, তা মূলত জলাদিতে বিদ্যমান পার্থিব বস্তুর গন্ধই, সংযুক্ত-সমবায়-সন্নিকর্ষের দ্বারা গৃহীত হয়।

তর্কভাষাপ্রকাশকার গন্ধের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যজাতির কথা বলেছেন। কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা*** বা ***সারমঞ্জরী***কার এর লক্ষণ ব্যতীত জলাদি পদার্থে গন্ধ গুণের উপলব্ধির বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।

● **স্পর্শ :–**

তর্কভাষাকার ত্বক্ নামক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিশেষগুণকে **স্পর্শ** বলেছেন। এই স্পর্শ গুণ শীত, উষ্ণ এবং অনুষ্ণাশীত ভেদে তিন প্রকার হয়। সেখানে শীত-স্পর্শ জলে, উষ্ণ-স্পর্শ তেজে এবং অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ পৃথিবী ও বায়ুতে থাকে। অর্থাৎ এট পৃথিব্যাদি চারটি দ্রব্যবৃত্তি হয়। পার্থিব অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ গুণ অনিত্য। পরমাণুরূপ জল, তেজ ও বায়ুতে বিদ্যমান স্পর্শগুণ নিত্য এবং কার্যরূপ জল, তেজ ও বায়ুতে বিদ্যমান স্পর্শগুণ অনিত্য।

পূর্বোক্ত রূপাদি চারটি গুণই মহত্ত্ব-পরিমাণ যুক্ত না হলে এদের প্রত্যক্ষ হয় না। তাই বলা হয়েছে - 'এতে চ রূপাদযশ্চত্বারো মহত্ত্বৈকার্থসমবেতত্বে সত্যুদ্ভূতা এব প্রত্যক্ষাঃ।'[১০৪]

● **সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ :–**

সংখ্যাদি পাঁচটি গুণই সর্বদ্রব্যবৃত্তি সামান্যগুণ। এগুলি পাঁচ প্রকার ব্যবহারের হেতু হয়। তার মধ্যে **সংখ্যা** একত্বাদি ব্যবহারের, **পরিমাণ** মানব্যবহারের, **পৃথকত্ব** পৃথগ্ব্যবহারের, **সংযোগ** সংযুক্ত ব্যবহারের এবং **বিভাগ** বিভক্তপ্রত্যয়ের হেতু।

আকাশাদি নিত্য পদার্থগত একত্বসংখ্যা নিত্য এবং অনিত্য পদার্থগত একত্বসংখ্যা অনিত্য হয়। আবার দ্বিত্বাদি সংখ্যা সর্বদা অনিত্য হয়। ঘটাদি বস্তুগত একত্বসংখ্যা নিজের আশ্রয়ভূত সমবায়িকারণে বর্তমান একত্বসংখ্যা হতে উৎপন্ন হয়।

'অযম্ একঃ', 'অযম্ একঃ' - এরূপ অপেক্ষাবুদ্ধির ফলে, 'ইমৌ দ্বৌ' - এরূপ দ্বিত্বসংখ্যার উৎপত্তি হয়। এই দ্বিত্বের উৎপত্তিতে দুটি দ্রব্য হল সমবায়িকারণ, দুটি দ্রব্যে বিদ্যমান্ একত্বসংখ্যা অসমবায়িকারণ এবং একত্বের অপেক্ষাবুদ্ধি হল নিমিত্তকারণ। অপেক্ষাবুদ্ধির কারণে যেমন দ্বিত্বের উৎপত্তি হয়, তেমনই অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে দ্বিত্বের বিনাশ হয়।

আচার্য প্রশস্তপাদ এই দ্বিত্বের উৎপত্তি ও বিনাশের ক্ষেত্রে যথাক্রমে সাত ও নয় ক্ষণের কথা বলেছেন।[১০৫] তবে উক্ত সকল প্রকার ক্ষণভেদের মূল হল অপেক্ষাবুদ্ধি। তাই *তর্কভাষা*কার সেই অপেক্ষাবুদ্ধিকেই দ্বিত্বের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণরূপে উল্লেখ করেছেন -"...অপেক্ষাবুদ্ধিবিনাশাদেব দ্বিত্ববিনাশঃ। এবং ত্রিত্বাদ্যুৎপত্তির্বিজ্ঞেয়া।"[১০৬] ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার দ্বিত্বের উৎপত্তি বিষয়ে গ্রন্থকারোক্ত প্রতিপদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১০৭] আবার

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার সর্বদর্শনসংগ্রহের শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে, দ্বিত্বের উৎপত্তি বিষয়ে সপ্ত ক্ষণের কথা বলেছেন।[১০৮] কিন্তু ***সারমঞ্জরী***কার সংখ্যার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দ্বিত্বের উৎপত্তি বা বিনাশ বিষয়ক কোন আলোচনা করেননি।

এখন বক্তব্য হল - 'গুণে গুণানঙ্গীকারাত্' - এই নিয়ম অনুসারে গুণপদার্থে গুণ অবৃত্তি হয়। তাহলে কীভাবে একত্বাদি ব্যবহার সম্পন্ন হয়? এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য হল- 'একো ঘটঃ', 'দ্বৌ ঘটৌ', 'একং রূপম্', 'দ্বে রূপে', 'ত্রীণি রূপাণি' ইত্যাদি স্থলে একত্বাদি সংখ্যা যেমন ঘটদ্রব্যে আছে, তেমনই রূপ নামক গুণেও বর্তমান। কিন্তু ঘট-দ্রব্যে একত্ব সমবায়সম্বন্ধে এবং রূপে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে আছে। অর্থাৎ গুণে গুণবৃত্তিতা সমবায়সম্বন্ধে নিষেধ হলেও পর্যাপ্তিসম্বন্ধে নিষেধ হয় না। সেজন্য নব্যগণ এক্ষেত্রে 'পর্যাপ্তি' নামক সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন।

পরিমাণ অণু, মহৎ, দীর্ঘ এবং হ্রস্ব ভেদে চার প্রকার হয়। তার মধ্যে, কার্যদ্রব্যে বিদ্যমান এই চার প্রকার পরিমাণ আবার - সংখ্যা, পরিমাণ ও প্রচয়যোনি ভেদে তিন প্রকার হয়।

সংখ্যার মতো, **পৃথকত্ব**ও একপৃথকত্ব ও দ্বি-পৃথকত্ব ভেদে মূলত দুই প্রকার হয়। তার মধ্যে নিত্যপদার্থগত একপৃথকত্ব নিত্য এবং অনিত্যপদার্থগত একপৃথকত্ব অনিত্য হয়। আর দ্বিপৃথকত্ব সর্বদা অনিত্য হয়।

এই পৃথকত্ব বস্তুর মধ্যে ভেদ জ্ঞাপন করে। আপত্তি হতে পারে, যদি তাই হয়, তাহলে সেই জ্ঞান তো অন্যোন্যাভাবের (ঘটো পটঃ ন) দ্বারাই সম্ভব। তাই অতিরিক্ত 'পৃথকত্ব' নামক গুণ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। বস্তুত তা নয়। কারণ, অন্যোন্যাভাব নিষেধপ্রত্যয়ের বিষয়, আর 'পৃথকত্ব' বিধিপ্রত্যয়ের বিষয়। অর্থাৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্য পার্থক্য বিদ্যমান। উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে, ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার বলেছেন - "নন্বন্যোন্যাভাবনিবন্ধনোঽযং ব্যবহার ইতি চেন্মৈবম্। নঞ্অর্থানুল্লিখিতধীবিষযত্বেন পৃথকস্যাভাবরূপত্বানুপপত্তেঃ পৃথকত্বং সামান্যং নাম বিশ্বান্যোন্যাভাবসমানাধিকরণসমবাযিকারণসমবেতসমবেতত্বরহিতান্যোন্যাভাব-বিরোধিত্বাসমবেতগুণত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ।"[১০৯]

সংযোগ সর্বদা দুটি দ্রব্যের মধ্যে হয়। সেজন্য এটিকে দ্ব্যাশ্রয় এবং অব্যাপ্যবৃত্তি বলা হয়। *তর্কভাষা*কার অন্যতরকর্মজ, উভয়কর্মজ এবং সংযোগজ ভেদে এটি তিন প্রকার হয়।

তার মধ্যে অন্যতরকর্মজ, যথা - ক্রিয়াবান বাজপাখির সঙ্গে নিষ্ক্রিয় স্থাণুর সংযোগ। উভয়কর্মজ, যথা - দুই মল্লযোদ্ধার সংযোগ। সংযোগজ, যথা - হস্তের সঙ্গে বৃক্ষের সংযোগের ফলে বৃক্ষের সঙ্গে শরীরের সংযোগ।

সংযোগের মত, বিভাগও পূর্বোক্ত তিন প্রকার হয়। এই বিভাগে পূর্ব-সংযুক্ত পদার্থগুলি বিভক্ত হয়। ***সারমঞ্জরী***কার *সারমঞ্জরী* ও তৎপ্রণীত *ন্যায়সারে* বিভাগজ বিভাগ ও পাকজোৎপত্তি বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, বৈশেষিক দর্শনে দ্বিত্বসংখ্যা, পাকজোৎপত্তি এবং বিভাগজ-বিভাগের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বলা হয় -

"দ্বিত্বে চ পাকজোৎপত্তৌ বিভাগে চ বিভাগজে।
যস্য ন স্খলিতা বুদ্ধিস্তং বৈ বৈশেষিকং বিদুঃ॥"[১১০]

অর্থাৎ দ্বিত্বসংখ্যা, পাকজোৎপত্তি এবং বিভাগজবিভাগ এই তিনটি বিষয়ে, যাদের বুদ্ধি স্খলিত হয় না, বিদ্বজ্জনেরা তাঁকে বৈশেষিক শাস্ত্রবেত্তারূপে জানেন।

- **পরত্ব ও অপরত্ব :–**

পর এবং অপর ব্যবহারের অসাধারণকারণ হল 'পরত্ব' ও 'অপরত্ব' নামক গুণ। এই দুটি গুণ মূলত দৈশিক ও কালিক ভেদে দুই প্রকার। ব্যবহারের ক্ষেত্রে, দৈশিক পরত্ব দূরত্ব জ্ঞানের এবং দৈশিক অপরত্ব নিকটত্ব জ্ঞানের অসাধারণকারণ। আবার কালিক পরত্ব জ্যেষ্ঠত্ব জ্ঞানের এবং কালিক অপরত্ব কনিষ্ঠত্ব জ্ঞানের অসাধারণকারণ।

- **গুরুত্ব ও দ্রবত্ব :–**

আদ্যপতন এবং সন্দনের অসমবায়িকারণ হল 'গুরুত্ব' এবং 'দ্রবত্ব' নামক গুণ। সংযোগ, বেগ ও প্রযত্ন - এই তিনের অভাবে বস্তুর পতন হয়। এবিষয়ে *তর্কভাষা*কার বৈশেষিক সূত্র উল্লেখপূর্বক বলেছেন - "যথোক্তং - 'সংযোগ-বেগ-প্রযত্নাভাবে সতি গুরুত্বাত্ পতনমিতি'।"[১১১] প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, দ্বিতীয়াদি ক্ষণে বস্তুর যে পতন ঘটে, তার কারণ হল বেগ। বেগে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য গ্রন্থকার 'আদ্য' পদের প্রয়োগ করেছেন। এই বিষয়টি *তর্কভাষাপ্রকাশ* ও *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার উভয়ে উল্লেখ করেছেন।[১১২]

আবার ***সারমঞ্জরী***কার এ বিষয়ে একটু ভিন্ন কথা বলেছেন - "...বস্তুত বেগস্য পূর্বক্রিযাকারণসংযোগাভাবে দ্বিতীযাদিক্রিযান্যথানুপপত্ত্যা কল্পনমত্র গুরুত্বস্য পূর্বক্রিযাকারণস্য সত্ত্বেন তেনৈব দ্বিতীযক্রিযাসংভবাত্ ন তত্র বেগ কল্পনম্। ক্রিযাবিশেষস্যৈব

বেগকারণত্বাত্।"[১১৩] অর্থাৎ পূর্বক্রিয়ার কারণ গুরুত্বের দ্বারাই দ্বিতীয় ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায়, সেখানে বেগের কল্পনা অযৌক্তিক। যেহেতু ক্রিয়ামাত্রের প্রতি বেগ কারণ হয়।

এই দুয়ের মধ্যে গুরুত্ব নামক গুণটি পৃথিবী ও জলে থাকে। অন্যদিকে দ্রবত্ব গুণ পৃথিবী, জল ব্যতীত তেজেও থাকে। ঘি-প্রভৃতি পার্থিব বস্তু এবং সুবর্ণে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব থাকে এবং জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব থাকে।

● **স্নেহ :–**

স্নেহ জলবৃত্তি গুণ পদার্থ। *তর্কভাষা*কার চিক্কণতাদি স্বরূপের দ্বারা এর লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। এভাবে পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা লক্ষণ নির্বচন ন্যায়শাস্ত্রের একট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কারের মতে, পর্যায় কথনের ফলে এর দ্বারা স্নেহত্ব জাতি সূচিত হয়েছে।[১১৪] সক্তু প্রভৃতি পদার্থ বিশেষের সংগ্রহের ফলে যে পিণ্ড উৎপন্ন হয়, সেই পিণ্ডের প্রতি এই স্নেহগুণ অসমবায়িকারণ।

এই স্নেহ কেবলমাত্র জলে থাকে। পরমাণুরূপ জলে নিত্য এবং কার্যরূপ জলে অনিত্য স্নেহ থাকে। এই অনিত্য স্নেহ নিজের আশ্রয়ভূত সমবায়িকারণে বিদ্যমান স্নেহ-গুণ হতে উৎপন্ন হয়। তাই এটি কারণগুণপূর্বক এবং গুরুত্বাদির মত যাবদ্দ্রব্যভাবী।

● **শব্দ :–**

শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিশেষ গুণ হল 'শব্দ'। এটি আকাশের বিশেষ গুণ। এই শব্দ ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক ভেদে দুই প্রকার হয়। ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র হতে উৎপন্ন শব্দ ধ্বন্যাত্মক এবং কণ্ঠতাল্বাদির অভিঘাতে উৎপন্ন শব্দ বর্ণাত্মক।

এখন প্রশ্ন হল, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র যে স্থলে বাজে, সেই স্থলেই শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহলে দূরস্থ পুরুষের কীভাবে সেই শব্দের প্রতীতি হয়? তাই *তর্কভাষা*কারে সেই বিষয়ে আপত্তি তুলে, তার সমাধানে বলেছেন - ভেরী প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন শব্দ 'বীচীতরঙ্গন্যায়' এবং 'কদম্বমুকুলন্যায়ে' ক্রমে শব্দান্তরের উৎপত্তি হতে হতে, অন্তিম শব্দই আমাদের কর্ণগোচর হয়। তাই 'ভেরীশব্দো ময়া শ্রুতঃ'- এরূপ বুদ্ধি ভ্রান্ত। কেননা, আদি বা মধ্যম শব্দের গ্রহণ হয় না।

উক্ত ভেরী হতে উৎপন্ন শব্দের প্রতি ভেরী ও আকাশের সংযোগ হল অসমবায়িকারণ এবং ভেরী ও দণ্ড-সংযোগ হল নিমিত্তকারণ।

এরূপ বাঁশ চেরার সময় যে 'চট্ চট্' শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই শব্দের প্রতি বাঁশের দল ও আকাশের বিভাগ হল অসমবায়িকারণ এবং দুটি বাঁশদলের পরস্পর বিভাগ হল নিমিত্তকারণ। অর্থাৎ ভেরী ও বংশ স্থলে, উৎপন্ন প্রথম শব্দ সংযোগ ও বিভাগের ফলে উৎপন্ন হয়। আবার ভেরী প্রদেশ ও শ্রোতার মধ্যবর্তী যে শব্দগুলি উৎপন্ন হয়, সেই শব্দের পূর্ববর্তী শব্দ হল অসমবায়িকারণ এবং সেই স্থলের অনুকূল বায়ু হল নিমিত্তকারণ। আর পূর্বোক্ত সকল প্রকার শব্দের প্রতি আকাশ হল সমবায়িকারণ। অত এব সংযোগ, বিভাগ এবং শব্দ হতেই শব্দের উৎপত্তি হয়। তাই *তর্কভাষা*কার বৈশেষিক সূত্র উল্লেখপূর্বক বলেছেন - 'যথোক্তম্ - 'সংযোগাত্, বিভাগাত্, শব্দাচ্চ শব্দনিষ্পত্তিঃ।'[১১৫]

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল - মীমাংসকগণ এই শব্দ গুণের নিত্যত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তাই *তর্কভাষা*কার শেষে বিশ্লেষণপূর্বক শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

● **বুদ্ধি :–**

এই **বুদ্ধি** নামক গুণটি অর্থ বা বিষয়ের প্রকাশ করে। তাই *তর্কভাষা*কার এর স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে অর্থের প্রকাশকে বুদ্ধি বলেছেন। ***সারমঞ্জরী***কার উক্ত 'প্রকাশ' শব্দের অর্থ **জ্ঞান** বলে, তার দ্বারা অসৎখ্যাতিবাদের নিরসনের কথা বলেছেন - "অর্থপ্রকাশেতি। প্রকাশো জ্ঞানম্। অর্থজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তেন অর্থবিনৈব জ্ঞানমিত্যসৎখ্যাতিপক্ষো নিরস্তঃ।"[১১৬]

এই বুদ্ধি দুই প্রকার হয়। তারমধ্যে ঈশ্বরীয় বুদ্ধি নিত্য এবং অন্য সকল বুদ্ধি অনিত্য।

● **সুখ ও দুঃখ :–**

সকলের কাছে অনুকূলবেদনীয় পদার্থ হল সুখ। এই সুখ হল প্রীতি বা হর্ষ উৎপাদক গুণ। আবার দুঃখ হল পীড়া নামক গুণবিশেষ। এটি সুখের বিপরীত, অর্থাৎ সকেলর কাছে প্রতিকূলবেদনীয় পদার্থরূপে প্রতিভাত হয়।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার সুখ ও দুঃখ গুণের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'সুখত্বং নাম প্রধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরহিতসমবেতত্বরহিতদুঃখদ্বেষব্যতিরিক্তপ্রত্যক্ষাত্মগুণসমবেতগুণত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য

-জাতিঃ। এতদেব দুঃখসুখপদস্থানে সুখ(দুঃখ) পদং প্রক্ষেপ্য দুঃখত্বস্য লক্ষণম্।'[১১৭] অর্থাৎ সুখত্বাভাবরহিত, দুঃখ ও দ্বেষভিন্ন যে আত্মগুণ, সেই গুণে বিদ্যমান গুণত্বজাতিবিশিষ্ট পদার্থ হল সুখ। আবার দুঃখত্বাভাবরহিত, সুখ ও দ্বেষভিন্ন যে আত্মগুণ, সেই গুণত্বব্যাপ্যজাতিবিশিষ্ট পদার্থ হল দুঃখ।

আবার ***সারমঞ্জরী***কার পূর্বোক্ত দুঃখের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "প্রীতিপদবাচ্যং সুখং সুখত্বজাতিমত্। সুখত্বমনুগতপ্রত্যক্ষেণানুগতেন অহং সুখীত্যাকারেণ ধর্মকার্যতাবচ্ছেদকতযা চ সিদ্ধম্।"[১১৮] অর্থাৎ সুখ হল প্রীতি পদবাচ্য ও সুখত্ব জাতিবিশিষ্ট। অহং সুখী - এরূপ অনুগত প্রতীতির ফলে ধর্মকার্যতার অবচ্ছেদকরূপে সুখত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। এরূপ দুঃখত্ব জাতিবিশিষ্ট হল দুঃখ। সুখত্বের মত দুঃখত্বও অনুগত প্রতীতির দ্বারা অধর্মকার্যতার অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ হয়।

- **ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন :–**

ইচ্ছা হল অনুরাগ বিষয়ক, দ্বেষ হল ক্রোধ বিষয়ক এবং প্রযত্ন হল উৎসাহ বিষয়ক গুণ। পূর্বোক্ত প্রকারে ইচ্ছা হল ইচ্ছাত্বজাতিমতী, দ্বেষ দ্বেষত্বজাতিমান্ এবং প্রযত্ন হল প্রযত্নজাতিমান্। পূর্বোক্ত বুদ্ধাদি ছয় প্রকার গুণই মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়।

- **ধর্ম ও অধর্ম :–**

*তর্কভাষা*কার সুখ বা দুখের অসাধারণকারণকে **ধর্ম** ও **অধর্ম** বলেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার এই দুয়ের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - "ধর্মত্বং নাম সুখসংবিজ্ঞানবিনাশ্য-প্রত্যক্ষত্বানধিকরণসমবেতগুণত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ। এবং সুখপদস্থানে দুঃখপদপ্রক্ষেপে অধর্মস্য লক্ষণং দ্রষ্টব্যম্।"[১১৯]

আবার ***সারমঞ্জরী***কার বলেছেন - "সারসুখাসাধারণকারণবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতিমান্ এবং দুঃখাসাধারণকারণবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতিমান্ ধর্মঃ অধর্মশ্চ।"[১২০] অর্থাৎ উভয়ই গুণত্বব্যাপ্যজাতির দ্বারা ধর্মাধর্মের লক্ষণ নির্বচন করলেও উভয়ের মধ্যে শব্দ চয়নের পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, স্বরূপত এই দুটি গুণ একটি অন্যটির বিপরীত হলেও উভয়ই জীবের কর্মফলস্বরূপ। প্রত্যক্ষত এই দুটি গুণের প্রতীতি না হলেও অনুমান প্রমাণের জানা যায়। *তর্কভাষা*কার - 'দেবদত্তস্য শরীরাদিকং দেবদত্তবিশেষ গুণজন্যং, কার্যত্বে সতি

দেবদত্তস্য ভোগহেতুত্বাত্, দেবদত্তপ্রযত্নজন্যবস্তুবত্' ইত্যাদি অনুমান বাক্যের দ্বারা এই ধর্মাধর্মের অনুমেয়ত্ব সাধন করেছেন।

● **সংস্কার :–**

*তর্কভাষা*কার সংস্কারব্যবহারের অসাধারণকারণকে সংস্কার বলেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার এর লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'সংস্কারত্বং নাম আত্মবিভুবিশেষগুণ-সমবেতসামান্যগুণসমবেতগুণত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ।'[১২১] আপত্তি হতে পারে, সংস্কারের জাতিঘটিত লক্ষণ সংগত নয়। কেননা, সংস্কার অনিত্যপদার্থ। আর জাতি নিত্যপদার্থ। বস্তুত তা নয়। তাই ***সারমঞ্জরী***কার পূর্বোক্ত প্রকার আপত্তি তুলে তার সামাধানে বলেছেন - "সংস্কারেতি। স চ অনিত্যঃ এব। সংস্কারস্য জাতৌ মানাভাবস্য সংস্কারব্যবহার-কারণীভূতজ্ঞানবিষয়ত্বলক্ষণং সূচিতম্। বেগত্বাদিজাতিসত্ত্বাত্ তেন রূপেণ জ্ঞানানাং সংস্কারজনকত্বেন অনুগমাত্ লক্ষণে নিবেশঃ। আত্মবিশেষগুণবৃত্তিমূর্তবৃত্তিবৃত্তিগুণত্ব-সাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্বং লক্ষণম্।"[১২২]

সংস্কার বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক ভেদে তিন প্রকার হয়। তার মধ্যে 'বেগ' নামক গুণটি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন - এই পাঁচটি দ্রব্যে থাকে। 'ভাবনা' নামক গুণটি আত্মাতে থাকে। আর স্থিতি 'স্থাপক' নামক গুণটি স্পর্শবদ্ দ্রব্যে থাকে। পূর্বোক্ত বুদ্ধাদি আটটি এবং ভাবনাখ্য সংস্কার হল আত্মার বিশেষগুণ।

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল ***তর্কভাষপ্রকাশ***কার 'সুখ' হতে আরম্ভ করে 'সংস্কার' পর্যন্ত গুণের মধ্যে ধর্মাধর্ম ও বেগাখ্যসংস্কার বিষয়ে কিঞ্চিত্ মতপ্রকাশ করলেও অন্যান্য গুণবিষয়ে বিশেষ কোন ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার প্রতিটি গুণবিষয়ে বিস্তৃত কোন আলোচনা না করলেও রূপত্বাদি জাতির দ্বারা প্রতিটি গুণের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। তবে তা একটু ক্লিষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু ***সারমঞ্জরী***কার কৃত লক্ষণ সেই তুলনায় একটু সজহবোধ্য।

৬.৪.৩. কর্ম : কেশবমিশ্র **কর্ম** নামক পদার্থটির স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে চলনাত্মক ক্রিয়াযুক্ত পদার্থকে কর্ম বলেছেন। গুণের মতো, এই কর্মও দ্রব্যমাত্রবৃত্তি হয়। এই কর্ম অবিভু দ্রব্যের (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন) সঙ্গে একই অর্থে সমবেত হয়ে, বিভাগ দ্বারা পূর্বসংযোগের নাশ এবং উত্তরসংযোগের হেতু হয়। ক্রিয়াবত্ত্বের জন্য কর্ম পদার্থটিতে মূর্তত্ব বিদ্যমান।

এই কর্মের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার কর্মত্ব জাতিবিশিষ্ট পদার্থকে কর্ম বলেছেন -"চলনেতি। কর্মত্বজাতিমদিত্যর্থঃ।"[১২৩] এরূপ ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারও কর্মত্ব জাতির দ্বারা কর্মলক্ষণ নিরূপণ করলেও তিনি একটু ভিন্ন ভাবে বলেছেন - 'কর্মত্বং নাম গগনসমবেতসমবেতত্বরহিতসত্ত্বাসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ।'[১২৪] 'সত্ত্বাসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতি' বলতে, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব এবং কর্মত্ব - এই তিনটি জাতিকে বোঝায়। কিন্তু 'গগনসমবেতসমবেতত্বরহিত' বলতে, - দ্রব্যত্ব এবং গুণত্ব রহিত বোঝায়। সুতরাং দ্রব্যত্ব এবং গুণত্বরহিত সত্ত্বাসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতি বলতে, কর্মত্বই প্রতিভাসিত হয়।

এরূপ ***সারমঞ্জরী***কার প্রথমে কর্মের জাতিঘটিত লক্ষণ করে, অনুগত প্রতীতির কথা বলেছেন। *তর্কভাষা*কার কর্ম পদার্থকে গুণের মত দ্রব্যবৃত্তিত্বে কথা বলেছেন। *সারমঞ্জরী*কার সেই বিষয়টি উপস্থাপন করে তদতিরিক্ত কর্মের অন্য একটি লক্ষণের কথা বলেছেন - "গুণ ইবেতি কথনেন গুণলক্ষণে স্পন্দপদস্থানে গুণপদপ্রবেশেন সামান্যবানসমবায়িকারণমগুণাত্মা কর্ম ইতি লক্ষণং সূচিতম্।"[১২৫]

এই কর্ম পদার্থটি বিভাগ-দ্বারা পূর্বসংযোগের নাশ হয় এবং উত্তরসংযোগের হেতু হয়। অনেকের মতে, এরূপ কথনের ফলে বৈশেষিকসূত্রোক্ত ('একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষং কারণমিতি কর্মলক্ষণম্' - বৈ.সূ. ১.১.১৭) কর্মলক্ষণ সূচিত হয়েছে। *সারমঞ্জরী*কারের মতে, তা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই তিনি সেই বিষয়ে আপত্তি তুলে, বলেছেন যে, সেরূপ হলে, কর্ম পদার্থের স্বরূপের হানি হবে। অর্থাৎ তারমধ্যে বিভাগ-দ্বারা পূর্বসংযোগের নাশ এবং উত্তরসংযোগের হেতুত্ব সত্তা থাকবে না। এবিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "...কশ্চিত্তু বিভাগদ্বারেতি কথনেন সংযোগবিভাগয়োরসমবায়িকারণং কর্ম ইতি বৈশেষিকসূত্রলক্ষণং সূচিতম্, অনপেক্ষপদস্য অসমবায়িকারণপরত্বাত্। তথা চ সংযোগসমবায়িকারণত্বে সতি বিভাগসমবায়িকারণত্বং লক্ষণং সূচিতমিত্যাহ। তন্ন। পূর্নসংযোগনাশে সতীত্যস্য বৈযর্থ্যাপত্তেঃ।"[১২৬]

প্রথম-ক্ষণে, ঘটাদি মূর্তদ্রব্যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়-ক্ষণে, উক্ত ক্রিয়াদ্বারা পূর্বসংযুক্ত পদার্থে বিভাগ উৎপন্ন হয়। এরূপ তৃতীয়-ক্ষণে কর্মজন্য বিভাগের ফলে পূর্বদেশের সঙ্গে সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং চতুর্থ-ক্ষণে উত্তরদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পূর্বোক্ত বিভাগের প্রতি ঘটনিষ্ঠ কর্ম যেমন অসমবায়িকারণ, সেরূপ উত্তরদেশসংযোগের প্রতিও উক্ত

কর্মই অসমবায়িকারণ। অত এব ঘটনিষ্ঠ কর্মই স্বজন্যবিভাগদ্বারা পূর্বসংযোগের নাশ এবং উত্তরসংযোগের হেতু হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত মতটি যুক্তিযুক্ত নয়।

এরূপ ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার উক্ত কর্ম পদার্থের উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন - এই পাঁচ প্রকার বিভাগের কথা বললেও সেগুলির কোন লক্ষণ নিরূপণ করেননি। তবে ***সারমঞ্জরী***কার প্রতিটি বিভাগের লক্ষণ ও উদাহরণ দিয়েছেন। আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার কর্ম পদার্থের লক্ষণ-ব্যতীত অন্য ব্যাখ্যা করেননি।

এই কর্ম মূর্তদ্রব্যবৃত্তি হওয়ায়, ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার মূর্তের স্বরূপের কথা বলে, কর্মের সেই মূর্তদ্রব্যবৃত্তিত্বের কথা বলেছেন - "ইযত্তাবচ্ছিন্নপরিমাণযোগিত্বং মূর্তত্বমির্ত্যর্থঃ। মূর্তেষু দ্রব্যেষু বর্তত ইত্যুক্তং ভবতি।"[১২৭]

অত এব দেখা যাচ্ছে যে, টীকাত্রয়ে কর্মের জাতিঘটিত লক্ষণ উক্ত হলেও সেখানে ব্যাখ্যান পদ্ধতির বৈষম্য বিদ্যমান।

*তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার এবং *সারমঞ্জরী*কার উভয় কর্মের 'মূর্তদ্রব্যবৃত্তিত্ব' বিষয়টি নিজ নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যা করেছেন।

'কর্মই স্বজন্যবিভাগদ্বারা পূর্বসংযোগের নাশ এবং উত্তরসংযোগের হেতু হয়'- *সারমঞ্জরী*কার এই বিষয়ে আপত্তি তুলে, তার সমাধান দিয়েছেন।

৬.৪.৪. সামান্য : *তর্কভাষা*কার সামান্যপদার্থের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন- "অনুবৃত্তিপ্রত্যযহেতুঃ সামান্যম্। দ্রব্যাদিত্রয়বৃত্তি। নিত্যম্, একম্, অনেকানুগতং চ ; তচ্চ দ্বিবিধং পরমপরং চ...।"[১২৮] অর্থাৎ এই সামান্য হল, অনুবৃত্তিপ্রত্যয়ের হেতু। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম - এই তিনটি পদার্থে সামান্য থাকে। সামান্য নিত্য, এক এবং অনেকের মধ্যে অনুগত। পর এবং অপররূপে এই সামান্য দুই প্রকার। পরসামান্য কেবল অনুবৃত্তিপ্রত্যয়ের হেতু হয় বলে, এটি সামান্যই। আবার অপরসামান্য অনুবৃত্তি এবং ভেদ বুদ্ধি উভয়েরই হেতু হয়। তবে ভেদ বুদ্ধির হেতু হলে, এটি 'বিশেষ' নামে অভিহিত হয়।

'দ্রব্যং সৎ, গুণঃ সন্, কর্মং সৎ' - ইত্যাদি ভাবে তিনটি পদার্থেই সৎ সদ্রূপে অনুগত প্রতীতি হয়। তাই সত্ত্বা হল পরসামান্য। অনেক ধর্মীর মধ্যে একধর্মপ্রকারক একাকারপ্রতীতি উক্ত অনুগত প্রতীতির নিয়ামক। তাই গ্রন্থকার সামান্যকে অনুবৃত্তি প্রত্যয়ের হেতু বলেছেন।

*তর্কভাষাপ্রকাশ*কারের মতে, 'অনুবৃত্তিপ্রত্যযহেতুঃ সামান্যম্' - এটি সামান্যের লক্ষণ নয়। এর দ্বারা সামান্যের প্রামাণ্য নিরূপিত হয়। কেননা, যদি এটিকে সামান্যের লক্ষণ বলা হয়, তাহলে সেই লক্ষণটি উপাধি প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্ত হয়। কাজেই 'নিত্যমেকমনেকানুগতম্' সামান্যের লক্ষণ। তবে উক্ত লক্ষণোক্ত 'একম্' পদটি লক্ষ্যের স্বরূপ বোধনের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তা ব্যাবর্ত্তক নয়। সুতরাং 'নিত্যত্ব সতি অনেকসমবেতত্ব'ই হল সামান্যের লক্ষণ। *তর্কভাষাপ্রকাশ*কারের বলেছেন - "অনুবৃত্তীতি। প্রমাণকথনমেতত্। ন তু লক্ষণম্। উপাধাবতিব্যাপ্তেঃ। লক্ষণমাহ - নিত্যেতি। অত্রৈকমিতি পদং স্বরূপকথনায়। দ্রব্যত্বমেকং গুণত্বমেকমিত্যাদি বোধনায়। লক্ষণং তু নিত্যত্বে সত্যনেকসমবেতত্বম্।"[১২৯] অত এব *তর্কভাষাপ্রকাশ*কার সামান্যের লক্ষণে 'একম্' পদটি সন্নিবেশ করেননি এবং গ্রন্থকারোক্ত 'অনুগত' পদের পরিবর্তে 'সমবেত' পদের প্রয়োগ করেছেন।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার উক্ত 'একম্' পদটি লক্ষণে সন্নিবেশ করেছেন। তবে তিনিও গ্রন্থকারোক্ত 'অনুগত' পদটির পরিবর্তে 'সমবেত' পদের প্রয়োগ করেছেন - 'নিত্যমেকমনেকসমবেতম্ সামান্যম্।'[১৩০] প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, সামান্য লক্ষণে উক্ত এই 'একম্' পদটি ব্যাবর্ত্তক না হওয়ায়, অর্থাৎ কেবল স্বরূপের বোধক হওয়ায়, গ্রন্থান্তরে কোথাও এই পদটি প্রযুক্ত হয়েছে আবার কোথাও বা হয়নি।

এরূপ ***সারমঞ্জরী***কার সামান্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অব্যাপ্তি দোষের কথা বলে, শেষে নিত্য-এক-অনেক-সমবেত্ব বিশিষ্ট পদার্থকে সামান্যে বলে, উক্ত লক্ষণঘটক প্রতিটি পদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন -"...নিত্যমিতি। বহুত্বাদিবারণায নিত্যধ্বংসাপ্রতিযোগিসত্তাবদ্ভিন্নং বা। তাবন্মাত্রং বিশেষাদৌ গতং অতঃ অনেকসমবেতম্। সমবাযস্য স্বরূপাত্মকস্বরূপসংবন্ধেন বিদ্যমানত্বাত্ সমবেতত্বাদেকপদং সমবাযভিন্নপরমিতি।"[১৩১]

সামান্যাদি চারটি পদার্থে জাতি থাকে না। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে, জিজ্ঞাসাপূর্বক বলেছেন - "কথং তর্হি সামান্যাদৌ তদভাবঃ। জাতিবাধকসদ্ভাবাত্ সত্তৈকার্থসমবাযেন সামান্যাদৌ সত্ সদিতি প্রত্যযোৎপত্তেশ্চেত্যলম্।"[১৩২] অত এব সামান্যত্ব, সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব, অভাবত্ব - এগুলি জাতি নয়, উপাধি। যে স্থলে জাতির লক্ষণ প্রসক্ত হয় না, তাকে উপাধি বলা হয়।

*কিরণাবলী*কার ব্যক্তির-অভেদ, তুল্যত্ব, সঙ্কর, অনবস্থা, রূপহানি এবং অসম্বন্ধ - এই ছয়টি জাতিবাধকের কথা বলেছেন, তা এখানে সূচিত হয়েছে। জাতিবাধকের উক্ত বিষয়টি ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ সকলে স্বীকার করলেও ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার এবং ***সারমঞ্জরী***কার সেই বিষয়টি উল্লেখ করেননি। তবে তাঁরা যে সেই বিষয়টি অস্বীকার করেছেন - তা নয়।

ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ বৌদ্ধদের 'অপোহবাদ্' খণ্ডন করে, সামান্য স্বীকারের যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। *তর্কভাষা*কা রও তার অন্যথা করেননি। তিনি উক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করে, নিজ মতে, তা খণ্ডন করেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা*** এবং ***সারমঞ্জরী***তে সেই বিষয়টি বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হলেও ***তর্কভাষাপ্রকাশে*** তার নাম মাত্র উল্লেখ হয়েছে।

৬.৪.৫. বিশেষ : *তর্কভাষা*কার **বিশেষ** নামক পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন- "বিশেষো নিত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ। ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিমাত্রহেতুঃ। নিত্যদ্রব্যাণি ত্বাকাশাদীনি পঞ্চ। পৃথিব্যাদযশ্চত্বারঃ পরমাণুরূপাঃ।"[১৩৩] অর্থাৎ বিশেষ নিত্য, সেজন্য এই পদার্থটি নিত্যদ্রব্যবৃত্তি হয়। এরূপ এই বিশেষ কেবলমাত্র ভেদজ্ঞানের হেতু হয়। নিত্যদ্রব্যগুলি হল আকাশাদি পঞ্চ এবং পৃথিব্যাদি চারটি দ্রব্যের পরমাণু।

তর্কভাষাপ্রকাশকার বিশেষের লক্ষণ করেছেন - 'নিঃসামান্যত্বে সত্যেকমাত্রসমবেতত্বং বিশেষত্বমিত্যর্থঃ।'[১৩৪] অর্থাৎ , যা সামান্যভিন্ন হয়ে, একটি মাত্র দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি হয়, তাই বিশেষ। যেমন - আকাশে আকাশত্ব। আকাশ একটি হওয়ায় একব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম জাতি হয় না। তাই আকাশ 'নিঃসামান্যত্ব' বিশিষ্ট। আবার 'আকাশত্ব' কেবলমাত্র আকাশেই থাকে। অত এব তা 'একমাত্রসমবেত'। এভাবে 'আকাশ' নামক নিত্য দ্রব্যে বিশেষের এই লক্ষণটি প্রসক্ত হয়।

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল, এই আকাশত্ব ধর্মটি কিন্তু জাতির বাধক। কিন্তু 'নিঃসামান্যত্বে সতি বিশেষভিন্নত্বে সতি সমবেতত্বং সামান্যস্য লক্ষণম্' - এরূপ যদি সামান্যের লক্ষণ নিরূপণ করা হয়, তাহলে সেই লক্ষণটি আকাশত্বে প্রসক্ত হয়। কিন্তু একব্যক্তিনিষ্ট ধর্ম জাতি নয়, তাই 'ব্যক্তির অভেদ' নামক জাতিবাধকের দ্বারা আকাশত্বের জাতিত্ব খণ্ডিত হয়।

যদি আপত্তি হয় যে, 'নিঃসামান্যত্বে সত্যেকমাত্রসমবেতত্বং বিশেষত্বম্' - বিশেষের এই লক্ষণটি জাতিবাধকে প্রসক্ত হয়। সেজন্য লক্ষণে 'জাতিবাধকভিন্নত্বে সতি' - এরূপ বিশেষণ সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। তা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, আকাশত্বে জাতির বাধক বর্তমান। অত

এব তাকে 'সামান্য' বলা যাবে না। কিন্তু তাতে বিশেষের লক্ষণ প্রসক্ত হবে না - এরূপ কোন বিনিগমনা নেই।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে*** এই বিশেষ পদার্থের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে - 'অন্যোন্যাভাববিরোধিত্বে সতি সমবেতানধিকরণং সমবায়িকারণং বিশেষ ইতি নিরুক্তিঃ।'[১৩৫] অর্থাৎ যা অন্যোন্যভাবের বিরোধী, অন্যোন্যাভাবের অনধিকরণে সমবেত হয় এবং সমবায়িকারণ, তাই বিশেষ। এই বিশেষ পদার্থটি অন্যোন্যাভাবের বিপরীত। কারণ, ঘটো ন পটঃ - এই স্থলে অন্যোন্যাভাব ঘট ও পট উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্ণয় করে। কিন্তু বিশেষ, উক্ত ঘট বা পটে স্থিত পরমাণুসমূহের মধ্যে পরস্পর ভেদ জ্ঞাপন করে। অত এব অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ হল ঘটাদি অনিত্য বস্তু। আর তার অনধিকরণ হল পরমাণু। অর্থাৎ এই পরমাণুতে বিশেষ থাকে এবং তা সমবায়িকারণ। এভাবে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কারোক্ত বিশেষের এই লক্ষণটি পরমাণুরূপ নিত্যদ্রব্যে প্রসক্ত হয়।

সারমঞ্জরীকার বিশেষ পদার্থের উক্ত স্বরূপটি আর একটু বিস্তৃতভাবে বলেছেন। তাঁর মতে, যদিও বিশেষের নিত্যদ্রব্যবৃত্তিত্বের বলা হয়েছে। তথাপি নিত্যগুণগুলিরও নিত্যদ্রব্যবৃত্তিত্ব হয়। তবে সেরূপ হলেও 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তি-পদার্থবিভাজক-উপাধিমত্ব' হল বিশেষের লক্ষণ। অথবা যা জন্য বা অনিত্য পদার্থে অবৃত্তি হয় এবং পদার্থবিভাজক-উপাধি-বিশিষ্ট হয়, তাই বিশেষ। অথবা যা অনেকাসমবেত, সমবেত এবং সমবেতশূন্য, তাই বিশেষ। 'অনেকাসমবেত' বলতে, - যা অনেকের মধ্যে সমবেত হয় না, এক একটি পদার্থে সমবেত হয়। 'সমবেত' বলতে, যা সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি হয়। 'সমবেতশূন্য' বলতে, যা সামান্য বা সামান্যরহিত।

সংযোগ, বিভাগ, দ্বিত্বসংখ্যা, দ্বিপৃথকত্ব - প্রভৃতি অনেকবৃত্তি গুণ ব্যতিরিক্ত রূপাদি গুণগুলি এবং কর্ম পদার্থটি এক একটি দ্রব্য বৃত্তি হয়। তাই যদি কেবল 'অনেকাসমবেতসমবেতত্বং বিশেষত্বম্' - এরূপ লক্ষণ করা হয়, তাহলে সেই লক্ষণটি রূপাদিতে অতিব্যাপ্ত হবে। সেজন্য লক্ষণে 'সমবেতশূন্য' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। আবার যদি কেবল 'সমবেতসমবেতশূন্যত্বং বিশেষত্বম্' - এরূপ লক্ষণ করা হয়, তাহলে সেই লক্ষণটি সামান্যত্ব প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্ত হবে। সেই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণে 'অনেকাসমবেত'

পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কারণ, 'সামান্য' সমবেতশূন্য বা জাতিশূন্য হলেও অনেক পদার্থে সমবেত হয়। অত এব তা অনেক অসমবেত নয়।

অত এব টীকাকারগণ বিশেষ পদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে, নিজ মতানুসারে সেই বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন।

বিশেষ পদার্থে সামান্য বা জাতি থাকে না। ***তর্কভাষাপ্রকাশে*** তা বোঝাতে, 'নিঃসামান্য' পদের প্রয়োগ হয়েছে। ***সারমঞ্জরী***তে বিশেষ উক্ত স্বরূপটি ব্যক্ত করতে বলা হয়েছে, 'সমবেতশূন্য'। এরূপ, একটি পদার্থে সমবায়সম্বন্ধে একটি করে বিশেষ থাকে, তা বোঝাতে ***তর্কভাষাপ্রকাশে*** বলা হয়েছে, 'একমাত্রসমবেত'। কিন্তু ***সারমঞ্জরীতে*** বলা হয়েছে, 'অনেকাসমবেত'। অত এব দেখা যাচ্ছে যে, টীকাগুলিতে একই বিষয় ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবে শব্দগত পার্থক্য হলেও উভয় টীকাতে প্রায় একই আঙ্গিকে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে*** ঐ দুটি টীকার থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনায় উপরোক্ত বিশেষত্বগুলি দৃষ্ট হয়।

৬.৪.৬. সমবায় : বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত পদার্থগুলির মধ্যে ষষ্ঠ পদার্থ হল **সমবায়**। এটি এক প্রকার সম্বন্ধও। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সম্বন্ধসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। *তর্কভাষা*কার এই সমবায়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "অযুতসিদ্ধযোঃ সম্বন্ধঃ সমবাযঃ। স চোক্ত এব।"[১৩৬] অর্থাৎ অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয় এবং তা বলা হয়েছে। গ্রন্থকারের এরূপ কথনের তাৎপর্য হল, 'কারণ' পদার্থের নিরূপণাবসরে তিনি 'অযুতসিদ্ধসম্বন্ধ' বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাই এখানে তার পুনরুক্তি করেননি।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার বিশেষের লক্ষণ করেছেন - "দ্রব্যত্বসমানাধিকরণত্বে সতি দ্রব্যত্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণঃ সত্ত্বেতরো ভাবঃ সমবায ইতি।"[১৩৭] অর্থাৎ যা সত্তা ভিন্ন, দ্রব্যত্বের অত্যন্তাভাবের সমান অধিকরণ এবং দ্রব্যত্বের সমান অধিকরণবৃত্তি হয়, তাই সমবায়।

আবার ***সারমঞ্জরী***কার প্রথমে সমবায়ে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রদর্শন করে, নিত্যসম্বন্ধকে সমবায় বলেছেন। কিন্তু নব্যমতে ঐ লক্ষণটিতে আত্মাশ্রয় দোষ প্রসক্ত হয়। তাই শেষে

সমবায়ত্ব উপাধিবিশিষ্ট পদার্থকে সমবায় বলেছেন - '...তস্মাত্ সমবায়ত্ববান্ সমবায়ঃ, সমবাযত্বমখণ্ডোপাধিঃ।'[১৩৮]

তবে ***তর্কভাষাপ্রকাশে*** সমবায়ের কোন প্রকার লক্ষণ নিরূপিত হয়নি। সেখানে কেবল গ্রন্থকারোক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দুটি বস্তুর মধ্যে যতক্ষণ না কোন একটির বিনাশ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত একটিকে অপরটি হতে পৃথক্ করা না গেলে, উভয়ের সম্বন্ধকে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। যেমন - অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্, জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যদ্রব্য - এই পাঁচটি যুগলকে অবিনশ্যদ্ অবস্থায় কখনো পৃথক্ করা যায় না। সেজন্য এদের পরস্পরের সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। অর্থাৎ যে সম্বন্ধে অবয়বী তার অবয়বে, গুণ তার আশ্রয় দ্রব্যে (গুণীতে), ক্রিয়া (কর্ম) তার আশ্রয় দ্রব্যে, জাতি ব্যক্তিতে, বিশেষ নিত্যদ্রব্যে ও নিত্যপরমাণুতে বৃত্তি হয়, তাই সমবায়। সমবায় ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ এই স্থলে প্রসক্ত হয় না।

আপত্তি হতে পারে, অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধকে যে, সমবায় বলা হয়েছে, তা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, অবয়ব অতিরিক্ত কোনো অবয়বী নেই। অনেক গুলি অস্থূল পরমাণু একত্রিত হয়ে, ঘটাদির আকার ধারণ করে। অত এব ঘট হল পরমাণুরূপ অবয়বের পুঞ্জীভূত রূপ। সেই অবয়বপুঞ্জই 'এটি ঘট', 'এটি পট' - এইরূপে বিশিষ্ট জ্ঞান হয়। অত এব অবয়ব অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকারের প্রয়োজন নেই।

*তর্কভাষা*কার পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মতের খণ্ডনপ্রসঙ্গে বলেছেন, পরমাণু অতীন্দ্রিয় হওয়ায়, পরমাণুপুঞ্জও অতীন্দ্রিয়। কিন্তু 'এট একটি স্থূল ঘট' - এরূপ প্রত্যক্ষ সকলেরই হয়। ঘটাদি পদার্থকে যদি পরমাণুপুঞ্জ স্বরূপ বলি, তাহলে সেটি অতীন্দ্রিয় হত, প্রত্যক্ষত তার প্রতীতি সম্ভব হত না। কিন্তু বাস্তবে ঘটাদির প্রত্যক্ষ সর্বসম্মত। আর এই প্রত্যক্ষ প্রতীতিকে ভ্রমজ্ঞানও বলা যাবে না। কারণ, সেই বিষয়ে কোনো বাধক নেই। সুতরাং ঘটাদিকে অবশ্যই অবয়বীরূপে স্বীকার করতে হবে। তিনটি টীকাতেই উক্ত বিষয়গুলি পূর্বপক্ষখণ্ডনপূর্বক ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৬.৪.৭. অভাব : দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থ বিধিমুখে প্রত্যয়বেদ্য হওয়ায়, সেগুলি ভাবপদার্থ। কিন্তু অভাব পদার্থের জ্ঞান নিষেধমুখে হয়। সেজন্য *তর্কভাষা*কার সামান্যভাবে অভাব পদার্থকে নিষেধমুখপ্রমাণগম্য বলেছেন। এরূপ ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারও বলেছেন - "অভাবঃ নাম

নঞর্থোল্লিখিতবুদ্ধিবিষয়ঃ। অসমবায়িত্বে সত্যসমবায়ো বা।"[১৩৯] অর্থাৎ নঞ্-পদের দ্বারা যে জ্ঞান বিষয়ের উল্লেখ হয়, তাকে অভাব বলেছেন। অথবা যা সমবায়ভিন্ন দ্রব্যে বৃত্তি হয়েও অসমবায় হয়, সেই পদার্থকে অভাব বলা হয়। অর্থাৎ সমবায় যে দ্রব্যে বৃত্তি হয়, সেখানে অভাব বৃত্তি হতে পারে না। আবার অভাব কোথাও থাকলে, তা স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। তাই টীকাকার অভাবের ঐরূপ বৈকল্পিক-লক্ষণ করেছেন। আবার *সারমঞ্জরী*কার বলেছেন - 'অভাবত্বং সমবায়ৈকার্থসমবায়ান্যতরসম্বন্ধেন সত্ত্বাভাববত্ত্বং, দ্রব্যাদিভিন্নত্বমখণ্ডোপাধির্বা।'[১৪০]

এই স্থলে বক্তব্য যে, *তর্কভাষাপ্রকাশিকা* বা *সারমঞ্জরী*কার নিজ মতানুসারে অভাবের সামান্যলক্ষণ নিরূপণ করলেও *তর্কভাষাপ্রকাশ*কার তা করেননি। তিনি সরাসরি অভাবের বিভাগগুলির ব্যাখ্যা করেছেন।

এই অভাব সংক্ষেপত দুই প্রকার, যথা - সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার, যথা - প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব। টীকাকারগণ নিজ অভিমত অনুসারে অভাবের উক্ত ভেদগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

● **বিজ্ঞানবাদ নিরাস :** বৌদ্ধ দর্শনের চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বাহ্যবিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সেজন্য তাঁরা 'বাহ্যার্থবাদী' নামে পরিচিত। আবার যোগাচার এবং মাধ্যমিক সম্প্রদায় বাহ্যবিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তারমধ্যে মাধ্যমিক সম্প্রদায় 'সর্বশূন্যত্ববাদী' এবং যোগাচার সম্প্রদায় 'বিজ্ঞানবাদী'। বিজ্ঞানবাদীদের মতে, জ্ঞানই একমাত্র প্রমাণসিদ্ধ বিষয়। জ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বাহ্যবিষয় তাঁরা স্বীকার করেন না। এরূপ শাঙ্করদর্শনেও ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে সকল বস্তুই মিথ্যারূপে কল্পিত হয়েছে।

*তর্কভাষা*কার দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থ নিরূপণের পর সেগুলির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে, বিজ্ঞানবাদী ও ব্রহ্মবাদীদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে পূর্বপক্ষ উপস্থাপনপূর্বক বলেছেন - "ননু জ্ঞানাদ্ ব্রহ্মণো বা অর্থা ব্যতিরিক্তা ন সন্তি। মৈবম্। অর্থানামপি প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধত্বেনাশক্যা-পলাপত্বাত্।"[১৪১] অত এব দ্রব্যাদি বিষয়ের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, সেজন্য সেই সকল পদার্থের অপলাপ বা নিষেধ করা যায় না।

৬.৫. বুদ্ধি : কেশবমিশ্র বুদ্ধি নামক প্রমেয় পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রথমে বলেছেন - বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, প্রত্যয় ইত্যাদি পর্যায় শব্দের দ্বারা যা অভিহিত হয়, তাই বুদ্ধি। তারপর বৈকল্পিকভাবে অর্থের প্রকাশকে বুদ্ধি বলেছেন।

সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধাদি শব্দগুলির ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে তা স্বীকৃত হয়নি। অত এব পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা এখানে বুদ্ধির স্বরূপ কথিত হওয়ায়, এখানে সাংখ্যমতও খণ্ডিত হয়েছে। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার গ্রন্থকারের উক্ত অভিপ্রায়টি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'বুদ্ধ্যাদিশব্দানামর্থভেদপ্রতিপাদনপরং সাংখ্যমতং প্রত্যাখ্যাতুং পর্যাযশব্দানাখ্যাতুং বুদ্ধ্যত উপলভতে জানাতি প্রত্যেতীতি সমানার্থতযা প্রযোগদর্শনাৎ প্রদর্শিতা প্রক্রিয়া পরিভাষামাত্রমিত্যলম্।'[১৪২]

আবার ***সারমঞ্জরী***কার এবিষয়ে বলেছেন - "বুদ্ধিং নিরূপযতি। বুদ্ধিত্বং জ্ঞানত্বং পর্যাযরূপং জাতিবিশেষরূপং তদ্বত্বং লক্ষণম্।"[১৪৩] অর্থাৎ বুদ্ধিত্ব এবং জ্ঞানত্ব যেহেতু পর্যায়বাচক, সেজন্য বুদ্ধির লক্ষণও সেই অনুসারে নিরূপিত হয়েছে।

এই 'বুদ্ধি' নামক প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যায় ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার বিশেষ কিছু বলেননি। তবে গুণ-পদার্থের বর্ণনাপ্রসঙ্গেও *তর্কভাষা*কার 'অর্থের প্রকাশ'কে বুদ্ধি বলেছেন। সেখানে *তর্কভাষাপ্রকাশ*কার বলেছেন - "অর্থেতি। বুদ্ধিত্বং লক্ষণমিত্যর্থঃ।"[১৪৪] এতদ্ অতিরিক্ত আর কিছু বলেননি। আবার এই স্থলে বুদ্ধির দুই প্রকার ভেদের মধ্যে কেবল স্মরণের ব্যাখ্যা করেছেন। স্বপ্নাবস্থায় যে, **স্মৃতিপ্রমোষ** নামক এক প্রকার দোষের উদ্ভব হয়। যার ফলে 'তদ্' এর স্থানে 'ইদম্' এর জ্ঞান হয়। সেই বিষয়টি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য হল, ন্যায়মতে, জ্ঞান গৃহীত হয় অনুব্যবসায়ের দ্বারা। প্রথম ক্ষণে 'কিঞ্চিৎ ইদিম্' - এইরূপ নির্বিকল্পকজ্ঞান হয়। তারপর 'ঘটোঽযম্' - এরূপ সবিকল্পকজ্ঞান হয় এবং তারপর 'ঘটবিষয়কঃ জ্ঞানবান্ অহম্' - এরূপ অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর এই অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপিত হয় প্রবৃত্তিসাফল্যমূলক অনুমানের দ্বারা।

কিন্তু ভাট্টমতে, জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য উভয় গৃহীত হয় 'অর্থাপত্তি' নামক প্রমাণের দ্বারা। তাঁরা জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপণ - উভয় ক্ষেত্রে 'জ্ঞাততা' নামক ধর্ম স্বীকার করেন। আর এই 'জ্ঞাততা' ধর্ম নিজের কারণজ্ঞান ব্যতীত উৎপন্ন হতে পারে না। এই

জ্ঞাততার অন্যথা অনুপপত্তি হতে উৎপন্ন 'অর্থাপত্তি' হল উক্ত জ্ঞাততা ধর্মের গ্রাহক। অত এব তাঁদের মতে, জ্ঞান এবং জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী অভিন্ন।

আবার প্রভাকর মতে, জ্ঞান হল স্বপ্রকাশ। এই 'জ্ঞান' নিজেকে, ঘটাদি বিষয়কে এবং নিজের আশ্রয় আত্মাকে একই ক্ষণে প্রকাশ করে। এই বিষয়টিকে ত্রিপুটী-প্রত্যক্ষ বলা হয়।

কিন্তু ন্যায়মতে, 'জ্ঞান' হল অর্থের প্রকাশক। তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, বৈকল্পিকভাবে অর্থের প্রকাশকে বুদ্ধি বলায়, এর দ্বারা পূর্বোক্ত মীমাংসক মতগুলি খণ্ডিত হয়েছে। এ বিষয়ে *তর্কভাষাপ্রকাশিকাতে* বলা হয়েছে - "জ্ঞানস্য স্বজন্যজ্ঞাততাদিপদবেদনীয-প্রকাশানুমেযত্বং মন্যন্তে মীমাংসকাঃ। তন্মতমপাকর্তুমাহ - অর্থপ্রকাশ ইতি।"[১৪৫]

বৌদ্ধযোগাচার মতে, জ্ঞানের আকার ব্যতীত অন্য কোন বাহ্যপদার্থের সত্ত্বা স্বীকৃত হয়নি। এই মতে, জ্ঞানের স্বীয় আকারই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে প্রতিভাসিত হয়। আবার বৈভাষিকগণ জ্ঞানের আকার হতে অর্থের অনুমান করে, অর্থকে অনুমেয় পদার্থরূপে স্বীকার করেন। *তর্কভাষা*কার বুদ্ধির অবান্তরভেদ নিরূপণের পর উক্ত বৌদ্ধ পক্ষদ্বয়ের খণ্ডনের জন্য **সাকারজ্ঞানবাদ** নিরাকরণ করেছেন - "সর্বং চ জ্ঞানং নিরাকারমেব। ন তু জ্ঞানেঽর্থেন স্বস্যাকারো জন্যতে, সাকারজ্ঞানবাদনিরাকরণাত্। অত এবোকারেণার্থানুমানমপি নিরস্তম্। প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাদ্ ঘটাদেঃ। সর্বং জ্ঞানমর্থনিরূপ্যম্, অর্থপ্রতিবদ্ধস্যৈব তস্য মনসা 'ঘটজ্ঞানবানহম্' ইত্যেতন্মাত্রং গম্যতে, ন তু 'জ্ঞানবানহম্' ইত্যেতাবন্মাত্রং জ্ঞানং জাযতে।"[১৪৬] অর্থাৎ সকল জ্ঞানই নিরাকার। অর্থ জ্ঞানে নিজ আকার উৎপন্ন করে না, যেহেতু স্বাকারজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হয়েছে। অত এব এর ফলে আকারের দ্বারা অর্থের অনুমানও খণ্ডিত হয়। যেহেতু ঘটাদি বাহ্যবিষয় প্রত্যক্ষের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং এর জন্য অনুমানের আবশ্যকতা নেই। সকল জ্ঞানই অর্থের দ্বারা নিরূপিত হয়। যেহেতু মনের দ্বারা অর্থের সঙ্গে জ্ঞানের গ্রহণ হয়। আর তাই 'ঘটজ্ঞানবানহম্' ইত্যাদি স্থলে বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানের গ্রহণ হয়। কিন্তু কেবল 'জ্ঞানবানহম্' এরূপ বিষয়রহিত জ্ঞানের গ্রহণ হয় না।

৬.৬. মন : কেশবমিশ্র **মন** নামক প্রমেয় পদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'অন্তরিন্দ্রিযং মনঃ, তচ্চ উক্তমেব।'[১৪৭] অর্থাৎ মন হল অন্তরিন্দ্রিয় এবং তা কথিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হয় যে, গ্রন্থকারের এরূপ কথনের তাৎপর্য কী? এর উত্তর হল, *তর্কভাষা* গ্রন্থে 'মন' নামক প্রমেয় পদার্থটির তিন প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যথা - প্রথমত, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে,

দ্বিতীয়ত, নবম দ্রব্যরূপে এবং তৃতীয়ত, মহর্ষি গৌতম কথিত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে ষষ্ঠ প্রমেয়রূপে। গ্রন্থকার প্রথমে 'ইন্দ্রিয়' নামক প্রমেয় পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে মনকে সুখাদি অন্তর্বিষয় উপলব্ধির 'করণরূপে' বর্ণনা করেছেন। তারপর 'অর্থ' নামক চতুর্থ প্রমেয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে 'নবম দ্রব্যরূপে' মনের উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি 'মনস্ত্ব' জাতির দ্বারা মনের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। অত এব এই স্থলে 'তচ্চ উক্তমেব' ইত্যাদি বাক্যাংশের দ্বারা পূর্বে কথিত বিষয়গুলির কথা বলেছেন।

মনের অনুত্ব নিত্যত্ব প্রভৃতি স্বরূপগুলি পূর্বে দ্রব্য নিরূপণপ্রসঙ্গে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক সুব্যাখ্যাত হয়েছে। পুনরুক্তি দোষ বর্জন হেতু এই স্থলে তা অনুল্লিখিত হল।

একই ভাবে এই স্থলে মনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে *তর্কভাষাপ্রকাশ* বা *সারমঞ্জরী*তে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তার কারণ হিসেবে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে স্পষ্টত বলা হয়েছে - "ক্রমপ্রাপ্তং মনো নিরূপযতি - অন্তরিতি। কিমত্র প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য প্রাগেব নিরূপিতমিত্যাহ - তচ্চেতি। তন্মনঃ প্রমাণবত্তযা দ্রব্যনিরূপণবেলাযামুক্তমিত্যর্থঃ।"[১৪৮]

৬.৭. প্রবৃত্তি : প্র-পূর্বক বৃত্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় যোগে 'প্রবৃত্তি' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। *তর্কভাষা*কার এই **প্রবৃত্তি** নামক প্রমেয় পদার্থের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে প্রবৃত্তিকে ধর্ম এবং অধর্মমী যাগাদি ক্রিয়া বলেছেন। তাঁর মতে, এই প্রবৃত্তির দ্বারা জগতের সকল ব্যবহার সম্পন্ন হয়। তাই বলা হয়েছে - 'প্রবৃত্তিঃ ধর্মাধর্মময়ী যাগাদিক্রিয়া, তস্যা জগদ্-ব্যবহারসাধকত্বাত্।'[১৪৯]

তর্কভাষাপ্রকাশকার এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "ক্রিযাপদমারম্ভপদস্য সূত্রস্থস্য পর্যাযঃ। তথা চ প্রবৃত্তিস্ত্রিবিধা। বাক্-ক্রিযা বুদ্ধিক্রিযা শরীরক্রিযা চেত্যর্থঃ। বচনোৎপাদনদ্বারাদৃষ্টহেতুরনিত্যযত্নো বাগারম্ভঃ। আত্মধর্মোৎপাদনদ্বারা তাদৃশঃ প্রযত্নো বুদ্ধ্যারম্ভঃ। বুদ্ধিশ্চাত্র মনঃ। ভোগাবচ্ছেদকক্রিযা দ্বারা তাদৃশঃ প্রযত্নঃ শরীরারম্ভ ইতি ভাবঃ। ননু প্রবৃত্তের্ধর্মাধর্মহেতুত্বে জগদ্ধেতুত্বং স্যাদিত্যত্রেষ্টাপত্তিমাহ। তস্যা ইতি।"[১৫০] অর্থাৎ এখানে 'ক্রিয়া' পদটি ন্যায়সূত্রস্থিত 'আরম্ভ' পদের পর্যায় শব্দ। প্রবৃত্তি বাচিক, শারীরিক ও মানসিক ভেদে তিন প্রকার হয়। সেখানে অদৃষ্ট হেতু জন্য বাক্যের দ্বারা যে অনিত্য প্রযত্ন উৎপন্ন হয়, তা হল বাচিক আরম্ভ বা ক্রিয়া। এরূপ আত্মা বা মন-ধর্মের দ্বারা উৎপন্ন তাদৃশ প্রযত্ন, মানসিক আরম্ভ এবং ভোগের অবচ্ছেদক শরীরে দ্বারা তাদৃশ প্রযত্ন শরীরারম্ভ। অত এব

*তর্কভাষাপ্রকাশ*কার *ন্যায়সূত্র*কারকে অনুসরণ করে, প্রবৃত্তির বিভাগ নিরূপণ করলেও তিনি নিজ মতানুসারে সেই ত্রিবিধ প্রবৃত্তির বিশেষলক্ষণ প্রতিপাদ করেছেন।

আবার *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার প্রবৃত্তির সেরূপ কোন প্রকার বিভাগের কথা বলেনি। তিনি প্রবৃত্তিকে আয়ুর্ঘিতাদিবৎ সাধ্যবাচক সাধন বলেছেন - "ননু প্রবৃত্তিশব্দেন কথং ধর্মাধর্মাবুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য তত্রোপপত্তিমাহ - প্রবৃত্তিরিতি। আয়ুর্ঘৃতমিত্যাদিবৎসাধ্যবাচিনা সাধনং লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ।"[১৫১] অর্থাৎ ঘৃত যেমন আয়ুবর্ধনের সাধন, সেরূপ প্রবৃত্তিরও ধর্ম ও অধর্ম উৎপাদনের সাধন। কিন্তু প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা কীভাবে ধর্মাধর্ম বুঝবো, তাই গ্রন্থকার প্রবৃত্তিকে ধর্মাধর্মময়ী নামে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু ***সারমঞ্জরী***কার নিজ মতে, প্রবৃত্তির লক্ষণ নিরূপণ করে, তার ব্যাখ্যা করেছেন। এবিষয়ে *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "ধর্মাধর্মজনিকা জন্য কৃতিঃ প্রবৃত্তিঃ। সা যাগাদিবিষযিণীতি কশ্চিত্ তন্ন। ভোজনাদিপ্রবৃত্তাবব্যাপ্তেঃ। বস্তুতঃ প্রকারতাবতী জন্য কৃতিঃ প্রবৃত্তিঃ। জীবনযোনিযত্নবারণায - প্রকারতেতি। ঈশ্বরকৃতিবারণায - জন্যেতি।"[১৫২] অর্থাৎ ধর্মাধর্মজনিকা জন্য কৃতি হল প্রবৃত্তি। কিন্তু প্রবৃত্তি যদি কেবল ধর্ম বা অধর্মমূলক হয়, তাহলে ভোজনাদি প্রবৃত্তিতে সেই লক্ষণটি অব্যাপ্ত হবে। তাই পরে সেই লক্ষণটিকে পরিষ্কার করে, 'প্রকারতাবতী জন্য কৃতি'কে প্রবৃত্তি বলেছেন। এরূপ ঈশ্বরীয় কৃতি বা প্রযত্নে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'জন্য কৃতি' পদ দিয়েছেন। কারণ, ঈশ্বরে যে কর্তৃত্ব ধর্ম থাকে, তা নিত্য। জন্য বা অনিত্য নয়। আবার জীবনযোনি-যত্নে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'প্রকারবতী' পদটি লক্ষণে প্রযুক্ত করেছেন। আমাদের জীবনধারণের জন্য যে প্রাণবায়ু, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া, সেটিও এক প্রকার ক্রিয়া বা প্রযত্নস্বরূপ। এটিও অনিত্য প্রযত্ন। সুতরাং 'জন্য কৃতি'কে প্রবৃত্তি বললে, সেখানে অতিব্যাপ্ত হবে। সেজন্য লক্ষণে 'প্রকারবতী' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কেননা, উক্ত প্রবৃত্তি ধর্মাধর্মাদিমূলক হলেও শ্বাস-প্রশ্বাস বা প্রাণসঞ্চারমূলক নয়। এই শ্বাস-প্রশ্বাস ঈশ্বরের অধীন। কেউ ইচ্ছা করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কিন্তু কেউ অধর্মমূলক প্রবৃত্তি হতে, নিজেকে ধর্মমূলক প্রবৃত্তিতে নিয়োজিত করতে পারবে।

এরূপ ***সারমঞ্জরী***কার অন্যান্য নৈয়ায়িকদের মত প্রবৃত্তির ত্রিবিধ ভেদের কথা না বলে দৈনন্দিন জীবনে সংসারে যে সকল প্রবৃত্তিগুলি দৃষ্ট হয়, সেগুলির কথা বলেছেন - "সা যাগাদিবিষযিণী ধর্মজনিকা, চৌর্যাদিবিষযিণী অধর্মজনিকা। ভোজনাদিবিষযিণী সুখজনিকা।

নিষ্ফলবিষয়িণী দুঃখজনিকেতি দ্রষ্টব্যম্। সা ইচ্ছাজন্যা।"[১৫৩] অর্থাৎ এই সকল প্রকার প্রবৃত্তির মূলে হল ইচ্ছা, এই ইচ্ছা হতেই সকল প্রকার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবনযোনিযত্ন - ভেদে তিন প্রকার প্রযত্নের কথা বলেছেন। সেখানে তিনি চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান এবং উপদানকারণের প্রত্যক্ষজ্ঞানকে প্রবৃত্তির কারণরূপে উল্লেখ করেছেন - "প্রযত্নং নিরূপয়তি - প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-জীবনযোনি-যত্নভেদাৎ প্রযত্নস্ত্রিবিধ ইত্যর্থঃ। চিকীর্ষেত্যাদি।"[১৫] প্রবৃত্তি নামক প্রমেয় বিষয়ে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনায় উপরোক্ত বিশেষত্বগুলি দৃষ্ট হয়।

৬.৮. দোষ : *তর্কভাষা*কার দোষ নামক প্রময়েপদার্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে রাগ দ্বেষ এবং মোহ ভেদে ত্রিবিধ দোষের কথা বলেছেন। এই দোষত্রয়ের মধ্যে রাগ হল অনুরাগ বা ইচ্ছা স্বরূপ, দ্বেষ হল মন্যু বা ক্রোধস্বরূপ এবং মোহ হল বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ। এই দোষপদার্থের ব্যাখ্যায় টীকাত্রয়ে যে বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়, তা হল -

প্রথমত,

যেহেতু, এই দোষ পদার্থের মধ্যে প্রবৃত্তির কারণতা বিদ্যমান। তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "প্রবৃত্তিজনকপ্রত্যক্ষাত্মবিশেষগুণত্বং সামান্যলক্ষণং হৃদি নিধায দোষান্বিভজতে। দোষা ইতি।"[১৫৫] অর্থাৎ তাঁর মতে, যার মধ্যে প্রবৃত্তির জনকত্ব বিদ্যমান, যা প্রত্যক্ষগম্য, আত্মার বিশেষগুণ, তাই দোষ। এরূপ দোষস্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করে, গ্রন্থকার দোষপদার্থের বর্ণনে নিয়োজিত হয়েছেন। প্রায় অনুরূপভাবে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার বলেছেন - 'আত্মানং দূষযন্তীতি দোষা ইত্যর্থং হৃদি নিধাযাহ - দোষা ইতি।'[১৫৬] অর্থাৎ যা আত্মা বা নিজেকে দূষিত করে - এরূপ দোষস্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করে, *তর্কভাষা*কার উক্ত দোষ পদার্থ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অত এব এখানে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের ব্যাখ্যানে পূর্ববর্তী টীকাকারের প্রভাবে দৃষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু ***সারমঞ্জরী***কার একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, 'দোষ' পদের দ্বারাই দোষের সামান্যলক্ষণ সূচিত হয়। অথবা রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা তা সূচিত হয়। তাই *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - 'সামান্যলক্ষণং দোষপদবাচ্যত্বম্। রাগদ্বেষমোহান্যতমত্বং বা।'[১৫৭]

দ্বিতীয়ত,

তর্কভাষাপ্রকাশকারের মতে, রাগ হল অদৃষ্ট ও প্রযত্নের জনক ইচ্ছা। দ্বেষত্ব জাতিবিশিষ্ট পদার্থই দ্বেষ। আর মোহ হল ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান। এ বিষয়ে টীকাতে বলা হয়েছে - "অদৃষ্টজনকপ্রযত্নজনকেচ্ছা রাগঃ। নাতো জীবন্মুক্তেঃ প্রসঙ্গঃ। দ্বেষত্বজাতিমান্দ্বেষঃ। ভ্রমো মোহ ইত্যর্থঃ।"[১৫৮] অর্থাৎ রাগাসক্ত ব্যক্তির কখনও জীবন্মুক্তি হতে পারে না। তার কারণ, ইচ্ছা বলবতী। তাই ইচ্ছাকে যদি সংবরণ করা না যায়, তাহলে কোন কিছুই সম্ভব নয়।

আবার ***সারমঞ্জরী***কার উৎকট ইচ্ছাকে রাগ বলেছেন। এই 'উৎকট' শব্দের অর্থ হল - তীব্র। কোন ব্যক্তির তীব্র বাসনা বা ইচ্ছাই হল রাগ। তবে বাসনা তীব্র হোক বা না হোক, তা ক্ষতিকর। দ্বেষ এবং মোহ বিষয়ে যা বলেছেন, তা *তর্কভাষা*কারের অনুরূপ।[১৫৯] লৌকিকে উৎকটত্ব বিষয়ক কোন প্রমাণ না থাকলেও 'যোগী ব্যক্তিদের রাগ নেই'- এরূপ পৌরাণিক কথন অনুসারে তাদৃশ ইচ্ছা বিশেষকে আমরা রাগ বলে থাকি। এই রাগ বিষয়ক প্রযত্ন ও অদৃষ্টজনকত্বরূপে রাগত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। এরূপ সকল প্রকার পার্থিব বিষয় হতে আসক্তিশূন্য হয়ে বিষ-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়। এর থেকে অনুমিত হয়, দ্বেষের ফলে তিনি সংসারের সকল বিষয় হতে বিতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহননে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আবার ভ্রমস্থলে যে মিথ্যা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেটাই মোহ। এভাবে *সারমঞ্জরী*কার দোষ পদার্থের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার দোষপদার্থের রাগাদি ভেদবিষয়ে সেরূপ কিছু বলেননি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি গ্রন্থকারের ব্যাখ্যাকেই যথোপযুক্ত বলে মনে করেছেন।

৬.৯. প্রেত্যভাব : মৃত্যুর পর জীবের পুনরায় জন্মগ্রহণের বিষয়কে **প্রেত্যভাব** বলা হয়। বস্তুত আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না। কিন্তু শরীরাদির সাথে আত্মার সংযোগ বা বিচ্ছেদই 'জন্মমৃত্যু' নামে অভিহিত হয়। তাই বলা হয়েছে - "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ। স চাত্মনঃ পূর্বদেহনিবৃত্তিঃ, অপূর্বদেহসঙ্ঘাতলাভঃ।"[১৬০] জীবের বিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকনিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই জন্মমৃত্যুর আবর্তন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

তর্কভাষাপ্রকাশকার প্রেত্যভাবের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "আত্মনঃ শরীরাদিদোষ-পর্যন্তেন বিশ্লেষপূর্বকঃ সম্বন্ধঃ প্রেত্যভাব ইত্যর্থঃ।"[১৬১] অর্থাৎ আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে 'শরীর' হতে 'দোষ' পর্যন্ত পদার্থের সঙ্গে আত্মার বিচ্ছেদপূর্বক যে সংযোগ, সেটিই প্রেত্যভাব।

*তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কার প্রাচীন নৈয়ায়িকদের অনুকরণে বলেছেন যে, প্রেত্যভাব যেহেতু মৃত্যুর পর আবার উৎপত্তি, তাই গ্রন্থকার 'পুনঃ' পদের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু নিত্য আত্মার প্রেত্যভাব কীভাবে সম্পন্ন হয়? তাই গ্রন্থকার 'স চাত্মনঃ পূর্বদেহ...' ইত্যাদির দ্বারা সেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[১৬২]

আবার *সারমঞ্জরী*কার এই বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করে বলেছেন, আত্মা যেহেতু নিত্য, তাই এখানে 'উৎপত্তি' বলতে, শরীরান্তরের 'উৎপত্তি' বুঝতে হবে। যদিও বাল্যশরীর ক্রমশ যৌবন ও স্থবির প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে শরীরের গঠনগত বৈশিষ্ট পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ফলে বাল্যশরীরের নাশ হয় এবং যৌবনশরীরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু শরীরের অবস্থান্তরের উৎপত্তি বা বিনাশ হলেও সেই শরীরনিষ্ঠ বিষ্ণুমিত্রত্বাদি জাতি নিত্য। অর্থাৎ সেই জাতির কখনও উৎপত্তি বা ধ্বংস হয় না। তবে সেই বিষ্ণুমিত্রত্বাবচ্ছিন্ন শরীরের নাশে চৈত্রশরীরের উৎপত্তি হয়।[১৬৩]

এই 'প্রেত্যভাব' নামক প্রমেয়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনায় উপরোক্ত বিশেষত্বগুলি লক্ষিত হয়।

৬.১০. ফল : জীব তাঁর কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে। সুখদুঃখাদির সাক্ষাৎকারই ভোগ পদের বাচ্য। তাই *তর্কভাষা*কার বলেছেন -"ফলং পুনর্ভোগঃ, সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারঃ।"[১৬৪] প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এই ফলকে মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

এই ফল পদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** বা ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। 'ফল' বলতে যে, ভোগের কথা বলেছেন, সেই ভোগ মিথ্যাজ্ঞান প্রযুক্ত ব্যক্তিরেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তির তা হয় না। ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার সেই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন।

আবার জীবের জন্মরূপ উৎপত্তি মানেই দুঃখ। এই দুঃখ ভোগের নিমিত্তই জীবের জন্ম হয়। সুতরাং ফলও দুঃখের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর সেই কারণে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ 'শরীর' হতে 'দুঃখ' পর্যন্ত প্রমেয়ের বিষয়কে 'ফল' নামে অভিহিত করেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার সেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

তবে এই বিষয়ে ***সারমঞ্জরী***কার একটু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। *সারমঞ্জরী*তে বলা হয়েছে - "যদ্যপি সুখদুঃখাভাবযোরেব ফলত্বম্। তদর্থা হি বিধিনিষেধপ্রবৃত্তিঃ। তথাপি তযোঃ অজ্ঞাতযোঃ অপুরুষার্থত্বাত্ সাক্ষাৎকারোঽপি ফলম্। বেদাদিনা তৎসাধনকার্যাদেঃ অনববোধনেঽপীষ্টত্বম্।"[১৬৫] টীকাকার এখানে যজ্ঞীয় অপূর্বের কথা বলেছেন। যদিও সুখ বা দুঃখ ভাববিশিষ্ট পদার্থেরই ফলত্ব সিদ্ধ হয় এবং তার বিষয় হল বিধি, নিষেধ ও প্রবৃত্তি। তথাপি অপুরুষার্থ হেতু বিধি নিষেধাদির ফলে উৎপন্ন অপূর্বের সাক্ষাৎকারই 'ফল' নামে অভিহিত হয়। এর ফলে বেদাদি ও তার সাধন যজ্ঞের ফলে উৎপন্ন অপূর্বও ফল পদবাচ্য। টীকাত্রয়ে এভাবে 'ফল' নামক প্রমেয়পদার্থটি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৬.১১. দুঃখ : *তর্কভাষা*কার **দুঃখ** নামক প্রমেয় পদার্থের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "পীড়া দুঃখম্। তচ্চ উক্তমেব।"[১৬৬] অর্থাৎ পূর্বে গুণপদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার দুঃখকে পীড়া বলে, তাকে সকলের প্রতিকূলবেদনীয় পদার্থরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এই স্থলে গ্রন্থকার 'তচ্চ উক্তমেব' বাক্যাংশের দ্বারা সেই বিষয়টি বুঝিয়েছেন। *তর্কভাষা*কার উদ্দ্যোতকরকে অনুসরণ করে, শরীরাদি একবিংশতি প্রকার দুঃখের ভেদ স্বীকার করেছেন। আপত্তি হতে পারে, যদি তাই হয়, তাহলে এখানে তার উল্লেখ নেই কেন? কী করে বোঝা যাবে তিনি একুশ প্রকার দুঃখ স্বীকার করেছেন? এর উত্তর হল, *তর্কভাষা*কার এখানে তার উল্লেখ না করলেও অপবর্গের নিরূপণপ্রসঙ্গে একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলেছেন। সেখানে একুশ প্রকার দুঃখের স্বরূপ বর্ণনা করতে, বলা হয়েছে - "একবিংশতিপ্রভেদাস্তু শরীরং, ষডিন্দ্রিযাণি, ষড় বিষযাঃ, ষড় বুদ্ধযঃ, সুখং, দুঃখং চেতি গৌণমুখ্যভেদাত্। সুখং দুঃখমেব দুঃখানুষঙ্গিত্বাত্। অনুষঙ্গোঽবিনাভাবঃ। স চাযমুপচারো মধুনি বিষসংযুক্তে মধুনোঽপি বিষপক্ষনিক্ষেপবত্।"[১৬৭] অর্থাৎ শরীর, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছয় প্রকার বিষয়, সেই বিষয়ের ছয় প্রকার জ্ঞান, সুখ এবং দুঃখ - এই একুশপ্রকার হল দুঃখ। তারমধ্যে, দুঃখ হল মুখ্য এবং শরীরাদি হল গৌণ। আপত্তি হতে পারে, সুখ কী করে দুঃখ হয়? তাই বলেছেন - অনুষঙ্গাত্। অর্থাৎ দুঃখের সঙ্গে অনুষঙ্গবশত সুখও দুঃখরূপে উপলব্ধি হয়। পুনরায় জিজ্ঞাসা হতে পারে, এই অনুষঙ্গ কি? তাই গ্রন্থকার পরে বলছেন - 'অনুষঙ্গ' হল অবিনাভাব। অর্থাৎ দুঃখ না থাকলে সুখও থাকবে না (তদ্ অসত্ত্বে তদ্ অসত্ত্বা) । কেননা, এই দুটি পদার্থ একটি অপরটির বিপরীত হলেও একে অপরের জ্ঞাপক। *তর্কভাষা*কার দৃষ্টান্ত দিয়ে এই দুটির অনুষঙ্গ বুঝিয়েছেন। যথা - মধু যদি বিষসংযুক্ত হয়, তাহলে বিষের মত মধুও যেমন

ত্যাজ্যবস্তু হয়, সেরূপ উপচারবশত সুখও দুঃখের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় বলে, সেটিও দুঃখই(ত্যাজ্যবস্তু)।

এখন বক্তব্য হল, সুখ না হয় দুঃখের সঙ্গে অনুষঙ্গবশত দুঃখ নামে অভিহিত হয়। কিন্তু শরীরাদিকে কেন দুঃখ বলবো? এর উত্তর হল শরীর দুঃখ ভোগের আশ্রয়। শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মারেই দুঃখ ভোগ হয়। এরূপ ইন্দ্রিয় তার সাধন এবং ঐ সাধন দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ও পরম্পরাক্রমে দুঃখানুষঙ্গ হয়। তাই ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার বিষয়টি বোঝাতে বলেছেন - "ননু দুঃখাদত্যন্তভিন্নানাং শরীরাদীনাং কথং দুঃখশব্দবাচ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য দুঃখপীড়াত্মকেন মুখ্যযা বৃত্ত্যা দুঃখব্যপদেশযোগ্যং শরীরং দুঃখাযতনত্বেন ষটকত্রযং তৎসাধনত্বেন গৌণবৃত্ত্যেত্যাহ - গৌণেতি।"[১৬৮]

প্রসঙ্গত বক্তব্য হল - যাগাদি শুভ কর্মের ফলস্বরূপ লোক স্বর্গ-সুখ লাভ করে। এখন প্রশ্ন জাগে সেই স্বর্গীয়সুখে কীভাবে দুঃখ সম্পৃক্ত হবে? এর উত্তর হল সেই সুখের একটা অবধি আছে। অর্থাৎ সময় বিশেষে সেই সুখের অবসান হবে। তাই *সারমঞ্জরী*কারের মতে, সেই যে নাশজ্ঞান, সেই জ্ঞানজন্য সেখানেও দুঃখ সম্বন্ধিত হবে। তাই তিনি বলেছেন - "দুঃখানুষঙ্গঃ দুঃখসংবলনম্। যদ্যপি স্বর্গাদিসুখস্য ন দুঃখসংবলনম্, তথাপি তন্নাশাদিজ্ঞানাত্ দুঃখোৎপাদাত্ তদপি দুঃখমিত্যুক্তম্।"[১৬৯]

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ আত্মা এবং অপবর্গ ব্যতীত সকল প্রমেয়পদার্থ দুঃখরূপে অভিহিত করেছেন। আবার ঐ সকল দুঃখের মধ্যে শরীর হতে ফলপর্যন্ত পদার্থকে গৌণদুঃখ এবং দুঃখ নামক প্রমেয় পদার্থটিকে মুখ্যদুঃখরূপে উল্লেখ করেছেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কার উক্ত দুঃখের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "পীড়েতি। দুঃখত্বজাতিমদিত্যর্থঃ। সংপ্রদাযস্থাত্মাপবর্গান্যত্বে সতি দুঃখসংবন্ধিপ্রমেয়ত্বমেব দুঃখত্বম্। লক্ষ্যতাবচ্ছেদকং দুঃখত্বমত্র হেযত্বম্...।"[১৭০]

এরূপ ***সারমঞ্জরী***কার দুঃখের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন - "দুঃখেতি পীড়াপদবাচ্যং দুঃখত্বজাতিমদিত্যর্থঃ। দুঃখত্বং জাতিঃ প্রত্যক্ষত্বাদধর্মকার্যতাবচ্ছেদকত্বাচ্চ সিদ্ধম্।"[১৭১] অর্থাৎ দুঃখ সকলের মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায়, তদ্-গত জাতির মানসপ্রত্যক্ষ হয় এবং এটি অধর্মের কার্য হওয়ায়, কার্যতার অবচ্ছেদকরূপেও দুঃখত্ব জাতি সিদ্ধ হয়।

এই দুঃখ নামক প্রমেয়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে টীকাত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনায় পূর্বোক্ত বিশেষত্বগুলি লক্ষিত হয়।

৬.১২. অপবর্গ : কেশবমিশ্র অপবর্গের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন - "মোক্ষোঽপবর্গঃ। স চৈকবিশতিদুঃখপ্রভেদভিন্নস্য দুঃখস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তিঃ।"[১৭২] বস্তুত মোক্ষ এবং অপবর্গ পর্যায় শব্দ। উভয় শব্দই মুক্তি অর্থে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ গ্রন্থকার এখানে পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা অপবর্গের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। তত্ত্বজ্ঞানে প্রযত্নবান্ ব্যক্তি শরীরেন্দ্রিয়াদি একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হতে সেই অপবর্গ লাভ করেন।

তবে দুঃখ যত প্রকারই হোক না কেন, সকল প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে অপবর্গ বুঝতে হবে। কারণ, মহর্ষি গৌতম দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে অপবর্গ বলেছেন। এরূপ সমানতন্ত্রীয় বৈশেষিক দর্শনেও বলা হয়েছে - 'তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ (বৈ.সূ. ৫.২.১৮)।' সূত্রে 'তদভাব' বলতে, অনাগত শরীরের অভাব, 'সংযোগাভাব' বলতে, আত্মার সঙ্গে সেই শরীরের সংযোগের অভাব এবং 'অপ্রাদুর্ভাব' বলতে, শরীরের পুনরায় উৎপত্তির অভাব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সকল প্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হলে শরীরের আর উৎপত্তি হয় না। ফলে আত্মার সঙ্গে শরীর-সংযোগের অভাব ঘটে, সেই অভাবের ফলে জীবাত্মার মুক্তি লাভ হয়।

উক্ত মোক্ষের স্বরূপ নিরূপণপ্রসঙ্গে ***সারমঞ্জরীতে*** বলা হয়েছে - "মোক্ষং লক্ষযতি - মোক্ষ ইতি। স্বসমানাধিকরণস্বাসমানকালীনদুঃখধ্বংসঃ।"[১৭৩] এখানে **স্ব**-পদের দ্বারা দুঃখকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ দুঃখের সমান অধিকরণ এবং দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংসই হল মোক্ষ। কিন্তু 'ধ্বংসাভাব' মাত্রই মুক্তি নয়, কেননা, তাহলে ঘটাদির ধ্বংসকেও মোক্ষ বলতে হবে। তাই 'দুঃখধ্বংস' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। এরূপ সংসারকালীন দুঃখধ্বংসে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য সেই দুঃখধ্বংসের বিশেষণরূপে 'অসমানকালীনত্ব' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কারণ, সংসারদশায় প্রতিনিয়ত দুঃখের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়। পূর্বোক্ত একুশ প্রকার দুঃখের মধ্যে, যে সময় একটি দুঃখের ধ্বংস হয়, সেই সময় অন্য একটি দুঃখের উৎপত্তি হয়। অত এব 'সংসারকালীন দুঃখধ্বংস' দেবদত্তাদি আত্মাস্থিত অন্য দুঃখের সমকালীন। কিন্তু সেই দুঃখধ্বংসই মোক্ষ, যে দুঃখধ্বংসে সেই অধিকরণে আর অন্য কোন দুঃখের উৎপত্তি হবে না। অর্থাৎ যে দুঃখধ্বংস অন্য দুঃখের অসমানকালীন।

আবার যদি কেবলমাত্র 'অসমানকালীনদুঃখধ্বংস'কে মোক্ষ বলা হয়, তাহলে মহাপ্রলয়ে জীবের সকল প্রকার দুঃখের ধ্বংস হওয়ায়, আর ঐ দুঃখ অন্য কোন দুঃখের সমকালীন না

হওয়ায়, তাতে মোক্ষের এরূপ লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হবে। কিন্তু মহাপ্রলয়ের পূর্বে দেবদত্তাদি আত্মাস্থিত দুঃখধ্বংস, যজ্ঞদত্তাদি আত্মাস্থিত দুঃখের সমকালীন। অত এব এক্ষেত্রে লক্ষণটি মোক্ষে প্রসক্ত হয় না। তাই লক্ষণে 'স্বসমানাধিকরণ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ দুঃখের সমান অধিকরণ এবং অসমকালীন দুঃখধ্বংসকেই মোক্ষ বলা হবে। সুতরাং দেবদত্তাদি দুঃখধ্বংস, যজ্ঞদত্তাদি দুঃখের সমকালীন হলেও সমান অধিকরণ না হওয়ায়, পূর্বোক্ত 'স্বসমানাধিকরণস্বাসমানকালীনদুঃখধ্বংস' - মোক্ষের এরূপ লক্ষণ সকল প্রকার দোষরহিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথও অপবর্গসূত্রের ('তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ' - ন্যা.সূ. ১.১.২২) বৃত্তিতে মোক্ষ বা অপবর্গের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনিও একই অধিকরণে অসমানকালীন দুঃখধ্বংসকে মোক্ষ বলেছেন।[১৭৪]

অত এব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্ত বা ধ্বংস হল মোক্ষ বা অপবর্গ। এখন প্রশ্ন হল, সেই অপবর্গ প্রাপ্তির উপায় কী? অথবা কীভাবেই বা আমরা তা লাভ করতে পারি? তাই *তর্কভাষা*কার জিজ্ঞাসাপূর্বক সেই বিষয়ে মুমুক্ষুর অবশ্যকর্তব্য কর্মের উল্লেখ করেছেন - "স পুনরপবর্গঃ কথং ভবতি? উচ্চতে। শাস্ত্রাদ্ বিদিতসমস্তপদার্থতত্ত্বস্য, বিষযদোষদর্শনেন বিরক্তস্য মুমুক্ষোঃ, ধ্যাযিনো ধ্যানপরিপাকবশাত্ সাক্ষাৎকৃতাত্মনঃ ক্লেশহীনস্য নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানাদনাগতধর্মাধর্মাবনর্জযতঃ পূর্বোৎপাত্তং চ ধর্মাধর্মপ্রচযং যোগপ্রভাবাদ্ বিদিত্বা সমাহৃত্য ভুঞ্জানস্য পূর্বকর্মনির্বৃত্তৌ বর্তমানশরীরাপগমেঽপূর্বশরীরাভাবাচ্ছরীরাদ্যেক-বিংশতিদুঃখসম্বন্ধো ন ভবতি কারণাভাবাত্। সোঽযমেকবিংশতিপ্রভেদভিন্নদুঃখহানির্মোক্ষঃ। সোঽপবর্গ ইত্যুচ্যতে।"[১৭৫] অর্থাৎ অধিকারী প্রথমে শাস্ত্রবিদিত পদার্থতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করবেন, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানজন্য মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তারপর জাগতিক সকল বিষয়ের দোষ দর্শন করে, মোক্ষের নিমিত্ত ধ্যান করবেন। এভাবে সেই মুমুক্ষুর ধ্যান পরিপক্ক হলে, আত্মসাক্ষাৎকার হওয়ায়, সে অবিদ্যা, অস্মিতাদি ক্লেশহীন হয়। তারপর ক্লেশহীন হওয়ায়, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই মুমুক্ষুর আর নতুন ভাবে ধর্মাধর্ম উপার্জিত হয় না।

এভাবে যোগবলে পূর্বার্জিত ধর্মাধর্ম জ্ঞাত হয়ে, সেই সব কর্মফল ভোগ করার ফলে পূর্বকর্মের নিবৃত্তি হলে, বর্তমান শরীরের নাশ হয়। তারপর ধর্মাধর্মরূপ কারণের অভাবে নতুন শরীর উৎপন্ন না হওয়ায়, আত্মার সঙ্গে একবিংশতি প্রকার দুঃখের আর সম্বন্ধ হয় না।

জীবের সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। আর এরূপ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে জীব অপবর্গ লাভ করে।

তিনটি টীকাতেই *তর্কভাষা*কারোক্ত এই বিষয়গুলির প্রতিপদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন - 'ক্লেশহীনস্য' পদটির অর্থ ***তর্কভাষাপ্রকাশে*** বলা হয়েছে - 'হীনস্যেত্যনেন মিত্যাজ্ঞানাদিধ্বংস।'[১৭৬] এরূপ ***সারমঞ্জরী***তে বলা হয়েছে - 'ক্লেশহীনস্য মিথ্যাজ্ঞানবাসনাদি হীনস্য।'[১৭৭] আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে বলা হয়েছে - 'ক্লেশা রাগদ্বেষমোহা ইত্যর্থঃ।'[১৭৮] অর্থাৎ টীকাত্রয়ে একই বিষয়ই ভিন্ন শব্দ প্রয়োগের দ্বারা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

উপসংহার :

এই গবেষণানিবন্ধের মূল্যায়নে তিনটি টীকা হতে উপস্থাপিত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় যে বিশেষত্বগুলি উপলব্ধ হয়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল -

ক. ন্যায় ও বৈশেষিকসম্মত **আত্মার** স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে *তর্কভাষা*কার আত্মাকে দেহাদিব্যতিরিক্ত, প্রতি শরীরে ভিন্ন, বিভু ও নিত্য পরিমাণ বলেছেন। আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন হতে অতিরিক্ত। তাই গ্রন্থকার তাকে দেহাদিব্যতিরিক্ত বলেছেন। সুখাদির বৈচিত্রবশত আত্মা প্রতিশরীতে ভিন্ন। প্রতি শরীরে আত্মার সুখদুঃখাদি কার্য উপলব্ধ হওয়ায়, আত্মা বিভু। বিভুত্বের জন্য আকাশাদির মত নিত্য।

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার আত্মার এতাদৃশ স্বরূপগুলির মধ্যে **'প্রতি শরীরে ভিন্ন'** - এর দ্বারা একাত্মবাদীদের খণ্ডনের কথা বলেছেন। কারণ, অদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তাঁদের কাছে অন্য সকল জাগতিক বিষয় মিথ্যারূপে কল্পিত হয়। আকাশ এক হয়েও যেমন উপাধিভেদে ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেরূপ ব্রহ্ম এক হয়েও অবিদ্যা প্রযুক্ত হয়ে জীবাত্মারূপে তার ব্যপদেশ হয়। এরূপ চেতন পদার্থ এবং অচেতন ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, তা স্বীকৃত হয়নি। তাই *তর্কভাষা*কার প্রতি শরীরে আত্মার ভিন্নতার কথা বলেছেন।

'বিভু' - এর দ্বারা ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার অণুপরিমাণবাদী রামানুজ ও মধ্যম পরিমাণবাদী জৈনদের খণ্ডনের কথা বলেছেন। রামানুজ মতে, আত্মা অণুপরিমাণ। তাঁদের মতে, চুলের অগ্রভাগকে শত-ভাগে বিভক্ত করে, তারপর ঐ শত ভাগের এক ভাগকে পুনরায় শতভাগে কল্পনা করলে, যে সূক্ষ্মপরিমাণ পাওয়া যাবে, সেটাই জীবাত্মার পরিমাণ বুঝতে হবে। আবার জৈন মতে, প্রাণীর পরিমাণ অনুসারে সেই প্রাণীতে স্থিত আত্মার পরিমাণ বুঝতে হবে। অর্থাৎ পিপিলিকার আত্মা গজে বর্তমান আত্মার তুলনায় সল্পাকৃতির। অত এব জৈনমতে, আত্মা দেহ বা মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট, সংকোচ-বিকাশশীল পদার্থ। কিন্তু আত্মা যদি অণুপরিমাণ হয়, তাহলে তার অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রসঙ্গ আসবে। কেননা, অণুপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ

সর্বদা অতীন্দ্রিয় হয়। আবার যদি মধ্যম বা দেহ পরিমাণ হয়, তাহলে পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু প্রভৃতি কল্পনা-গৌরব দোষ উপস্থিত হবে। এরূপ মধ্যম বা দেহপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ সাবয়বযুক্ত হওয়ায়, আত্মাতে অনিত্যত্বও প্রসক্ত হবে। কাজেই আত্মাকে পরমমহৎ বা বিভু পরিমাণ পদার্থরূপে স্বীকার করতে হবে। আর সেজন্যই *তর্কভাষা*কার আত্মার বিভুত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

'নিত্য' - এর দ্বারা ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধদের খণ্ডনের কথা বলেছেন। কারণ, বৌদ্ধগণ, সংজ্ঞা, রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা ও সংস্কার - এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিকে আত্মা বলেছেন। এই পঞ্চ স্কন্ধ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। সুতরাং তাঁদের মতে, আত্মা ক্ষণিক। কিন্তু ন্যায় মতে, আত্মা যদি ক্ষণিক হয়, তাহলে প্রত্যভিজ্ঞার কোন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। তাই আত্মাকে নিত্য স্বীকার করতে হবে।

এভাবে *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*তে পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক আত্মার পূর্বোক্ত স্বরূপগুলি প্রতিপাদিত হয়েছে। যার দ্বারা জিজ্ঞাসু পাঠক সহজেই পরতন্ত্র খণ্ডনপূর্বক ন্যায়সম্মত আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবে। অন্য দুটি টীকাতে এভাবে আত্মস্বরূপ ব্যাখ্যানে পূর্বপক্ষ খণ্ডনের কথা বলা হয়নি। অত এব এক্ষেত্রে এই টীকাটির গুরুত্ব বা অবদান কতখানি তা সহজেই অনুমেয়।

খ. শরীর নামক প্রমেয় পদার্থের বর্ণনাবসরে *তর্কভাষা*কার চেষ্টার আশ্রয়কে শরীর বলেছেন। আপত্তি হতে পারে, মৃত-শরীরে চেষ্টা থাকে না। কিন্তু শরীর থাকে। তাহলে চেষ্টার আশ্রয়কে কীভাবে শরীর বলা যায়? এরূপ জিজ্ঞাসার নিরসন করতে, বিষয়টি তিনটি টীকাতেই পর্যালোচিত হয়েছে। যেমন - ***তর্কভাষাপ্রকাশ***কারের মতে, চেষ্টাবদ্ অন্ত্যাবয়বিত্বধর্মবিশিষ্ট পদার্থকে যদি শরীর বলা হয়, তাহলে লক্ষণটিতে কোন প্রকার দোষ প্রসক্ত হয় না। জীবিত বা মৃত উভয় শরীরেই তা প্রসক্ত হবে। কারণ, চেষ্টা না থাকলেও তাতে অন্ত্যাবয়বিত্বরূপ ধর্ম থাকবে। কেননা, হস্তাদি অবয়বগুলি তখনও সেখানে বিদ্যমান। এরূপ ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কারের মতে, মৃত-শরীরটিও যেহেতু পূর্বে কোন আত্মার ভোগ বা চেষ্টার আশ্রয় ছিল। সেজন্য বর্তমানেও পূর্বের সেই ব্যবহার অনুসারে মৃত-শরীরকেও শরীর বলতে হবে। আবার ***সারমঞ্জরী***কারের মতে, মৃত-শরীরে চেষ্টাদি ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয় না ঠিকই সেই শরীরে তখনও সেই শরীরগত জাতি বিদ্যমান থাকে। আর তাই সেই অবস্থাতেও তাতে

'বিষ্ণুমিত্রোঽয়ম্' - এরূপ প্রতীতি হয়। এর ফলে সেই শরীরে 'বিষ্ণুমিত্রত্ব' জাতি যে বিদ্যমান, তা বোঝা যায়। সুতরাং মৃত-শরীরে চেষ্টা না থাকলেও টীকাকারদিগের পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে আমরা তাকে শরীর বলতে পারি।

গ. *তর্কভাষা*কার **ইন্দ্রিয়** নামক প্রমেয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ঘ্রাণ, রাসন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ছয় প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। এখন বক্তব্য হল, কোন কোন সংখ্যাচার্যের মতে, ঘ্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বগিন্দ্রিয় সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হওয়ায়, চক্ষুরাদি অন্য সকল ইন্দ্রিয় স্বীকারের প্রয়োজন নেই। যেহেতু ত্বগিন্দ্রিয় শরীরের সর্বত্র থাকে, তাই চক্ষু স্থানগত ত্বগিন্দ্রিয়ই রূপের প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং চক্ষু স্থানগত ত্বগিন্দ্রিয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। বস্তুত তা যুক্তি যুক্ত নয়। কেননা, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণ বিশেষের গ্রহণ হয়, সেই ইন্দ্রিয় সেই গুণগ্রাহক নামে অভিহিত হয়। যেমন - গন্ধ গ্রাহক ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ, রস গ্রাহক ইন্দ্রিয় রসনা ইত্যাদি। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলি প্রতিনিয়ত উৎকর্ষপ্রযুক্ত হয়ে নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। তাই সকল ইন্দ্রিয়ে ত্বগিন্দ্রিয়র সত্তা বর্তমান হলেও, ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় হতে পারে না। তাহলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের উপলব্ধি হত না। অন্ধব্যক্তিরও স্পার্শন প্রত্যক্ষের দ্বারা রূপের উপলব্ধি হত, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সুতরাং বিষয়ব্যবস্থা অনুসারে ইন্দ্রিয়ের পূর্বোক্ত ভেদ স্বীকার করতে হবে। এভাবে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার পূর্বোক্ত সাংখ্যমতের খণ্ডন করে, সেই বিষয়ে স্বাভিমত ব্যক্ত করেছেন। যার দ্বারা সহজেই পাঠকের ন্যায় ও বৈশেষিকসম্মত ইন্দ্রিয়ের প্রকার বিষয়ে যথাযথ বোধ উৎপন্ন হবে।

ঘ. *তর্কভাষা*কার **অর্থ** নামক প্রমেয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ন্যায় ও বৈশেষিকের সমানতন্ত্রীয়তা প্রদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থ এবং সপ্তম পদার্থ অভাবের বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থকার পৃথিব্যাদি চারটি কার্য দ্রব্যের বর্ণনার পর ন্যায় ও বৈশেষিকসম্মত উৎপত্তি ও বিনাশ ক্রমের আলোচনা করেছেন। সেখানে গ্রন্থকার প্রথমে উৎপত্তির কথা বলেছেন। **আপত্তি হতে পারে,** প্রশস্তপাদার্য প্রথমে সংহার বা বিনাশের কথা বলে, তারপর উৎপত্তির কথা বলেছেন। তাহলে *তর্কভাষা*কার কেন প্রথমে উৎপত্তির কথা বললেন? এর উত্তর আমরা ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে, উৎপন্ন বস্তুরই বিনাশ হয়। অনুৎপন্ন বস্তুর কখনও বিনাশ হতে পারে না। তাই গ্রন্থকার প্রথমে উৎপত্তির কথা বলে, শেষে

বিনাশের কথা বলেছেন। এক্ষেত্র টীকাকারের যুক্তিটি গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিনাশের পর নতুন সৃষ্টি হলেও সেই বিনাশ কিন্তু সৃষ্ট বস্তুরেই হয়।

ঙ. *তর্কভাষা*কার ধর্মাধর্মরূপ যাগাদি ক্রিয়াকে **প্রবৃত্তি** বলেছেন। তবে সেখানে তিনি উক্ত প্রবৃত্তির কোন প্রকার ভেদের কথা বলেননি। ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** ও ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার *ন্যায়সূত্র*কারকে অনুসরণ করে জীবের শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। কিন্তু ***সারমঞ্জরী***কার সেই বিষয়টি একটু ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করে, দৈনন্দিন জীবনে যে সকল প্রবৃত্তি হয়, সকল প্রকার প্রবৃত্তির কথাই বলেছেন। যেমন - যাগাদি বিষয়ক, চৌর্যাদি বিষয়ক, ভোজনাদি বিষয়ক, নিষ্ফল কর্মবিষয়ক প্রভৃতি। যেহেতু ইচ্ছা শক্তি বলবতী। তাই সকল প্রকার প্রবৃত্তির মূল হল ইচ্ছা। প্রসঙ্গত এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যেমন - গোবর-পোকা যদি প্রজাপতির সঙ্গ লাভ করত, তাহলে সে সেই সদ্-ইচ্ছাবশত গোবরের রস ছেড়ে ফুলের মধু সেবন করতে পারত। বাস্তবে সমাজের ক্ষেত্রে তা খুবই প্রাসঙ্গিক, মানুষ তার ইচ্ছাগুলোকে পরিবর্তন করলে, উন্নততর সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

চ. *তর্কভাষা*কারের মতে, মোক্ষ হল অপবর্গ। আর তা একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির দ্বারা হয়। সেই অপবর্গ লাভের উপায় প্রসঙ্গে বলেছেন - ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা পুরুষ, যিনি সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে, বিষয়সমূহের দোষ দর্শন করে, বিরক্ত হয়েছেন, সেই মুমুক্ষু যোগসমাধির দ্বারা একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির লাভ করেন। ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** এবং ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে গ্রন্থকারোক্ত অপবর্গের স্বরূপ ও তা লাভের উপায় যথাযথ ব্যাখ্যাত হলেও, অপবর্গের কোন প্রকার লক্ষণ নিরূপিত হয়নি। কিন্তু ***সারমঞ্জরী***তে স্বসমানাধিকরণ স্ব-অসমানকালীন দুঃখধ্বংস'কে মোক্ষ বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে - "মোক্ষং লক্ষযতি - মোক্ষ ইতি। স্বসমানাধিকরণস্বাসমান-কালীনদুঃখধ্বংসঃ।" এখানে **স্ব**-পদের দ্বারা দুঃখকে বুঝতে হবে। দুঃখের সমান অধিকরণ এবং দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংসই মোক্ষ। 'ধ্বংসাভাব' মাত্রই মুক্তি নয়, কেননা, তাহলে ঘটাদির ধ্বংসকেও মোক্ষ বলতে হবে। তাই 'দুঃখধ্বংস' পদটির গ্রহণ হয়েছে। এরূপ সংসারকালীন দুঃখধ্বংসে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য সেই দুঃখধ্বংসের বিশেষণরূপে 'অসমানকালীনত্ব' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কারণ, সংসারদশায় প্রতিনিয়ত দুঃখের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়। পূর্বোক্ত

একুশ প্রকার দুঃখের মধ্যে, যে সময় একটি দুঃখের ধ্বংস হয়, সেই সময় অন্য একটি দুঃখের উৎপত্তি হয়। অত এব 'সংসারকালীন দুঃখধ্বংস' দেবদত্তাদি আত্মাস্থিত অন্য দুঃখের সমকালীন। কিন্তু সেই দুঃখধ্বংসই মোক্ষ, যে দুঃখধ্বংস অন্য দুঃখের অসমানকালীন। আবার যদি কেবলমাত্র 'অসমানকালীনদুঃখধ্বংস'কে মোক্ষ বলা হয়, তাহলে মহাপ্রলয়ে জীবের সকল প্রকার দুঃখের ধ্বংস হওয়ায়, এবং ঐ দুঃখ অন্য কোন দুঃখের সমকালীন না হওয়ায়, তাতে মোক্ষের এরূপ লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু মহাপ্রলয়ের পূর্বে দেবদত্তাদি আত্মাস্থিত দুঃখধ্বংস, যজ্ঞদত্তাদি আত্মাস্থিত দুঃখের সমকালীন। অত এব এক্ষেত্রে লক্ষণটি মোক্ষে প্রসক্ত হয় না। তাই লক্ষণে 'স্বসমানাধিকরণ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ দুঃখের সমান অধিকরণ এবং অসমকালীন দুঃখধ্বংসকেই মোক্ষ বলা হবে। সুতরাং দেবদত্তাদি দুঃখধ্বংস, যজ্ঞদত্তাদি দুঃখের সমকালীন হলেও সমান অধিকরণ না হওয়ায়, পূর্বোক্ত 'স্বসমানাধিকরণস্বাসমানকালীনদুঃখধ্বংস' - মোক্ষের এরূপ লক্ষণ করলে, তা সকল প্রকার দোষরহিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এরূপ নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথও অপবর্গসূত্রের ('তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ') বৃত্তিতে মোক্ষ বা অপবর্গের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এভাবে অন্যান্য পদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেও এই টীকাটিতে প্রায়শ নব্য ন্যায়ের শৈলী অনুসৃত হয়েছে। শৈলী অনুসারে *তর্কভাষা* প্রাচীন-ন্যায়ের গ্রন্থ হলেও ***সারমঞ্জরী***কারের এরূপ ব্যাখ্যানের ফলে পাঠক সহজে নব্য ন্যায়ের আঙ্গিকে পদার্থতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

ছ. নির্বাচিত তিনটি টীকাতেই *তর্কভাষার* প্রতিটি পদের যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষিত হয়। যেমন - স্থল-বিশেষে পরমত খণ্ডন করা হয়েছে। ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা*** নামক টীকাটিতে তার প্রবনতা একটু বেশী। আবার কোন কোন স্থলে পূর্বাচার্যদের কোন অনবদ্য আলোচনা গৃহীত হয়েছে। যেমন 'দোষ' নামক প্রমেয়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ***তর্কভাষাপ্রকাশ*** টীকাতে বলা হয়েছে - "প্রবৃত্তিজনকপ্রত্যক্ষাত্মবিশেষগুণত্বং সামান্যলক্ষণং হৃদি নিধায দোষান্বিভজতে। দোষা ইতি।" এরূপ প্রায় একই ভাবে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে বলা হয়েছে - 'আত্মানং দূষযন্তীতি দোষা ইত্যর্থং হৃদি নিধাযাহ - দোষা ইতি।' অত এব, এক্ষেত্রে ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***কার পূর্ব টীকাকারকে অনুসরণ করে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে প্রতিপাদিত দ্রব্যাদি পদার্থের লক্ষণ একটু ক্লিষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু সেই তুলনায় ***সারমঞ্জরী*** বা ***তর্কভাষাপ্রকাশে*** একটু সহজ করে বলা হয়েছে। যেমন -

তর্কভাষাপ্রকাশিকাকার তেজ দ্রব্যের লক্ষণ করেছেন - 'তেজস্ত্বং নাম উষ্ণস্পর্শবদ-সমবেতত্বরহিতস্পর্শরহিতসমবেতত্বরহিতং জাতিঃ।' অর্থাৎ উষ্ণস্পর্শযুক্ত, তেজভিন্ন দ্রব্যত্ব রহিত, স্পর্শ (শীত-অনুষ্ণাশীতস্পর্শ) ভিন্ন গুণত্বরহিত জাতি হল তেজস্ত্ব। আর এই তেজস্ত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হল তেজ। আবার ***সারমঞ্জরী***কার বলেছেন - 'তেজস্ত্বম্ উষ্ণস্পর্শ-সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতযা সিদ্ধা জাতিঃ।' অর্থাৎ উষ্ণস্পর্শের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে তেজস্ত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। আর এই তেজস্ত্ব জাতি বিশিষ্ট পদার্থই হল তেজ। উভয়েই তেজস্ত্ব জাতির দ্বারা লক্ষণ নিরূপণ করলেও *তর্কভাষাপ্রকাশিকা*কারের লক্ষণটি একটু ক্লিষ্ট প্রকৃতির বলে মনে হয়। কিন্তু সেই তুলনায় *সারমঞ্জরী*কার একটু সরলভাবে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন।

এরূপ তিনটি টীকারই ভাষা শৈলী ও ব্যাখ্যান শৈলীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন-***তর্কভাষাপ্রকাশে*** 'অন্যে তু', 'অপরে তু', 'ইত্যপরে' - ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্বপক্ষের উপস্থাপনা করা হয়েছে। একই ভাবে ***সারমঞ্জরীতে*** 'কেচিত্তু' ইত্যাদির প্রয়োগ বেশী হয়েছে। আবার ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা***তে - 'ইতি সাংখ্যা', 'ইতি মীমাংসকা' ইত্যাদিভাবে বিরোধী মতের স্পষ্টত উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।

এরূপ ***তর্কভাষাপ্রকাশিকা*** এবং ***সারমঞ্জরী***তে নব্য ন্যায়ের 'পারিভাষিক' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ***তর্কভাষাপ্রকাশে*** তুলনামূলকভাবে তা স্বল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তবে ব্যাখ্যান শৈলীতে এরূপ পার্থক্য থাকলেও তিনটি টীকাতেই কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থগুলির স্বরূপ পরিস্ফুটনের উত্তম প্রয়াস লক্ষিত হয়। যার দ্বারা সহজেই জিজ্ঞাসু পাঠক এই নিবন্ধে প্রতিপাদিত বিষয়গুলি সম্যগ্-ভাবে বুঝতে পারবে।

কেশবমিশ্রসম্মত প্রমেয় পদার্থগুলি টীকাত্রয়ের আলোকে ক্রমবদ্ধরূপে নিবন্ধটিতে পর্যালোচিত হয়েছে। তাই আলোচ্য গবেষণানিবন্ধটি ন্যায়শাস্ত্রীয় বিষয়ানুসন্ধানী পাঠকের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য উল্লেখযোগ্য সোপান হিসেবে বিবেচিত হবে - এরূপ আমার বিশ্বাস।

******

উল্লেখপঞ্জি :

প্রথম অধ্যায় :

১. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথশুক্ল, পৃ. ৩৭১

২. জী. কো., পৃ. ১৫৫০

৩. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩৪৬

৪. H.I.L., পৃ. ১৪১

৫. তদেব, পৃ. ৪৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায় :

১. "প্রমাণপ্রমেযসংশযপ্রযোজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবযবতর্কনির্ণযবাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেযসাধিগমঃ।" - ন্যা. সূ., ১.১.১

২. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০

৩. "ইমাস্তু চতস্রো বিদ্যাঃ পৃথক্-প্রস্থানাঃ প্রাণভৃতামনুগ্রহাযোপদিশ্যন্তে যাসাং চতুর্থীযমান্বীক্ষিকী বিদ্যা, তস্যাঃ পৃথক্-প্রস্থানাঃ সংশযাদযঃ পদার্থাঃ, তেষাং পৃথগ্বচনমন্তরেণাধ্যাত্মবিদ্যামাত্রমিযং স্যাত্ যথোপনিষদঃ। তস্মাত্ সংশযাদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্ প্রস্থাপ্যতে।" - তদেব, পৃ. ২৫

৪. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬-১৮৭

৫. ন্যা. ম., সম্পা. সূর্যনারায়ণ শুক্ল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫

৬. "ইহ দ্বযী প্রত্যক্ষজাতিরবিকল্পিকা সবিকল্পিকা চেতি। তত্রোভযী ইন্দ্রিযার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যভিচারীতি লক্ষণেন সংগৃহীতাঽপি স্বশব্দেনোপাত্তা। তত্র বিপ্রতিপত্তেঃ। তত্রাবিকল্পিকাযাঃ পদমব্যপদেশ্যমিতি সবিকল্পিকাযাশ্চ ব্যবসাযত্মকমিতি...।"- ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০

৭. "সপ্রসঙ্গ উপদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা।

নির্বাহকৈকার্যত্বে ষোঢ়া সংগতিরিষ্যতে॥" - ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০(পাদটীকা)

৮. ন্যা. সূ. বৃ., (ন্যা. সূ. ১.১.৫)

৯. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২

১০. তদেব, পৃ. ১৮৯

১১. 'তত্র নানুপলব্ধে ন নির্ণীযতেঽর্থে ন্যাযঃ প্রবর্ততে, কিং তর্হি? সংশযিতেঽর্থে।' - তদেব, পৃ. ২৭

১২. স. বে. সং., কা. ১২

১৩. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪

১৪. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৫

১৫. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫

১৬. 'স চতুর্বিধঃ সর্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থারভাবাত্।' - ন্যা. সূ., ১.১.২৭

১৭. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৪

১৮. তদেব, পৃ. ৫৮৪

১৯. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

২০. ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, পৃ. ৩৭৪

২১. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২

২২. স. দ. সং., সম্পা. উমাশঙ্কর শর্মা, পৃ. ৩৯৪

২৩. ন্যা. দ. সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১

২৪. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭

২৫. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫

২৬. ষ. সমু., কা. ২৪

২৭. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬

২৮. তদেব, পৃ. ২০৩

২৯. 'সোঽযং চিত্তচৈতাত্মকঃ স্কন্ধঃ পঞ্চবিধো রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞকঃ।'-
স. দ. সং., সম্পা. উমাশঙ্করশর্মা, পৃ. ৭৫

৩০. ন্যা. দ. (ভাষ্য ও বৃত্তি সহ), সম্পা. আশুবোধ বিদ্যাভূষণ ও নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন, পৃ. ২০

৩১. ভা. পরি., কা. ৫০

৩২. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮

৩৩. প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪

৩৪. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮

৩৫. 'তত্রাত্মা সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বস্য ভোক্তা, সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বানুভাবী।' - তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬

৩৬. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১

৩৭. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮

৩৮. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫

৩৯. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১১

৪০. "ন চ ব্যাপারমাত্রং চেষ্টা অভিমতা, অপি তু বিশিষ্টো ব্যাপারঃ।" - ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭

৪১. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১১

৪২. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫

৪৩. ন্যা. সূ. বৃ., (ন্যা.সূ., ১.১.১১)

৪৪. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১১

৪৫. 'পার্থিবং গুণান্তরোপলব্ধেঃ।' - ন্যা. সূ., ৩.১.২৭

৪৬. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪

৪৭. ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, পৃ. ১৯৫

৪৮. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩

৪৯. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪

৫০. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮

৫১. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬

৫২. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৭

৫৩. ন্যা. দ., (ভাষ্য ও বৃত্তি সহ), সম্পা. আশুবোধ বিদ্যাভূষণ ও নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন, পৃ. ২২

৫৪. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮

৫৫. তদেব, পৃ. ৪২৩

৫৬. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১

৫৭. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬

৫৮. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯

৫৯. 'যুগপজ্-জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্।'- ন্যা. সূ., ১.১.১৬

৬০. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১

৬১. 'জ্ঞানাযৌগপদ্যাদেকং মনঃ (ন্যা.সূ., ৩.২.৫৬)', 'যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু (ন্যা.সূ.,৩.২.৫৯)।'

৬২. গীতা., - ৬.৩৪

৬৩. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০

৬৪. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪

৬৫. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩

৬৬. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৭

৬৭. বৃহদ্. উপ., মন্ত্র. ৪.৪.৩

৬৮. ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯-২৩০

৬৯. 'সোঽযং ফলশব্দঃ সুখদুঃখভোগে মুখ্যঃ, শরীরাদিষু গৌণ ইতি।' - ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯

৭০. 'অর্থগ্রহণং গৌণমুখ্যভেদপ্রদর্শনার্থম্...।' - ন্যা. ম., সম্পা. সূর্যনারায়ণ শুক্ল, প্রমেয় খণ্ড পৃ. ৭৪

৭১. "বিবিধা চ বাধনা - হীনা, মধ্যমা, উৎকৃষ্টা চেতি। উৎকৃষ্টা নারকিণাং, তিরশ্চান্তু মধ্যমা, মনুষ্যাণাং হীনা, দেবানাং হীনতরা বীতরাগাণাঞ্চ।" - ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৪

৭২. ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬

৭৩. "বাধনা পীড়া তাপ ইতি। তযাঽনুবিদ্ধমনুষক্তমবিনির্ভাগেন বর্তমানং দুঃখযোগাদ্দুঃখমিতি। সোঽযং সর্বং দুঃখেনানুবিদ্ধমিতি পশ্যন্ দুঃখং জিহাসুর্জন্মনি দুঃখদর্শী নির্বিদ্যতে, নির্বিণ্ণো বিরজ্যতে, বিরক্তো বিমুচ্যতে।"- ন্যা. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩

৭৪. তত্রৈব

৭৫. 'তদভযমজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্মক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি।' - তত্রৈব

৭৬. "অভযমিতি পুনঃ সংসারভযাভাবমাহ, 'অভয়ং বৈ ব্রহ্ম' ইত্যসকৃদভযশ্রুতেঃ। যে তু ব্রহ্মৈব নামরূপপ্রপঞ্চাত্মনা পরিণমত ইত্যাহুঃ, তান্ প্রত্যাহ - অজরমিতি। সর্বাত্মনা বা পরিণাম, একদেশেন বা? পূর্বস্মিন্ কল্পে সর্বাত্মনা ব্রহ্মণোঽন্যথাত্বাদ্ বিনাশপ্রসঙ্গঃ। একদেশপরিণামে তু সাবযবত্বাত্ ঘটাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি সূক্তম্ – অজরমিতি। বৈনাশিকাঃ প্রাহুঃ - প্রদীপস্যেব নির্বাণং বিমোক্ষস্তস্য চেতসঃ, ইতি। তান্ প্রত্যাহ - অমৃত্যুপদমিতি...।"- ন্যা. দ., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮

৭৭. ন্যা. ম., সম্পা. সূর্যনারায়ণ শুক্ল, প্রমেয় খণ্ড, পৃ. - ৭৭

তৃতীয় অধ্যায় :

১. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ১৮১

২. 'ধর্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবাযানাং পদার্থানাং সাধর্মবৈধর্মাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেযসম্' - বৈ. সূ., ১.১.৪

৩. ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চাননশাস্ত্রী, পৃ. ১৭-১৮

৪. কা. ব., (*দিনকরী* ও *রামরুদ্রী* সহ) সম্পা. আত্মারাম শর্মা, পৃ. ৪২

৫. 'আত্মত্বসামান্যবান্ আত্মা।' - ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ১৮১

৬. তদেব, পৃ. ১৮৫

৭. তদেব, পৃ. ২১৮

৮. 'কার্যসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতযা সংযোগস্য বিভাগস্য বা সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতযা দ্রব্যত্বসিদ্ধেরিতি।' ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চাননশাস্ত্রী, পৃ. ৩২-৩৪

৯. প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯

১০. 'প্রৌঢ়প্রকাশকতেজঃসামান্যাভাবস্তমঃ।'- ত. সং. দী., সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ১৭

১১. 'পৃথিবীত্বসামান্যবতী পৃথিবী।' - ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২২২

১২. তত্রৈব

১৩. 'অপ্ত্ব-সামান্যযুক্তা আপঃ।' - তদেব, পৃ. ২২৬

১৪. 'তেজস্ত্বসামান্যবত্ তেজঃ।' - তদেব, পৃ. ২২৮

১৫. "সুবর্ণং তৈজসম্ অসতি প্রতিবন্ধকে অত্যন্তানলসংযোগে সত্যনুচ্ছিদ্যমানজন্যদ্রবত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পৃথিবীতি।" - ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চাননশাস্ত্রী, পৃ. ১৮০-১৮২

১৬. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২২৮

১৭. তদেব, পৃ. ২৩৩

১৮. তত্রৈব

১৯. তদেব, পৃ. ২৩৬

২০. 'ঈশ্বরস্য চিকীর্ষাবশাৎ পরমাণুষু ক্রিয়া জায়তে।' - ত. সং. দী., সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ১৪৯

২১. "অসমবায়িকারণনাশাদ্ দ্ব্যণুকনাশঃ সমবায়িকারণনাশাৎ ত্র্যণুকনাশ ইতি সম্পদায়ঃ।
সর্বত্র অসমবায়িকারণনাশাদ্ দ্রব্যনাশ ইতি নবীনাঃ।" - তত্রৈব

২২. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৪০

২৩. তত্রৈব

২৪. তদেব, পৃ. ২৪৫

২৫. "বিভু চাকাশম্।পরমমহৎপরিমাণবদিত্যর্থঃ। সর্বত্র তৎকার্যোপলব্ধেঃ। অতএব বিভুত্বান্নিত্যমিতি।"-তত্রৈব

২৬. প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩

২৭. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৪৫

২৮. তদেব, পৃ. ২৫০

২৯. তত্রৈব

৩০. 'কালঃ পরাপরব্যতিরেকযৌগপদ্যাযৌগপদ্যচিরক্ষিপ্রপ্রত্যযলিঙ্গম্।'

- প্র. পা. ভা., দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. - ১৩৩

৩১.'ক্ষণলবনিমেষকাষ্ঠাকলামুহূর্তযামাহোরাত্রার্ধমাসমাসর্ত্বযনসংবৎসরযুগকল্পমন্বন্তরপ্রলযমহাপ্রলযব্যবহার-হেতুঃ।' - তত্রৈব

৩২. ভা. পরি., কা. ৪৪

৩৩. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৫২

৩৪. তত্রৈব

৩৫. 'তাসামেব দেবতাপরিগ্রহাত্ পুনঃ দশসংজ্ঞা ভবন্তি মাহেন্দ্রী বৈশ্বানরী যাম্যা নৈঋতী বারুণী বাযব্যা কৌবেরী ঐশানী ব্রাহ্মী নাগী চেতি।' - প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০

৩৬. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৫২

৩৭. তদেব, পৃ. ২৫৮

৩৮. প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪

৩৯. ভা. পরি., কা. ৪৭

৪০. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৫৯

৪১. তত্রৈব

৪২. প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯

৪৩. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৫৯

৪৪. তদেব, পৃ. ২৬০

৪৫. 'রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথকত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ।' - বৈ. সূ. ১.১.৬

৪৬. "গুণাশ্চ রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথকত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্ববুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চেতি কণ্ঠোক্তাঃ সপ্তদশ। চ শব্দ সমুচিতাশ্চ গুরুত্বদ্রবত্বস্নেহসংস্কারাদৃষ্টাশব্দা সপ্তৈবেত্যেবং চতুর্দশা গুণাঃ।"- প্র.পা. ভা, সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬

৪৭. 'চকারেণ গুরুত্বদ্রবত্বস্নেহসংস্কারধর্মাধর্মশব্দান্ সমুচ্চিনোতি তে হি প্রসিদ্ধগুণভাবা এবতে কণ্ঠতো নোক্তাঃ।' উপস্কার., পৃ. ৩৪

৪৮. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৬১

৪৯. ভা. পরি., কা. ১০০

৫০. ভা. পরি., সম্পা, পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৪৯৪

৫১. স. প., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ১১৮

৫২. ভা. পরি., সম্পা, পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৪৯৫

৫৩. তদেব, পৃ. ৪৯৭

৫৪. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৬৩

৫৫. তদেব, পৃ. ২৬৪

৫৬. "জলাদৌ গন্ধপ্রতিভানং তু সংযুক্তসমবায়েন দ্রষ্টব্যম্।" - তত্রৈব

৫৭. তত্রৈব

৫৮. তদেব, পৃ. ২৭৩

৫৯. প্র. প. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯

৬০. ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চাননশাস্ত্রী, পৃ. ৫১২

৬১. 'পৃথকত্বং পৃথকব্যবহারাসাধারণং কারণম্।' - ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৭৫

৬২. ভা. পরি., কা. ১১৪

৬৩. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৭৬

৬৪. 'অপ্রাপ্তযোঃ প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ।' - প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫১

৬৫. 'অপ্রাপ্তযোস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগ ঈরিতঃ।' - ভা. পরি., কা. ১১৫

৬৬. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৭৮

৬৭. "সংযোগোঽপি দ্বিবিধঃ, কর্মজঃ সংযোগজশ্চেতি। বিভাগোঽপি দ্বিবিধঃ, কর্মজঃ বিভাগজশ্চেতি।" - স. প., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ১২৮

৬৮. "বিভাগজস্তু দ্বিবিধঃ - কারণবিভাগাত্ কারণাকারণবিভাগাচ্চ...।"

- প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫

৬৯. "বিভাগজবিভাগঃ কারণমাত্রবিভাগজন্যঃ কারণাকারণবিভাগজন্যশ্চেতি দ্বিবিধঃ...।" - ভা. পরি., সম্পা, পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৫১৯

৭০. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৮১

৭১. তদেব, পৃ. ২৮৩

৭২. তদেব, পৃ. ২৮৪

৭৩. তত্রৈব, পৃ. ২৮৪

৭৪. তত্রৈব

৭৫. 'সংগ্রহমৃজাদিহেতুঃ।' - প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯

৭৬. ত. সং. দী., সম্পা. নারায়াণ চন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ২৪৫

৭৭. স. প., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৩১১

৭৮. "শব্দঃ শ্রোত্রগ্রাহ্যো গুণঃ। আকাশস্য বিশেষগুণঃ।" - ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৮৫

৭৯. তত্রৈব

৮০. তদেব, পৃ. ২৯১

৮১. তদেব., পৃ. ২৯২

৮২. তদেব, পৃ. ২৯৪

৮৩. তত্রৈব

৮৪. তদেব, পৃ. ২৯৭

৮৫. তদেব, পৃ. ২৯৯

৮৬. তদেব, পৃ. ৩০০

৮৭. তত্রৈব

৮৮. তদেব, পৃ. ৩০১

৮৯. প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮

৯০. ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৫১-৫২

৯১. "সামান্যং ত্রিবিধং ব্যাপকং ব্যাপ্যং ব্যাপ্যব্যাপকং চ। ব্যাপকং সত্তা, ব্যাপ্যং ঘটত্বাদি, দ্রব্যত্বাদি ব্যাপ্যাব্যাপকঞ্চ।" - তর্কাম্., সম্পা. জীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, পৃ. ৫৭

৯২. ভা. পরি., কা. ৮-৯

৯৩. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩০৬

৯৪. তদেব, পৃ. ৩০৭

৯৫. প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০

৯৬. ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৬৪-৬৬

৯৭. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩০৯

৯৮. তদেব, পৃ. ৩৭-৪২

৯৯. ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৬৯

১০০. 'প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানোঽভাবঃ।' - স. প., সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ২৬০

১০১. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩১৫

১০২. তদেব, পৃ. ২০২

১০৩. ন্যা. কু., সম্পা. মোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৯০

১০৪. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২০২

১০৫. তদেব, পৃ. ২০৫

১০৬. তত্রৈব

১০৭. তদেব, পৃ. ২০৮

১০৮. তত্রৈব

১০৯. তদেব, পৃ. ৩১৮

১১০. তদেব, পৃ. ৩২৫

১১১. তদেব, পৃ. ৩২৭

১১২. "প্রযত্নং নিরূপয়তি - প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-জীবনযোনি-যত্নভেদাৎ প্রযত্নস্ত্রিবিধ ইত্যর্থঃ।' - ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৫৫৬

১১৩. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩২৮

১১৪. তদেব, পৃ. ৩৩০

চতুর্থ অধ্যায় :

১. ত. ভা., সম্পা. এস্. আর্. আয়ার, ভূমিকা, পৃ. ৪১

২. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ১

৩. কি. ভা., পৃ. ১

৪. তদেব, পৃ. ১৮৪

৫. ত. ভা., সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি. কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৬২

৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Harihara_I

৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Harihara_II

৮. ত. ভা., (*ন্যায়প্রদীপ* টীকা সহ), সম্পা. সুরেন্দ্র লাল গোস্বামী, পৃ. ১

৯. তদেব, পৃ. ১৮৫

১০. D.C.S.M., সম্পা. এম্. রঙ্গাচার্য, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮২

১১. তদেব, পৃ. ৩০৮৩

১২. ত. ভা., (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. এস্. এম্. পরাঞ্জপে, ভূমিকা, পৃ. xxi

১৩. D.C.S.M., সম্পা. এম্. রঙ্গাচার্য, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭৭

১৪. সা. ম., পৃ. ১১৩

১৫. তদেব, ভূমিকা, পৃ. xxxiii

১৬. D.C.S.M., সম্পা. এম্. রঙ্গাচার্য, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭৩-৩০৭৪

১৭. তত্রৈব

১৮. তদেব, পৃ. ৩০৭৭

১৯. ত. ভা., সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, ভূমিকা, পৃ. xxii

২০. D.C.S.M., সম্পা. নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, একাদশ খণ্ড, পৃ. ১২৩

২১. C.S.P.M., সম্পা. অম্বল পি. শাহ, ১ম খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃ. ১১

২২. তত্রৈব

২৩. D.C.S.M., সম্পা. এম্. রঙ্গাচার্য, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭৫-৩০৭৬

২৪. তদেব, পৃ. ৩০৭৫-৩০৭৬

২৫. H.I.L., পৃ. ৩৮৪

২৬. পরা. উপ., কা. ১৮.২১-২২

২৭. H.I.L., পৃ. ৩৫৭

২৮. "ত্রিবিধং প্রমাণম্। প্রত্যক্ষমনুমানমাগমশ্চেতি"- ন্যা. সা., সম্পা. কে. সাম্বশিবশাস্ত্রী পৃ. ৯

২৯. "তচ্চতুর্বিধং - হেয়ং, তস্য নিবর্তকং, হানমাত্যন্তিকং, তস্যোপায় ইতি।" - তদেব, পৃ. ১১৮

৩০. "কুতো মুক্তস্য সুখোপভোগসিদ্ধিরিতি চৈদ্ আদমাত্। উক্তং হি-

'সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।

তং বৈ মোক্ষং বিজানীয়াদ্ দুষ্প্রাপকমকৃতাত্মভি॥'

তথা -

'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষেঽভিব্যজ্যতে'।

'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ইতি চ॥" - তদেব, পৃ. ১৪৩

৩১. "He seems to me to have been a native of Kāśmīra. His name, which is very peculiar, bears a close resemblance to the mane of Sarvajña Mitra and Sarvajña Deva, who lived in Kāśmīra about 775 A.D. and 1025 A.D. respectively." H.I.L., পৃ. ৩৫৭

৩২. H.I.L., পৃ. ৩৫৮ (পাদটীকা)

৩৩. ত. ভা., সম্পা. বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্ত শিরোমণি, ভূমিকা, পৃ. ৪৩

৩৪. H.I.L., পৃ. ৩৭৩

৩৫. তা. র., পৃ. ১৩০

৩৬. তদেব, পৃ. ৩৬৪

৩৭. স. দ. সং., সম্পা. উমাশঙ্কর শর্মা, পৃ. ২৪২

৩৮. H.I.L., পৃ. ৩৮১

৩৯. তদেব, পৃ. ৩৮৬

৪০. তদেব, পৃ. ৩৯২

৪১. "ইতি মহামহোপাধ্যায়বিদ্যানিবাসভট্টাচার্যসুতশ্রীবিশ্বনাথন্যায়পঞ্চাননভট্টাচার্যবিরচিতো ভাষাপরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ" - ভা. প., সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৫৯০

৪২. ন্যা. প., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃ. ৪০

৪৩. H.I.L., পৃ. ৩৯৩

৪৪. ন্যা. প., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ভূমিকা, পৃ. ২০

৪৫. H.I.L., পৃ. ৩৮৮

৪৬. ত. স., সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ৬০৩

৪৭. "কাঞ্চ্যাং ত্রিভূবনতিলকো ভূপতিঃ, ইত্যাদৌ সিদ্ধেঽপি ব্যবহারাত্" - ত. সং., সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ৪৪১

৪৮. H.I.L., পৃ. ৩৮৮ (পাদটীকা)

৪৯. তদেব, পৃ. ৩৮৮

৫০. তদেব, পৃ. ৩৯৫

৫১. তদেব, পৃ. ৩৯৬

৫২. তদেব, পৃ. ৩৯৭

৫৩. প. মা., পৃ. ২

পঞ্চম অধ্যায় :

১. ত. ভা., ম. কা. ১

২. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি. কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ৯৮

৩. তত্রৈব

৪. 'সোঽযং পরমো ন্যায ইতি। এতেন বাদ-জল্প-বিতণ্ডাঃ প্রবর্তন্তে নাতোঽন্যথেতি' - ন্যা. দ. সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯

৫. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৪

৬. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৩

৭. সা. ম., পৃ. ৬-৭

৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ১২-১৩

৯. ত. ভা., বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ১৬

১০. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৮-৯

১১. ত. ভা.(*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি.আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ১২৯-১৩০

১২. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৩৬-৩৭

১৩. সা. ম., পৃ. ৮৮

১৪. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি. কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ১১৫

১৫. সা. ম., পৃ. ১০৪

১৬. ত. ভা., বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৩৬

১৭. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি. কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২১৭

১৮. তদেব, পৃ. ১১০-১১১

১৯. সা. ম., পৃ. ১১৪

২০. তদেব, পৃ. ৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায় :

১. "সর্বাত্মনি অহমহমিত্যাদিপ্রত্যক্ষেণ সিদ্ধম্... সুখাদিসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতযা বা আত্মত্বজাতিসিদ্ধিঃ... তস্যা এব আত্মপদশক্যতাবচ্ছেদকত্বেন ঈশ্বরবৃত্তিত্বসিদ্ধেঃ" - সা. ম., পৃ. **৭৬**

২. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬২

৩. 'আত্মত্বং নাম সামান্যমাত্মনো লক্ষণং স্বজাতীয়বিজাতীযব্যবচ্ছেদকত্বাতিতি ভাবঃ।' ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ১৯৭

৪. তদেব, পৃ. ১৯৯

৫. সা. ম., পৃ. ৭৬

৬. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৫

৭. তদেব, পৃ. ৬৩

৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০০

৯. সা. ম., পৃ. ৭৬

১০. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০০

১১. তদেব, পৃ. ২০৪

১২. সা. ম., পৃ. ৭৯

১৩. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৫-৬৬

১৪. সা. ম., পৃ. ৭৯

১৫. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৬

১৬. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৪

১৭. 'সমবায়েন দ্রব্যশূন্যম্।' সা. ম., পৃ. ৭৯

১৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৬

১৯. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৪

২০. সা. ম., পৃ. ৭৯

২১. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৫

২২. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৭

২৩. 'স্মৃত্যজনকজ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রযত্বং তল্লক্ষণম্...' সা. ম., পৃ. ৮১

২৪. 'বাক্-পাণিপাদপায়ূপস্থান্ কর্মেন্দ্রিযাণ্যাহুঃ।' সাং. কা. ২৬

২৫. "তথা হি কণ্ঠোঽন্ননিগরেণ স্তনকলশালিঙ্গনাদিনা বক্ষো ভারবহনেন চাংসদ্বযমিন্দ্রিযমুচ্যতে ন কথম্? ...অপি চ বিহরণমপি ন কেবলং চরণযুগলকার্যম্ অপি তু জানূরুজঙ্ঘাদিসহিতপাদসম্পাদ্যমানমপি বাহুসহিতাভ্যাং পাণিভ্যামপি নির্বর্ত্যতে ন কেবলাভ্যাম্, বাগিন্দ্রিযং তু নাভের্রূধে সর্বমেব স্যাদিত্যাহুঃ - 'বাযুর্নাভেরুত্থিত উরসি বিস্তীর্ণঃ কণ্ঠে বিবর্তিতো মূর্ধানমাহত্য পরাবৃত্তো বক্ত্রে চরন্বিবিধান্ শব্দানভিব্যনক্তি' ইতি...।" - ন্যা. ম., সম্পা. সূর্যনারায়ণ শুক্ল, প্রমেয় প্রকরণ, পৃ. ৫৪

২৬. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৫

২৭. 'বুদ্ধীন্দ্রিযাণি চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণরসনস্পর্শনকানি।' সাং. কা. ২৬

২৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২০৬

২৯. সা. ম., পৃ. ৮৩

৩০. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথশুক্ল, পৃ. ২১৫

৩১. সা. ম., পৃ. ৮৬

৩২. ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চাননশাস্ত্রী, পৃ. ১৭-১৮

৩৩. 'দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবাযাভাবাঃ সপ্তৈব পদার্থাঃ ষোড়শানামত্রৈবান্তর্ভাবাদিতি প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ।' কা. ব., (*দিনকরী* ও *রামরুদ্রী* টীকা সহ) সম্পা. আত্মারাম শর্মা, পৃ. ৪২

৩৪. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৯

৩৫. সা. ম., পৃ. ৮৬

৩৬. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২১৮

৩৭. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৬৯

৩৮. সা. ম., পৃ. ৮৭

৩৯. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২১০

৪০. সা. ম., পৃ. ৮৮

৪১. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ৭০

৪২. সা. ম., পৃ. ৮৮

৪৩. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২১২

৪৪. সা. ম., পৃ. ৮৯

৪৫. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২২৮

৪৬. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২১২

৪৭. সা. ম., পৃ. ৮৯

৪৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২১৩

৪৯. সা. ম., পৃ. ৯০

৫০. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২১৪

৫১. সা. ম., পৃ. ৯০

৫২. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৩৩

৫৩. ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ১৮৬

৫৪. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২১৫

৫৫. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথশুক্ল, পৃ. ২৩৩

৫৬. তদেব, পৃ. ৭২

৫৭. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২১৭

৫৮. তৈ. উপ. মন্ত্র. ২.১

৫৯. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২১৮

৬০. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৭২

৬১. সা. ম., পৃ. ৯১

৬২. "অসমবায়িকারণনাশাদ্ দ্ব্যণুকনাশঃ সমবায়িকারণনাশাৎ ত্র্যণুকনাশ ইতি সম্পদায়ঃ। সর্বত্র অসমবায়িকারণনাশাদ্ দ্রব্যনাশ ইতি নবীনাঃ।" ত. সং. দী., সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ১৪৯

৬৩. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৭২

৬৪. ত. ভা.(*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি.আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ.২১৮-২১৯

৬৫. সা. ম., পৃ. ৯১

৬৬. ত. ভা.(*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি.আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ.২১৯-২২০

৬৭. সা. ম., পৃ, ৯১

৬৮. তদেব, পৃ. ৯৪

৬৯. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২২৩

৭০. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৪৫

৭১. তত্রৈব

৭২. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৭৪

৭৩. সা. ম., পৃ. ৯৪

৭৪. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২২৫

৭৫. সা. ম., পৃ. ৯৫

৭৬. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৫০

৭৭. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৭৭

৭৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২২৭

৭৯. 'মূর্তং দ্রব্যমবধিং বিধায মূর্তেষ্বেব দ্রব্যেষ্বিদমস্মাতপূর্বমিদমস্মাদপরমিদমস্মাদ্দক্ষিণমিদমস্মাদুত্তরমিতি প্রত্যযো যতো ভবন্তি সা দিগিত্যর্থঃ' - ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২২৭

৮০. "প্রাচ্যাং দিশি ঘট ইতি প্রতীতিঃ উদযাচলসূর্যসংযোগরূপপ্রাচ্যাদেঃ ঘটে সংবন্ধাভাবেন বিশিষ্টবুদ্ধ্যনুপপত্ত্যা স্বাশ্রয়সংযুক্ততযা ঘটাদৌ, তত্ সংবন্ধঘটকতযা দিক্-সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তাদৃশপরত্বাপরত্বাসমবাযিকারণসংযোগাশ্রযতযা চ তত্ সিদ্ধিঃ।" সা. ম., পৃ. ৯৫

৮১. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২২৯

৮২. তদেব, পৃ. ২২৯-২৩০

৮৩. সা. ম., পৃ. ৯৬

৮৪. ন্যা. সূ., ৩.২.৫৯

৮৫. ন্যা. দ. সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২

৮৬. "মধ্যমপরিমাণস্যানিত্যত্বনিযমাত্। এতেন সংকোচবিকাশশালি মন ইতি প্রত্যুক্তং ভবতি। লাঘবেন নিত্যত্বাঙ্গিকারাত্। অবযবপরিকল্পনাযাং গৌরবাত্। করণস্বাভাবে হি নানাজ্ঞানানি মা ভবন্তু সমূহালম্বনং তু স্যাদদেবেত্যণু মন ইত্যর্থঃ" - ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৭৮

৮৭. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৩১

৮৮. কা. ব. (*দিনকরী* ও *রামরুদ্রী* সহ) সম্পা. আত্মারাম শর্মা, পৃ. ১৩৯

৮৯. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথশুক্ল, পৃ. ২৬০

৯০. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৭৮

৯১. সা. ম., পৃ. ৯৬

৯২. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৩১

৯৩. 'নন্বতীন্দ্রিয়েঽব্যাপ্তেরিতি চেন্ন। চক্ষুর্মাত্রগ্রাহ্যজাতিমদ্গুণত্বস্য বিবক্ষিতত্বাত্।' - ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৭৮-৭৯

৯৪. সা. ম., পৃ. ৯৬

৯৫. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৩৩

৯৬. সা. ম., পৃ ৯৭

৯৭. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৭৯

৯৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৩৩

৯৯. সা. মা., পৃ ৯৮

১০০. প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫

১০১. স. প. সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ১২১

১০২. তত্রৈব

১০৩. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৬৪

১০৪. তত্রৈব

১০৫. প্র. পা. ভা., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭-২১৮

১০৬. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৬৬

১০৭. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৭৯-৮০

১০৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৩৬

১০৯. তদেব, পৃ. ২৩৮

১১০. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২৭৮

১১১. তত্রৈব

১১২. (***তর্কভাষাপ্রকাশ*** - 'দ্বিতীযপতনাসমবাযিকারণে বেগেঽতিব্যাপ্তিবারণাযাহ - আদ্যেতি।' - ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৮২), (***তর্কভাষাপ্রকাশিকা*** - "দ্বিতীযাদি পতনস্য স্যন্দনস্য চ বেগহেতুত্বাদুভযত্র আদ্যেতি বিশেষণীযম্।" - ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪১)

১১৩. সা. ম., পৃ. ১০৪

১১৪. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৮২

১১৫. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথশুক্ল, পৃ. ২৮৮

১১৬. সা. ম., পৃ. ১০৮

১১৭. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৪

১১৮. সা. ম., পৃ. ১০৯

১১৯. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৪

১২০. সা. ম., পৃ. ১০৯

১২১. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৫

১২২. সা. ম., পৃ. ১১০

১২৩. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৮৬

১২৪. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৫

১২৫. সা. ম., পৃ ১১০

১২৬. তত্রৈব

১২৭. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৫

১২৮. ত. ভ., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩০১

১২৯. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৮৬

১৩০. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৩

১৩১. সা. ম., পৃ. ১১১

১৩২. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৩

১৩৩. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩০৭

১৩৪. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৮৭

১৩৫. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৭

১৩৬. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩০৯

১৩৭. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৭

১৩৮. সা. ম., পৃ. ২৩

১৩৯. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৪৮

১৪০. সা. ম., পৃ. ১১২

১৪১. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩১৫

১৪২. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫১

১৪৩. সা. ম., পৃ. ১১৩

১৪৪. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৮৫

১৪৫. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫১

১৪৬. ত. ভা. সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩২৬

১৪৭. তদেব, পৃ. ৩২৭

১৪৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৩

১৪৯. ত. ভা. সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২২৮

১৫০. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৯০

১৫১. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৩

১৫২. সা. ম., পৃ. ১১৪

১৫৩. তত্রৈব

১৫৪. ভা. পরি., সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৫৫৬-৫৫৭

১৫৫. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ.-৯০

১৫৬. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৩

১৫৭. সা. ম., পৃ. ১১৪

১৫৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৯০

১৫৯. "উৎকটেচ্ছা রাগঃ। যদ্যপি উৎকটত্ব জাতৌ ন মানম, তথাপি যোগিনাং রাগো নাস্তীতি পুরাণবশাদিচ্ছাবিশেষঃ রাগোঽবশ্যং বাচ্যঃ। যদ্বা - রাগজন্যযত্নস্যৈব অদৃষ্টজনকত্বাত্ রাগত্বং জাতিরিত্যব। জ্ঞানিনো যত্নাত্ ধর্মাদিকমিত্যাহুঃ। দ্বেষঃ মন্যুরিতি ক্রোধবিশেষঃ। সোঽপি জ্ঞানিনাং নাস্তি। অসক্তোদ্বিষং ভুঙ্-ক্তে ইতি শ্রবণাত্। মোহ মিথ্যাজ্ঞানম্। তস্য তজ্জন্যসংস্কারস্য বা অদৃষ্টোৎপত্তৌ কারণাত্বাত্ ন জ্ঞানিনাং ধর্মাধর্মযোরুৎপাদঃ।" সা. ম., পৃ. ১১৪

১৬০. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ২২৮

১৬১. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৯০

১৬২. "মৃত্বোৎপত্তিঃ প্রেত্যভাব ইত্যাহ - পুনরিতি। ননু নিত্যস্যাত্মনঃ কথমযং ঘটতে তত্রাহ - স চেতি।" - ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৩

১৬৩. "আত্মনো নিত্যত্বেনোৎপত্ত্যসংভবাত্ শরীরান্তরোৎপত্তিরেব। পুনরুৎপত্তিরিত্যাহ - সচেতি। স প্রেত্যভাবঃ। যদ্যপি ইদানীমপি বাল্যশরীরনাশঃ যৌবনশরীরান্তরোৎপাদঃ সংভবতি, তথাপি বিষ্ণুমিত্রত্বাদি-শরীরনিষ্ঠা জাতযঃ। তদ্-বিষ্ণুমিত্রত্বাবচ্ছিন্ননাশে চৈত্র শরীরলাভোঽভিমতঃ।" - সা. ম., পৃ. ১১৪

১৬৪. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ.- ৩২৯

১৬৫. সা. ম., পৃ. ১১৪

১৬৬. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩২৯

১৬৭. তদেব, পৃ. ৩৩০

১৬৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৪

১৬৯. সা. ম., পৃ. ১১৫

১৭০. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৯১

১৭১. সা. ম., পৃ. ১১৪

১৭২. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩৩০

১৭৩. সা. ম., পৃ. ১১৫

১৭৪. "অপবর্গং লক্ষয়তি - তদত্যন্তেতি। তস্য দুঃখস্য, অত্যন্তবিমোক্ষঃ - স্বসমানাধিকরণদুঃখাসমানকালীন ধ্বংসঃ।" - বৃত্তি (ন্যা. সূ. ১.১.২২)

১৭৫. ত. ভা., সম্পা. বদরীনাথ শুক্ল, পৃ. ৩৩১

১৭৬. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশ* টীকা সহ), সম্পা. শিবম্ মহাদেও পরাঞ্জপে, পৃ. ৯১

১৭৭. সা. ম., পৃ. ১১৫

১৭৮. ত. ভা. (*তর্কভাষাপ্রকাশিকা* টীকা সহ), সম্পা. ডি. আর. ভাণ্ডারকর ও পি.কে. সাহিত্যভূষণ, পৃ. ২৫৪

অনুশীলিত গ্রন্থপঞ্জি :

বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী :-

- অন্নংট্ট। *তর্কসংগ্রহ* । সম্পা. নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮
- অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ* । সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
- উদয়নাচার্য। *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী* । সম্পা. মোহন ভট্টাচার্য। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১৫।
- *উপনিষদ্(ঈশাদি)*। গোরক্ষপুর : গীতাপ্রেস, ২০১৫
- কেশবমিশ্র। *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পা. গঙ্গাধর কর। কোলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১৪
- কেশবমিশ্র। *তর্কভাষা* (প্রথম খণ্ড)। সম্পা. গঙ্গাধর কর। কোলকাতা : মহাবোধী বুক এজেন্সী, ২০১৩
- জয়ন্তভট্ট। *ন্যায়মঞ্জরী* । সম্পা. পঞ্চানন তর্কবাগীশ, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খণ্ড)। কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ১৯৮১
- -,-। *ন্যায়দর্শন* (চতুর্থ খণ্ড)। কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১৫
- -,-। *ন্যায়দর্শন* (তৃতীয় খণ্ড)। কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১৭
- -,-। *ন্যায়দর্শন* (দ্বিতীয় খণ্ড)। কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১৫
- -,-। *ন্যায়দর্শন* (পঞ্চম খণ্ড)। কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১৫
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। *ন্যায়পরিচয়* । কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০০৬

- *প্রশস্তপাদভাষ্য* (দ্বিতীয় ভাগ)। সম্পা. দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭

- *প্রশস্তপাদভাষ্য* (প্রথম ভাগ)। সম্পা. দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম। কলকাতা : দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণসংঘ, ২০১০

- বাচস্পতিমিশ্র। *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*। সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

- বিদ্যালঙ্কার, শশীভূষণ। *জীবনীকোষ* । দেবদত্ত চক্রবর্ত্তী। কলিকাতা : ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

- বিশ্বনাথ। *ভাষাপরিচ্ছেদ* (*সিদ্ধান্তসুক্তাবলী* সহ)। সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী। কোলকাতা : মহাবোধী বুক এজেন্সি, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

- *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* । সম্পা. স্বামী গম্ভীরানন্দ। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৪

- *বৈশেষিক দর্শন* । সম্পা. উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা : বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড্, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

- *বৈশেষিকসূত্র।* সম্পা. অমিত ভট্টাচার্য। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২

- *ব্যাপ্তিপঞ্চক*। গঙ্গেশোপাধ্যায়। সম্পা. গঙ্গাধর কর। কলকাতা : সেন্টার অফ্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫

- ভট্টাচার্য, মোহন ও দীনেশ চন্দ্র। *ভারতীয় দর্শন কোষ* (প্রাচীনন্যায়-নব্যন্যায়-বৈশেষিকদর্শন)। কলিকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৫৮

- শাস্ত্রী পঞ্চানন। *চার্বাক দর্শন* । চব্বিশ পরগনা : শ্রী সাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

- শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন। *চার্বাক দর্শন* । কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ১৯৮২

- *শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা*। অনু. স্বামী ভাবঘনানন্দ, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩

- *সাংখ্য দর্শন* । সম্পা. দূর্গাচরণ সাংখ্যবোদান্ততীর্থ। কলিকাতা : সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

- সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু। *ভারতীয় দর্শন*। কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৬

● -,-। *ভারতীয় দর্শন*। কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৬

● হরিভদ্রসূরি, *ষড়্-দর্শনসমুচ্চয়* । সম্পা. শর্বাণী গাঙ্গুলী, কোলকাতা : সংস্কৃত বুক্ ডিপো, ২০১০

সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী :–

● अन्नंभट्टः। तर्कसंग्रहः। सम्पा. कृष्णवल्लभाचार्यः। वारानसी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज-अफिस, 2017

● उपाध्याय, वलदेव । *भारतीय-दर्शन-की-रूपरेखा* । वारानसी : चौखम्बा ओरियेण्टालिया, 1979

● *किरणावली* । उदयनाचार्यः। सम्पा. शिव-चन्द्र-सार्वभौमः। कलिकाता : एशियाटिक-सोसाइटि, 1911

● केशवमिश्रः । *तर्कभाषा* (न्यायप्रदीप-टीकया सहिता) । सम्पा. सुरेन्द्रलालागोस्वामी । वेनारस : मेडिक्याल-हल-प्रेस, 1901

● केशवमिश्र । *तर्कभाषा* । सम्पा. गजाननशास्त्री । वारानसी : चौखम्बा-सुरभारती-पप्रकाशन, 2017

● केशवमिश्रः। *तर्कभाषा* (गोवर्धनमिश्रकृता *तर्कभाषाप्रकाश*-टीकासहिता)। सम्पा. शिभम् महादेओ पराञ्जपे। दिल्ली : चोखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्, 2005

● केशवमिश्र । *तर्कभाषा* । सम्पा. विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणि । वारानसी : चौखम्बा-संस्कृत-भवन, 2016

● केशवमिश्रः। *तर्कभाषा* (चिन्नंभट्टविरचिता *तर्कभाषाप्रकाशिका*-टीका युक्ता) । सम्पा. देवदत्त-रामकृष्ण-भण्डारकरः केदारनाथ-साहित्यभूषणश्च । पुना : भाण्डारकरप्राच्य-विद्यासंशोधन-मन्दिराधिकारिभिः प्रकाशिता, 1979

● केशवमिश्र । *तर्कभाषा* । सम्पा. बदरीनाथशुक्ल । दिल्ली : मोतीलाल-बनारसीदास, 2017

- गुप्तः, जे. एल.। षड्-दर्शनसूत्रसंग्रहः । दिल्ली : चौखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्, 2015
- जयन्तभट्टः। *न्यायमञ्जरी* । सम्पा. सूर्यनारायणशुक्लः। वाराणसी : चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज-अफिस,1936
- झालकिकरः, भीमाचार्यः। *न्यायकोशः*। वाराणसी : चौख्मबा-सुरभारति-प्रकाशनम्, 2017
- ठाकुरः, अनन्तलालः। *न्यायदर्शनम् (न्यायचतुर्ग्रन्थिका* समलङ्कृता, प्रथमः खण्डः) । दारभाङ्गा : मिथिला-विद्यापिठः, 1967
- जगदीशतर्कालंकारः। *तर्कामृतम् ।* सम्पा. जीवनकृष्णतर्कतीर्थः। कलिकाता : एशियाटिक-सोसाइटि, 1974
- *तार्किकरक्षा* । सम्पा. विन्ध्येश्वरीप्रसाद-द्विवेदी । मेडिक्याल-हल-प्रेस, 1903
- *न्यायदर्शनम्* (भाष्य-वृत्ति-सहितम्) । आशुबोध-विद्याभूषणः नित्यबोधविद्याभूषणश्च । कलिकाता : आशुबोध-विद्याभूषण-नित्यबोधविद्याभूषण-प्रकाशनम्, 1911
- पद्मनाभमिश्रः। *किरणावलीभास्करः* । सम्पा. गोपीनाथ कविराजः । वेनारस : गभर्मेण्ट-संस्कृत-लाइब्रेरी,1920
- पराशरोपपुराणः (समीक्षात्मक-सम्पादनम्)। सम्पा. कपिलदेव-त्रिपाठी । वारानसी : सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयम्, 1990
- *प्रशस्तपादभाष्यम्* (हिन्दीव्याख्या सहित) । सम्पा. ढुण्डिराजशास्त्री । वाराणसी : चौखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्, 2016
- भासर्वज्ञः । *न्यायसारः* । सम्पा. वासुदेवसूरिः । दिल्ली : संजय-प्रकाशनम्, 2010
- माधवदेवः । *सारमञ्जरी* (*तर्कभाषा*श्रिता टीका) । सम्पा. तोताद्रि-देवनायक-मुरलीधरः। नवदेह्ली : राष्ट्रिय-संस्कृतसंस्थानम्, 2012
- माधवाचार्यः । *पराशरमाधवः*(व्यवहारकाण्डः) । सम्पा. कमलाकान्त-त्रिपाठी । वारानसी : चौखम्बा विद्याभवनम्, 2019

● माधवाचार्यः । *सर्वदर्शनसंग्रहः* । सम्पा. उमाशङ्करशर्मा । वाराणसी : चोखम्बा-विद्याभवनम्, 2016

● मानमेयोदयः। सम्पा. स्वामियोगीन्द्रानन्दः। चौखम्बा-विद्याभवनम्, 2017

● विश्वनाथः । *कारिकावली* । सम्पा. आत्मारामशर्मा । वारानसी : चौखम्बा-संस्कृत अकादमी, 2021

● शङ्करमिश्रः । *वैशेषिकसूत्रोपस्कारः* । सम्पा. ढुण्ढिराज-शास्त्री । वाराणसी : चौखम्बा प्रकाशन्म्, 2016

● शङ्कराचार्यः । *सर्व-वेदान्त-सारसंग्रहः* । सम्पा. राम-स्वरूप-शर्मा । मुरादावाद् : सनातनधर्म-प्रेस, 1978 विक्रमाब्दः।

● शिवादित्यः । सप्तपदार्थी । सम्पा. तपनशङ्करभट्टाचार्य्यः । कोलकाता : संस्कृत-वुक-डिपो, 2012

● शिवादित्यः । सप्तपदार्थी । सम्पा. अमरेन्द्र-मोहन-भट्टाचार्यः। कलकाता : कलकाता संस्कृत-सीरीज, 1934

● सांख्यसूत्रम् । सम्पा. कुञ्जविहारी-तर्कसिद्धान्तः। मानभूम : स्वयं कृत प्रकाशना, 1325 वङ्गाब्दः।

ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী :-

● *A descriptive catalogue of Sanskrit Manuscript* (Vol-xi). Ed. Narendra Chandra Vedantatirtha & Chintaharan Chakravarti. Calcutta: The Asiatic Society, 1957

● *A descriptive catalogue of the Sanskrit Manuscript* (Vol-iii). Ed. M. Rangacharya. Madras : Government Oriental Manuscript Library, 1910

● Ananmbhatta. *Tarkasamgraha*. Ed. A. B. Gajendragadkar & R. D. Karmarkar. Delhi : Chaukhalmba Sanskrit Pratishthan, 2018

● *Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts* (Part-I). Ed. Pt. Ambalal P. Shah. Ahmedabad : L. D. Institute of Indology, 1963

● Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy* (Vol-1). Delhi : Surjeet Publications, 2017

● Keśvamiśra. Tarkabhāṣā. Ed. Ganganatha Jha. Delhi : Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 2005

● Keśvamiśra. Tarkabhāṣā. Ed. S.R. Iyer. Varanasi : Chaukhambha Orientalia, 1979

● Maxmuller, K. *The six system of Indian Philosophy*. Varanasi : Chowkhamba Sanskrit series office, 2008

● Mukhopadhyaya, Gobindagopal. *Tri-Lingual-Dictionary*. Kolkata : Sanskrit book depot, 2018

● Sayvapalli, Radhakrishnan & Charles A, Moore. A Source book in Indian Philosophy. USA : Princeton, New Jersey Princeton University press, 1967

● Sayvapalli, Radhakrishnan. Indian Philosophy (Vol.1). London : George Allen & Unwin ltd. 1923

● Vidyabhusana, S. C. *A History of Indian Logic* (Ancient, Mediaeval and Modern School). Calcutta : The Calcutta University, 1921